প্রকাশিকা ঃ—
শ্রীমতী দীপালী দেবী

প্রথম প্রকাশ ঃ—
জন্মাষ্টমী—১৩৫৯ বঙ্গাব্দ

প্রাপ্তিস্থান ঃ—
১। আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ ও তদন্তর্গত আশ্রমসমূহ।
২। মহেশ লাইব্রেরী, ২/১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলি-৭৩
৩। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৫

মুদ্রাকর ঃ—
শ্রী লীলাময় মাইতি
জে, এন, প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
কলিকাতা-৬

শ্রীশ্রীনিগমানন্দ শরণম্

প্রকাশন কথা

'মাথুর' প্রবন্ধটি ১৩৬৬ এবং ১৩৬৭ বঙ্গাব্দে পশ্চিমবাংলা সারস্বত আশ্রম থেকে প্রকাশিত সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র আর্য্য-দর্পণ মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি 'সূচনা', 'কথামুখ' ও 'কথা' তিন অংশে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং একই সঙ্গে 'মাথুর' নামাবরণে প্রকাশিত হয়। লেখিকা নারায়ণী দেবী।

সূচনা ও কথামুখ অংশে শ্রীকৃষ্ণ যে ঐতিহাসিক পুরুষ এবং মর্ত্ত্যভূমি এই ভারতবর্ষেরই একজন, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণে তারই উপর আলোকপাত করা হয়েছে। কথা অংশে আলোচিত হয়েছে শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে মথুরা ও প্রভাসে তাঁর কীর্তিগাঁথা এবং তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।

শ্রীকৃষ্ণ জীবন চরিতের তিনটি অধ্যায়—বৃন্দাবন লীলা, মথুরা লীলা এবং দ্বারকা বা প্রভাস লীলা। আক্ষরিক অর্থে মাথুর মথুরা সম্বন্ধীয়। বস্তুতঃ পুস্তকটিতে মথুরা এবং দ্বারকায় তাঁর কীর্ত্তিগাঁথা ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যত আলোচিত হয়েছে তুলনামূলক ভাবে বৃন্দাবন বিহারীর বাল্য ও কৈশোর লীলা স্মরণে মাতৃহৃদয়ের আকুল আর্ত্তি এবং ব্রজাঙ্গনাদের ব্যাথাতুর হৃদয়ের বিলাপের কথা খুব কমই আলোচিত হয়েছে। সুতরাং পুস্তকটি পাঠে প্রচলিত কৈশোর-চাপল্য বৃন্দাবন লীলাকেই যাঁরা মাথুর বলে মনে করেন তারা কিছুটা নিরাশ হবেন, কারণ তাঁদের ভক্তি রাগানুগা—'মাথুর' তাঁদের নিকট বিরহ ব্যতীত আর কিছু নয়। পক্ষান্তরে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে মাথুরের আক্ষরিক অর্থে দৃষ্টি রেখে শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিক সত্ত্বায় যাঁরা চিন্তাশীল ও অনুসন্ধিৎসু, পুস্তকটি নিঃসন্দেহে তাঁদের চিন্তার ইন্ধন জোগাবে।

নারায়ণী দেবী কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সুযোগ্য পুত্র—ঋষি অরবিন্দের আধ্যাত্মিক ভাবধারার অনুগামী-সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয় দীলিপকুমার রায় মহোদয়ের

অনুরোধে ইতিহাস ভিত্তিক শ্রীকৃষ্ণ জীবনচরিত সম্বন্ধীয় কয়েকটি প্রবন্ধ তাঁকে পাঠিয়েছিলেন। সম্প্রতি ঐ রকম একটি প্রবন্ধ "সেই বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম" শ্রদ্ধেয়া সুরবালা দেবীর সৌজন্যে প্রাপ্ত হই। তথ্য ভিত্তিক এই প্রবন্ধটি অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের জন্য এখানে সংযোজিত হল।

॥ সেই বৃন্দাবনের লীলা-অভিরাম ॥

'আশ্রমানামহং তুর্যঃ'। সমগ্র হিন্দু সমাজের এই শ্রেষ্ঠাশ্রমীদের আদিগুরু ভগবান বেদব্যাস। আষাঢ়ী পূর্ণিমায় সূর্য উত্তরায়ণের চরম বিন্দুতে এসেছেন প্রায়, আলো-ঝলমল সুদীর্ঘ দিনশেষে রাত্রিটিও জ্যোৎস্না পুলকিত ওই তিথিতে। এই জ্যোতিরুচ্ছলিত তিথিটি ব্যাস পূর্ণিমা বা গুরু পূর্ণিমারূপে চিহ্নিত। অর্থাৎ গুরুব্যাসদেব এই অফুরন্ত আলোর নির্ঝর 'দিন যামিন্যৌ সায়ম্প্রাতঃ' আলোকের ঝরণাধারায় বসুন্ধরাকে তিনি অভিস্নাত করেছেন ও আজও করছেন। দ্বিজাতিরা তাঁরই হাত হতে পেয়েছে সুবিন্যস্ত চতুর্বেদ ও ব্রহ্মসূত্র অর্থাৎ বেদান্ত-দর্শন; আর 'স্ত্রী শূদ্র দ্বিজবন্ধু' বলে বেদাধিকার বঞ্চিত যারা, তারা পেয়েছে 'কাষ্ণ'বেদ' বা ইতিহাসশ্রেষ্ঠ মহাভারত আর মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবদ্। এক কথায়, তাঁরই কৃপায় আচণ্ডাল ভারতবাসী পেয়েছে প্রাণের ঠাকুর, প্রেমের ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণকে।

মহামুনি ব্যাসদেবের আরেক নাম 'কৃষ্ণদ্বৈপায়ন'। নামটি অসামান্য—ওর-ই মধ্যে বীজাংকুরে নিহিত আছে তাঁর স্বরূপ পরিচয়। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি পরাশরের জেলের মেয়েকে ভালবেসে গঙ্গার চরে ঘর বেঁধে বাস করার ইতিহাস পুটিত আছে 'দ্বৈপায়ন' পদবীতে। সমাজ বহির্ভূত অথচ নিকষিত হেমের মত প্রেম আর সুগভীর শ্রদ্ধায় আত্মসুখ বিরহিত আত্মনিবেদন—দুয়ের সম্মিলনে নারায়ণ স্বরূপ ব্যাসকৃষ্ণের আবির্ভাব। এই ব্যাসকৃষ্ণ ছাড়া শ্রীকৃষ্ণকে ধারণা করবে কে?

যেমন তাঁর পিতা বিষ্ণুপুরাণ কর্তা মহামুনি পরাশর, তেমনি তাঁর অনন্যা

জননী সত্যবতী। পিতা পরাশর যেমন অকুণ্ঠচিত্তে নিজ পিতৃত্ব স্বীকার করে 'মৎস্যগন্ধার' গর্ভজাত ঔরস সন্তানটিকে পাঁচ বছর বয়সেই নিজে এসে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন ব্রাহ্মণ সমাজে মাও তেমনি সমাজ সংসারে অকম্প-কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, 'হাঁ ব্রহ্মর্ষির পরিচর্য্যা করে কুমারী কালেই গর্ভধারণ করেছিলাম আমি।' সেই দিন হতে ভারতেতিহাসে 'মৎস্যগন্ধা'র নামান্তর 'সত্যবতী'। মহাভারতের প্রথমেই গ্রন্থ সঙ্কলয়িতা বিনা দ্বিধায় বলে দিয়েছেন, 'আমি মায়ের কানীন পুত্র, কিন্তু জেন, আমি সত্যবতী-সুত।' মহাকাব্যের মহাকবির এই 'বিশাল বুদ্ধি' এই 'ব্যাস চেতনা' (integral view) ভারতের জনসাধারণকে গোড়া হতেই যেন প্রস্তুত করে তোলে রাসরসিক গোপীবল্লভকে 'স্বয়ং ভগবান' বলে চিনে নিতে। সত্যসন্ধ অমলিন প্রেমের অমৃত ফলস্বরূপ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ছাড়া, বেদাচার শৃঙ্খলিত আভিজাত্যদর্পিত আর্যাবর্তের কুরু-পাঞ্চাল সংস্কৃতির বুকের উপর স্বৈরাচারী যদুকুলোৎপন্ন গোপান্নভোজী গোপবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের রত্ন সিংহাসন আর কে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারত? কে জগতকে দিতে পারত মহাভারতের 'জ্ঞানময় প্রদীপ' শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা? কে আপামর সর্বসাধারণের হৃদয়ভরে দেবার জন্য চয়ন করতে পারত 'নিগম-কল্পতরু'র 'গলিত ফল' শ্রীমদ্ভাগবত? আর কেই বা তাঁর সমগ্র জ্ঞানৈশ্বর্যের 'হিরণ্য পরিধি'তে শ্যামসুন্দরকে অনৈসর্গিক প্রভামণ্ডিত করে গুরুগর্জনে দৃপ্ত হুঙ্কারে বলতে পারত—'এতে চাংশকলা পুংস কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্। ইন্দ্রারি-ব্যাকুলম্ লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে'। ভাঃ ১।৩।২৮

আমি নিজে বিশ্বাস করি শ্রীকৃষ্ণ ঐতিহাসিক পুরুষ, কবি কল্পনা নন্। কিন্তু যাঁরা এককথায় অবিশ্বাসী, ইতিহাসের 'পাথুরে প্রমাণ', প্রাচীন মুদ্রাদি বা কীটদষ্ট তালপাতার জীর্ণাবশেষ পুঁথির সাক্ষ্য ছাড়া ভারতব্যাপ্ত নিরবচ্ছিন্ন কিম্বদন্তিকে যাঁরা প্রামাণিক মনে করেন না, যাঁরা জানেন না পশ্চিমের ঐতিহাসিকরাও ইতিহাস নির্ণয়ের পঞ্চবিধ প্রমাণের মধ্যে কিম্বদন্তিকে (tradition) দিয়েছেন চতুর্থ স্থান—তাঁদের সবিনয়ে বলব, শ্রীকৃষ্ণলীলা যদি কল্পনাই

হয়, তবে আমাদের জন্য সে কল্পনা যিনি করেছিলেন তিনিই আমাদের কৃষ্ণ। শাস্ত্রও বলে গুরুগোবিন্দে ভেদ করতে নাই। বৃন্দাবনের কৃষ্ণ যদি ব্যাসের কল্পনা, ভাল—ব্যাস তো আছেন বেদবিভাগ কর্তারূপে, আছেন ব্রহ্মসূত্রে, পাতঞ্জলের ব্যাসভাষ্যে, ইতিহাস পুরাণে। বুঝি, বাসুদেব কৃষ্ণকে উপস্থাপিত করতেই মহামুনি নিজেও নাম নিয়েছিলেন 'কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন'। কে বলে কৃষ্ণ নাই? একটি জাতির উষালগ্ন হতে তার মহানিশা পর্যন্ত, একটি উপমহাদেশের 'আসমুদ্র হিমাচল' উত্তর-দক্ষিণ সর্বত্র এবং 'আসমুদ্র বৈ পূর্বাৎ আসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ'—আবাল বৃদ্ধবনিতা স্মরণাতীত কাল হতে যাঁকে পূজা করে চলেছে, শ্বাসে-প্রশ্বাসে যাঁর নাম জপ করে চলেছে, সেই কৃষ্ণও যদি কবি কল্পনা হন তো, সত্য কাকে বলে জানতে চাই না—"স্বপন যদি মধুর এমন, হ'ক সে মিছে কল্পনা···"। আচ্ছা, কত যুগ আগে হতে এদেশে কৃষ্ণ কথা ছড়িয়ে পড়েছিল? খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতক তখন। উত্তরাপথপতি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের ঘরে এসেছে গ্রীক রাজকন্যা হেলেন আর রাজসভায় এসেছেন পণ্ডিত মেগাস্থিনিস। তাঁর ভারত-বিবরণ 'ইণ্ডিকা'য় মথুরা এবং কৃষ্ণপুরের উল্লেখ আছে, আছে যমুনার নাম। আর ভারতীয় দেবতাদের অন্যতম হিসাবে শূরসেনবাসী পূজিত শ্রীকৃষ্ণের কথাও যে আছে তা তুখোড় ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরাও কৃপা করে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে এসেই চমকে উঠেছেন তাঁরা। না, আর সন্দেহের অবকাশ নাই এবার। এ যে পাথরের বুকে অক্ষয় অক্ষর "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়"।

অবিশ্রান্ত ঘন ঘোর বৈদেশিক আক্রমণে ভারতেতিহাসের 'পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা'। তার মধ্যে ভারতভাগ্য বিধাতা কেমন করে আমাদের জন্যে একটি 'পাথুরে প্রমাণ' জিইয়ে রাখলেন, কি ভাবে বিদেশীর হিংস্রতা হতে সেটি রক্ষা পেল—ভাবতে গিয়ে ওটিকে 'লীলাময়ের লীলা' ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় না। আমি মধ্য প্রদেশের বেসনগর (ভিলসা) গরুড় স্তম্ভের কথা বলছি। খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে ভারতের উত্তরপশ্চিম সীমান্ত জুড়ে বসেছিল 'যোন-

বাহলীক' (Greoco-Bactrian) রাজন্যবর্গ। তক্ষশিলাপতি Antialkidas-এর গ্রীক রাজদূত ডিওন পুত্র হেলিও ডোরস (Helio Doros) বাসুদেব কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন অখণ্ড-প্রস্তর খোদিত ওই গরুড় স্তম্ভটি স্থাপন করে। যে ধর্ম্ম এমনই যে একজন গ্রীক রাজপুরুষকে বৈষ্ণব করে তুলে স্তম্ভ গাত্রে তাঁকে দিয়ে লিখিয়েছে 'দান ত্যাগ ও অপ্রমাদ ওই তিনটি অমৃত-নিস্যান্দি ধর্ম্ম জীবকে কৃতকাম করতে পারে' (যথাক্রমে গীতা ১৬৷১-২ ও মহাভারত স্ত্রীপর্ব ৭৷২৩-২৫) সে ধর্ম্মের প্রাচীনতা ও প্রামাণিকতা নিয়ে এর পর আর তর্ক তুলে লাভ কি? খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকের প্রথমেই গৌতম বুদ্ধ আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনশ বছর পরে মেগাস্থিনিস শ্রমণদের নাম করলেও গণধর্ম্ম হিসাবে পাশুপত শৈব ও শৌরসেনী কৃষ্ণোপাসকদেরই স্থান দিয়েছেন। বৌদ্ধযুগের আগেই শ্রীকৃষ্ণ গণদেবতা হয়ে উঠেছিলেন, এর পরও কি তা নিয়ে তর্ক করব? সে তর্ক থেমে যাওয়া উচিত—প্রতিষ্ঠান রাজ সাতবাহন হালের 'গাথাসপ্তশতী' পড়ে।

প্রাকৃত ভাষায় রচিত এ-গাথাগুলি দেশময় ছড়ানো গোপীগীতির সঙ্কলন ছাড়া আর কিছু নয়। মাত্র কয়েকটি পদে (২৷১২, ২৷১৪, ২৷২৮, ৫৷৪৭) সোজাসুজি গোপী, যশোদা, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার নাম মিললেও রসিক মাত্রেই গাথাগুলি পড়ে বলতে বাধ্য হবেন, স্পষ্ট করে না বললেও 'শুধু গুঞ্জনে কুজনে গন্ধে সন্দেহ হয় মনে। লুকানো কথার হাওয়া বহে যেন বন হতে উপবনে।' এইসব গাথারই পরবর্তী কালের সুবিশাল মহাজন পদ পদাবলী কীর্তন ও কৃষ্ণলীলাশ্রিত গাথাই বৈষ্ণব সাহিত্যের আকর। গাথাগুলিতে পূর্বরাগ আক্ষেপানুরাগ সখিসংবাদ দূতিসংবাদ স্বয়ং দৌত্য মান বিপ্রলব্ধা খণ্ডিতা কলহান্তরিতা—প্রেম বৈচিত্র্যের সকল রসেরই খবর আছে। আছে রূপোল্লাস ও রসোদ্গার। দুই ছত্রের ছোট ছোট গাথা, কিন্তু কি তার বাগবৈদগ্ধ্য আর ভাবমাধুর্য! পড়লেই মন গুণগুনিয়ে ওঠে—

"সেই বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম সবই
আজ পড়ে মনে মোর পড়ে যে কেবলই মনে···

সেই ফুল ফুল খেলা কত অরণ্য বনে
কত তারা ঝিকিমিকি আকাশের আলপনে
সেই মুরলী ধ্বনি শুনি, আজও পিয়াসী মনে
খোঁজা কুঞ্জে কুঞ্জে মিলন মনমোহনে।"

পাশ্চাত্য বুধমণ্ডলী এদেশের ইতিহাসকে খৃষ্টাব্দের যত এপারে ঠেলে দিতে পারেন ততই স্বস্তি পান। 'গাথা সপ্তশতীর' বয়স কত? বিস্তর কষামাজা করে কীথ (Keith) সাহেব বলেছেন খৃষ্টীয় প্রথম শতক। বেশ তাই সই; কিন্তু অতকাল আগেই গোপীকৃষ্ণ বিলাস এ দেশের লোক সঙ্গীত হয়ে গেছে তো?

উত্তরাখণ্ডে যেমন 'গাথা সপ্তশতী', দক্ষিণাপথে চার হাজার পদ সম্বলিত 'দিব্যপ্রবন্ধম'। গোপীভাবলুব্ধ রাগমার্গী আলবারবৃন্দ দাক্ষিণাত্যের সুপ্রাচীন বৈষ্ণবসম্প্রদায়। তামিল ভাষায় রচিত তাঁদের পদগুলি ওদেশে 'তামিলবেদ' বলে মর্য্যাদা পেয়েছে। ইতিহাস পুরাণ যেমন পঞ্চমবেদ। সার্বজনীন ও অতি প্রাচীন না হলে ভারতে কোন কিছু 'বেদ' আখ্যা সহজে পায় না। 'দিব্যপ্রবন্ধে' গোপবধূ ও গোপীবল্লভের লীলাকথা তো আছেই, আছে কৃষ্ণপ্রিয়া এক প্রধানা গোপীর কথা। প্রেমিক ভক্ত আলবারেরা মধুর ভাবে ভজনা করতেন পরমসুন্দরকে। সমগ্র ভারতের গণচিত্তের নিখাত সুদৃঢ় ভিত্তিতে এই ভাগবত ধর্ম্ম, খৃষ্টাব্দের প্রথম প্রহর হতেই বিদেশীদেরও চিত্ত জয় করেছে। প্রেমধর্মে পরদেশীকে অনায়াসে জাতে তুলে নিয়েছে, কথাতেই বলে 'জাত হারালে বৈষ্ণব'। শ্রীমদ্ভাগবতও যখন উদাত্ত সুরে বলেন—

'কিরাত-হূণান্ধ্র-পুলিন্দ পুক্কসাঃ আভীর শুহ্ম-যবনাখশাদয়ঃ।

যেঽন্যে চ পাপা যদুপাশ্রয়া শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ'। ২।৪।১৮)

তখন ভারতেতিহাসের ছাত্র তা ভাগবত সম্প্রদায়ের অসার অলীক দম্ভোক্তি বলে মনে করতে পারে না। মধ্য এশিয়ার দুরন্ত ইয়েচি হূন শকরা সত্যই তো ধীরে ধীরে শৈব ও বৈষ্ণব হয়ে গেছে। এবং শেষ পর্যন্ত বৈষ্ণবরাই হয়েছেন দলে ভারি। তার কারণ, একবার বর্ণনা শুনলেই—

'শ্যামরূপ জাগয়ে মরমে। পাশরিব মনে করি তবু পাশরিতে নারি, মজাইল কুলের ধরমে।' আর সেই বাঁশির ডাক?—"বাঁশি মজালে কাঁদালে সই লো মোরে! চাই দিবস রজনী হেরি তারে—বলগো ভুলি কেমন করে?"

মধ্য এশিয়ার মরুচর যাযাবর জাতিরা একে তো 'ভুবন মনোমোহিনী ভারত লক্ষ্মীর নীলসিন্ধুবিধৌত শ্যামশ্রী' আর 'তুষারশুভ্র কিরীটিনী' গরিমায় বিমোহিত হয়েছিল, তার 'অনিল বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চলে'র ছায়ায় ঘর বেধে শান্তি পেয়েছিল—তার উপর সারেঙ্গী, একতারা, গোপী যন্ত্র, সারিন্দার সঙ্গে বাউল বৈরাগীর ঐসব নাচ গানে তাদের মন চুরি গেল বৈকি। এমন রসের কথা, রাসের কথা আর কবে কোথায় তারা শুনেছে? তাই দেখতে না দেখতে কুষাণ রাজের চতুর্থ পুরুষ নাম নিল বাসুদেব, দুর্দান্ত শক ক্ষত্রপরা গিরনারের 'সুদর্শন হ্রদ' রক্ষণাবেক্ষণ করতে লাগল হিন্দু হয়ে গিয়ে। রাজস্থানে তাদের মস্ত উপনিবেশে হোরি'র সমারোহ এল। ঘরে ঘরে বসেন গিরিধারীলাল, কিষ্ণজী। রাজপুতরা শক, হূণদেরই উত্তর পুরুষ। তবু যখন ইউরোপীয় পণ্ডিত মণ্ডলী উপরোক্ত ভাগবতের শ্লোকটি হতে কেবল এই সিদ্ধান্ত করেন যে সপ্তম শতকের আগে কখনই ভাগবত রচনা হয়নি—কারণ ওতে শক হূণদের নাম আছে। তখন সকরুণ হাসি হাসা ছাড়া উপায় থাকে না। কি করবেন ওঁরা? বাসুদেব কৃষ্ণকে কোন মতে বুদ্ধের বহু পূর্ববর্ত্তী বললেও Krishna-cult-এর বীজোদ্গম কি খৃষ্টের অনেক আগে হতে পারে? না, না, তাহলে যে ঈশা পুরুষোত্তমধামে এসে গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন—তিব্বতীদের হিমিস্ গুম্ফার এ সাক্ষ্য সত্য বলে প্রমাণিত হলেও হতে পারে। তাই থাক্ ওঁদের তর্কাতর্কি, ঘরের কথাই বলি।

গাথা সপ্তশতী সঙ্কলনের কাল হতে (খৃঃ প্রথম শতক) যত এগিয়ে চলি শ্রীকৃষ্ণের ভারতব্যাপী জয়যাত্রাই কেবল চোখে পড়ে। কেনই বা তা না হবে? সম্যক্ সম্বুদ্ধের 'মৈত্রী, করুণা ও মুদিতা'র বাণী এবং ত্রিশরণ-মন্ত্র ভারতীয় সমাজের'পরে চেপে বসা পুরাতন বিধি নিষেধের বজ্রমুষ্টিকে অনেকটাই শিথিল

করে দিয়েছিল। তার ফলে উপরভাষা ভাবে সমগ্র ভারতে বৌদ্ধ মতবাদের প্রবল প্রতিপত্তি দেখা দিলেও বস্তুত ভাগবত সম্প্রদায়েরই চলার পথ সুগম হয়ে গিয়েছিল। গোতম বুদ্ধ বৈদিক ধর্মের প্রধানতম অঙ্গ পশুবধে যজ্ঞ পালন নাকচ করেছিলেন। কিন্তু তার অনেক আগেই তো গোকুলাখ্য মহাবনে তরুণ জননায়ক গোপবন্ধু শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রযজ্ঞ বন্ধ করে গো-পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব প্রচলন করে মহাবিপ্লবের সঙ্কেত দিয়েছিলেন। আর বুদ্ধবাণীর সঙ্গে গীতার বাণীর বিরোধ কই?—"অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্। দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং…॥" গীতা ১৬।২ কিম্বা—"অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ…। গীতা ১২।১৩

কুরুক্ষেত্র মহাসমরের পটভূমিকায় পার্থসারথি যা বলেছিলেন, গোতম বুদ্ধ কি তারই সার্থক ভাষ্যকার নন? যতিধর্ম শেখাবে? 'ভিক্ষু' হব কেন সে জন্য? ঘরে থেকেই জানব—'জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্॥ অসক্তিরনভিষ্বঙ্গ পুত্রদার গৃহাদিষু' (গীঃ ১৩।৯)।

ভাগবতের মতে শ্রীভগবানের অসংখ্য অবতার যুগে যুগে ধর্মগ্লানি দূর করে ধর্মকে সংস্থাপিত করেন। বুদ্ধদেবও তেমনি একজন অবতারী পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ তিনি। এর মধ্যে অযৌক্তিতা কিছু ভারতবাসী দেখেনি। তাই দেখি, ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের আলো ক্রমেই স্তিমিত হয়ে জোর ধরেছে ভাগবত ধর্ম।

এ যুগে পশ্চিমের Indologist রা কিন্তু আবার আমাদের বুদ্ধি বিভ্রান্ত করেছে। তাদের ওই এক রায়, বৌদ্ধ ধর্মের অনেক পরে বুদ্ধের বাণী ও উপদেশ নকল করে ভাগবতরা মাথা তুলেছে। তাদের আঞ্চলিক হিরো বাসুদেব কৃষ্ণের মুখে বসিয়েছে বুদ্ধের বোলচাল। আমরা এর কি প্রতিবাদ করব? 'বেদমীমাংসা'র স্বনামধন্য গ্রন্থকার শ্রীঅনির্বাণ তাঁর অপরিমেয় পাণ্ডিত্য ও অনন্যসাধারণ মনীষা সহায়ে দেখিয়ে গেছেন বৈদিক সপ্তাদিত্যের অন্যতম বিষ্ণু ও সবিতাভগঃই পরবর্তী বৈষ্ণব এবং ভাগবত সম্প্রদায়ের 'ইষ্ট'। বৈদিক যুগে তাদের নাম ছিল 'পাঞ্চরাত্র' এবং পুরুষ সূক্তের (ঋ ১০।৯০) নারায়ণ ঋষিও খৃঃ পূঃ

৬০০ শতকের সৃষ্টি নন। শৌরি বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ বৈদিক সাহিত্যে সুপরিচিত মহাপুরুষ, সাধারণে তাঁকে না চিনলেও বেদবিভাগকর্তা তাঁর স্বরূপ জেনে স্বীয় গুরুশক্তি ও অকল্পনীয় বাণী বিন্যাসে তাঁকে যথাযোগ্য মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এই অবিনশ্বর কীর্তিতেই বেদব্যাস শ্রেষ্ঠাশ্রমীদেরও দিশারী—আদিগুরু।

হাজারো ঝুরি নামানো পুরানো বটের মত, আধুনিক ইতিহাসের প্রাগৈতিহাসিক কালে কবে যে এই সুবিপুল হিন্দুধর্মের উৎপত্তি কেউ তা বলতে পারবে না। বিস্মৃত স্মৃতির কাল হতে চতুর্বর্ণ চতুরাশ্রমে বিভক্ত এ দেশের সমাজ চতুর্বর্গের সাধনায় রত। গৌতম বুদ্ধের একার সাধ্য নাই তার বিচিত্র চাহিদা তিনি মেটাবেন। তিনি কেবল একাংশের চিত্তে উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিলেন মাত্র। বর্ণে ক্ষত্রিয় হয়েও গুণকর্মে যিনি ব্রাহ্মণকুলের নমস্য, গৃহবাসী হয়েও যিনি পরম সন্ন্যাসী ব্যাস-শুকদেবের নিত্যারাধ্য, সহস্র বনিতা পরিবৃত হয়েও আকুমার ব্রহ্মচারী কুরুকুল চূড়া পিতামহ ভীষ্মের মতে 'জিতেন্দ্রিয়'—একমাত্র তিনিই ভারতের সনাতন ধর্মপদবাচ্য হিন্দুধর্মের 'দশকর্মে' বরেণ্য পুরুষ। একদিকে তাঁকে দেখছি 'প্রপন্ন পারিজাতাতোত্রবেত্রৈক পানি' জ্ঞানমুদ্রাচ্য 'পার্থসারথি', অন্যদিকে তিনিই আবার 'গোপবেশে বেণুকর নবকিশোর নটবর'—"শ্রীরাধারমণ রমণী মনমোহন বৃন্দাবন বনদেবা। অভিনব রাসরসিকবরনাগর নাগরীগণকৃত সেবা॥" দেশের দুর্দিনে তাঁর পাঞ্চজন্য ও সুদর্শনচক্রধারী কৌরব কুলান্তক রৌদ্র রসঘন—মূর্ত্তি স্মরণ করে ভারতবর্ষ উর্দ্ধস্বরে ডেকেছে—"এস অশনি গর্জনে নাশিতে দুর্জনে এস সুদর্শনধারী হে।" আবার সুদিনে তাঁকে নিয়ে ঋতুতে ঋতুতে ঝুলনে রাসে দোলে মহোৎসবে মেতেছে। অভিজাত হিন্দু হতে আদিবাসী পর্যন্ত সকলেই সেই একজনকে স্মরণ করে গেয়েছে—"আজু কি আনন্দ আজু কি আনন্দ। ঝুলতে ঝুলনে শ্যামরচন্দ॥" পূর্বাঞ্চলে মণিপুরী নৃত্য, গুজরাটের লোকনৃত্য 'গরবা', দক্ষিণের 'কুরবইকুট্ট' যে নাচই দেখি, আর যে গান-বাজনাই শুনি বলতে হবে—

"আজও মনে পড়ে মোর পড়ে যে কেবলই মনে সেই চাঁদনী রাতে সেই অপরূপ রূপ রাস।"

আর্যাবর্তের তো কথাই নাই, গীতগোবিন্দের ললিত বন্দনায় নন্দিত—

"রাসে হরি মিহ বিহিত বিলাসম্।
স্মরতি মনো মম কৃত পরিহাসম্॥
বিপুল পুলক ভুজপল্লব বলয়িত বল্লব যুবতী সহস্রম্।
কর চরণোরসি মণিগণ বিভূষণ কিরণ বিভিন্ন তমিস্রম্॥"

রাসবিহারী বংশীধারী অথচ সর্বোপনিষদসার গীতা প্রবক্তা 'বিদগ্ধমাধব' তো কবেই সেখানে রাজাসন অধিকার করেছেন। প্রাচীন বসন্তোৎসব শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করেই নাম নিয়েছিল 'হোরি'—হিন্দুস্থানের সব চেয়ে উল্লাসমত্ততা এই রংয়ের খেলায়—"হোরি হো রঙ্গে মাতি। শ্যামচাঁদ সনে ব্রজযুবতী॥"

হিমালয় শীর্ষে ব্যাসের বদরিকাশ্রমে যিনি 'নর-নারায়ণ', দক্ষিণে তিনিই 'শ্রীরঙ্গনাথন', 'তিরুপতি বালাজী বরদরাজ' পশ্চিমে সমুদ্রতট তো তারই চরণ চিহ্নাঙ্কিত গিরনার সেই 'গিরিনগরী' ভীমকান্ত রৈবতক, পর্বত দুর্গ রূপে যা পাহারা দিত সমুদ্রদুর্গ দ্বারাবতীকে। দ্বারকায় তাঁর বিগ্রহের নাম 'রণজোড়জী'—নামটিতে ভারত যুদ্ধের 'শান্তিপর্ব' সূচিত হচ্ছে। পরে এ বিগ্রহ গুজরাটের 'ডাকোরে' স্থানান্তরিত হয়েছিল। গুর্জরে বা গুজরাটে বৈষ্ণব ধর্মের অসামান্য প্রভাব। সেখানে আর এক দেবতা পন্ধরপুরের 'বিট্‌ঠলদেব', রাগমার্গে তাঁর ভজনা বহু পুরাতন। আধুনিক ঐতিহাসিক বলেন গুর্জর জাতি বহিরাগত। শক হূণদের মতই মধ্য এশিয়ায় তাদের আদি বাস ছিল। কিন্তু এদেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের চূড়ামণি রূপ-সনাতনদের মতে ওরা ব্রজের প্রত্যন্তবাসী। আভীর শবরদেরই শাখাভেদ মাত্র। গুজরাটিরা যেখানকার আদিবাসীই হন, তাঁরা যে নন্দ-দুলালকে হৃদয়ে আসন দিয়েছেন এই তো যথেষ্ট। উত্তর দক্ষিণ পশ্চিম সর্ব্বত্র যে 'ব্রজকিশোর কালিয়হর কাতর ভয়ভঞ্জনে'র প্রেমাঞ্জন চোখে লেগেছে সবার, আমরা এটুকু জেনেই খুসী। আর পূর্বে? বঙ্গোপসাগর তীরেও কার 'নীলচক্র'।

শ্রীজগন্নাথ কোন 'নীলমাধবের' স্মৃতি অবশেষ ?

"পরব্রহ্মাপীড় কুবলয়দলোৎফুল্লনয়নো
নিবাসী নীলাদ্রৌ নিহিতচরণোঽনন্তশিরসি।
রসানন্দো রাধাসরসবপুরালিঙ্গনসুখো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥"

উৎকলখণ্ডে অদ্ভুত একটি উপাখ্যান পেয়েছি। প্রভাসে যখন অগ্নিসাৎ করা হল 'মহাযোগেশ্বর হরি'র পূত মর্ত্যকায়, তখন বৈশ্বানর নাকি 'ব্রাহ্মীসৃষ্টির সারভূত' অনিন্দ্যগঠন নিরুপম সেই শ্রীমূর্ত্তির ললাট, মুখাবয়ব বাহু হৃদয় উদর ঊরু ও জানু এই কয়স্থান অবিরাম প্রয়াসেও ভস্ম করতে পারলেন না। অবশেষে সেই অঙ্গারবর্ণ দেহাবশেষ ব্রজের শবর-শবরীরা প্রিয়তমের পরম দান জ্ঞানে বুকে তুলে নিল। জগন্নাথ বিগ্রহ নাকি সেই দগ্ধাবশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ বপুরই অবিস্মরণীয় প্রতীক। পরে মিলিয়ে দেখলাম, ঠিক বটে। তাই শ্রীজগন্নাথের ললাটই পরিদৃশ্যমান—মাথার চাঁদি নাই, হাত আধখানা। চোখের জলে ভেসে তখন ভাবলাম, একেই বলে প্রেম ; একদা যে ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি'তে, 'দৃশ্যাং পানপাত্রঃ' যে রূপে মজে জাতি-কুল-মান খুইয়ে ছিল গ্রাম্য পশুপালিকারা—লীলাবসানে তাঁরই অর্দ্ধদগ্ধ বিরূপ কুশ্রী ভয়াবহ দেহাবশেষকেও তারা 'প্রীতম' জ্ঞানে পূজা দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত ওই বিগ্রহই অক্ষয় করে রেখেছে মহাদারুর মাধ্যমে। এই জন্যই ব্রাহ্মণসেবিত শ্রীজগন্নাথের 'দয়িতা পাণ্ডা'রা শবর-কুলোৎপন্ন। ব্রজযাত্রার স্মারক ভারত বিখ্যাত রথযাত্রায় কেবল তাঁদেরই সেবাধিকার। আরও অনেক কথা বলা চলে শ্রীক্ষেত্র পুরুষোত্তমধামের বিগ্রহত্রয়কে নিয়ে, কিন্তু সময়াভাব।

পুরুষোত্তম জগন্নাথদেবের তত্ত্ব হিন্দু মাত্রেই এককালে জানতেন। তা নইলে অষ্টম শতকে শঙ্করাচার্য সমগ্র ভারতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিজয় বৈজয়ন্তী পুনঃ প্রোথিত করলেন যখন, তখন পূর্বাঞ্চলে তাঁর যে মঠ স্থাপিত হল, তার নাম তিনি 'গোবর্ধন মঠ' কেন রাখলেন ? অর্থাৎ জগন্নাথ পুরী যে কার পুরী সে তাঁর

অজানা ছিল না। উপরোল্লিখিত স্তবটি তাঁরই রচনা বলে প্রখ্যাত। কোন্ রহস্যই বা তিনি জানতেন না ?

নাধীত-শ্রুতয়ো ন তত্ত্বমতয়ো ঘোষস্থিতা গোপিকা
জারিণ্যঃ কুলজাতি ধর্মবিমুখা অধ্যাত্মভাবং যযুঃ।
ভক্তি যস্য দদাতি মুক্তিমতুলাং জারস্য যঃ সদ্গতি—
হ্যার্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান নারায়ণো মে গতি ॥

—আর্তত্রাণাষ্টাদশক

অতি প্রাচীন ভারতেতিহাসের যুগ-যুগান্ত-পরিব্যাপ্ত গাঢ় তমিস্রার মধ্যে 'মধুর 'মধুর বৃন্দাবিপিনমাধুরী'-প্রবেশচাতুরীসার। 'বরজ-যুবতী-ভকতি'-গাথা সুব্যক্ত হয়েছে যে সব দূরে ব্যবস্থিত দীপস্তম্ভের দ্যুতিতে—এতক্ষণ আমরা বলতে গেলে কেবল সেইগুলির দিকে লক্ষ্য রেখেই পথ চলছিলাম। কিন্তু এবার আমাদের গতি আর 'মার্গাচলব্যতিরেকাকুলিতা' নয়। এখন কূলপ্লাবিনী কালিন্দীর কলকল নিনাদে মুখর ঝঙ্কার উঠেছে দশদিকে—

হে দেব হে দয়িত হে জগদেকবন্ধো
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো।
হে নাথ হে রমণ হে নয়ণাভিরামঃ
হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশ্যোর্মে ॥

শঙ্করাচার্য দ্রাবিড়ের ছেলে। দাক্ষিণাত্যের 'লীলাশুক' বিল্বমঙ্গল আদিতে শঙ্করপন্থী সন্ন্যাসীই ছিলেন। তারপর ডুবে গেলেন শ্যামসিন্ধুতে। ভারতের মধ্যযুগ 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'র উর্মিলহরী-বিক্ষোভিত। শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর যাঁকে ভারতবর্ষ বহুযুগ পরে 'জগদ্গুরু' বলে মর্যাদা দিয়েছিল, তিনি আচার্য শঙ্কর। শ্রুতি স্মৃতি ও ন্যায়—প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য রচনা না করলে সেকালে আচার্য হওয়া যেত না। শঙ্কর স্মৃতি প্রস্থান বলতে বেছে নিয়েছিলেন 'গীতা'। তাঁর শ্রীকৃষ্ণ স্তোত্রমালা এত মধুর যে বুঝতে বাকী থাকে না, ব্যাসের স্বপ্ন সত্য হয়েছে। ভারতবর্ষ মেনেছে শ্রীকৃষ্ণ 'স্বয়ং ভগবান'। 'শুকমুখামৃতদ্রবসংযুত' কৃষ্ণলীলা

গণচিত্ত পুরোপুরি অধিকার করেছিল কবেই। এবার জ্ঞানমার্গীর পক্ষেও ‘গীতা-মন্ত্রমালা’ ও ‘পারমহংসষ্যসংহিতা’ ভাগবতকে অমান্য করা আর সম্ভব হবে না।

দশনামা-সম্প্রদায়ের আরেক সন্ন্যাসী শ্রীধর স্বামীর টীকায় ভাগবতের উজ্জ্বল রস উজ্জ্বলতর হল। “শৃঙ্গারকথাব্যপদেশেন নিবৃত্তি পরেয়ং পঞ্চাধ্যায়ী” রাসলীলার এই ব্যাখ্যা ধুয়ে মুছে নিল সব সংশয় ও অপবাদের জঞ্জাল। ঋষি গঙ্গা সরস্বতীর সঙ্গে মিশল জ্ঞান-গঙ্গা ও প্রেম-যমুনা। সেই ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করে বেদানুগ হিন্দু সমাজ যখন শুচিশুভ্র নির্ম্মল শ্রদ্ধায় ‘শ্রীরাধামাধব চিন্তনে’ ব্যাপৃত, তখন গোস্বামী জয়দেব এসে বললেন, জান, রাধাঠাকুরাণীর পায়ে ধরে মান ভিক্ষা করেছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ—‘দেহি পদপল্লব মুদারম্’। কারো কানেই আর অসঙ্গত ঠেকল না কথাটা। আহা, ‘মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্’—তিনি যে প্রেমের কাঙ্গাল আমাদের, এই সুরই বাজতে লাগল লক্ষ-কোটি চিত্তে—“নিধুবনে রাজা প্যারী তার কোটালী করলে হরি।

তার চরণ ধরে কেঁদেছিলে ব্রজ মাঝে কে না জানে॥”

চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতিদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে হিন্দুস্থানের ভক্ত-কবিও গেয়ে উঠলেন শ্রীরাধার প্রেম গর্বগুঞ্জরিত অপূর্ব মাথুর—

‘বৈরাগ যোগ কঠিন উধো হম্ না পারবে হো…
যমুনা জল অতি গহির তন্‌মন মম নহতো থির্
শ্যাম বিরহ-বিধুর অঙ্গ হম্ তঁহি ডারব হো·· ’

সারা ভারতের হৃদয়সিন্ধু মন্থিত এই প্রেমভক্তি রসোল্লাসের মূর্ত্ত বিগ্রহ রূপে এইবার ‘পূর্ব অচলে উষার মত’ দেখা দিলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব—

“গোরা করুণাসিন্ধু অবতার।
নিজগুণে গাঁথিয়া নাম চিন্তামণি
জগতে পরাওল হার।
(পরালো গো জগৎবাসীর গলে
পরিণামের হার হরি নামের হার)।”

সে কি অন্য কেউ ? মহাপুরাণ ভাগবতের বুক হতেই উঠে এসেছে সে—

"রাধে শ্যাম নব-ঘন মনোচোরা
রাই অঙ্গের এত ছটা লেগে শ্যাম হল গোরা।
(বিভাবিত হল গো, বিভাবিত হল শ্রীরাধার ভাবে শ্যাম)
গৌর হল ভাবিনীর ভাবাবেশে ভোরা ॥
ভাবনিধির একি রঙ্গ, শ্যাম হল গৌরাঙ্গ
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলে কেঁদে লুটায় ধরা।
(তাঁর মনে নাই, মনে নাই গোপী সনে রাস বিলাস
সে যে নাগরেন্দ্র চূড়ামণি মনে নাই মনে নাই)
(ও সে) হরি হরি হরি বলে ভাবে মাতোয়ারা ॥"

এর পরও কি 'ওরা হাসে,···বলে কৃষ্ণ কাহিনী কবি কল্পনা—কবি কথন' ? যারা বলে, থাক তাদের কথা—

"মরম না জানে ধরম বাখানে এমন আছয়ে যারা।
কাজ নাই সখি তাদের কথায়, বাহিরে রহুন তারা ॥"

'রাধা-ভাবদ্যুতিসুবলিত হরি-পুরট সুন্দর' শ্রীগৌরাঙ্গ আসতেই পূর্বভারত নাম তরঙ্গে ভেসে গেল। পরিব্রাজক শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে প্রয়াগে বল্লভাচার্য ও ত্রিহুতের বিখ্যাত বৈদিক পণ্ডিত রঘুনাথ উপাধ্যায়ের নাকি দেখা হয়েছিল। মহাপ্রভুর প্রেমোন্মাদ দেখে আর্যাবর্তের অন্যতম বৈষ্ণবাচার্য বল্লভ ও রঘুনাথ উপাধ্যায়কে মানতে হয় 'সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোঁসাঞি'। উপাধ্যায় বলে উঠলেন—

"শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ম্ আদ্য এব পরো রসঃ ॥"

এর কিছুদিন পরেই রাজস্থানে 'প্রেমদীবানা মীরা' এলেন—

"মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর হরিচরণাচিত রাতী।
পল পল তেরা রূপ নিহারূঁ নিরখ নিরখ সুখ পাতী ॥"

শ্রীচৈতন্য আবির্ভূত হওয়ার পর ভারতের অধ্যাত্মরাজ্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী 'একমেবা-দ্বিতীয়ম্' অধিনায়ক ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। কোন যশস্বী কবি, কোন গায়ক তাঁকে 'প্রণয় পত্রী' না লিখেছেন? 'মানপত্র' না দিয়েছেন কোন মনীষী? আর 'জয়পত্র' সমর্পণ করেন নি কোন সন্ত মহাপুরুষ?

ঊনিশ শতকে আবার প্রভুর অবতার হল—শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে পেলাম আমরা। দক্ষিণেশ্বরের জমাট বৈঠকে যে সব গান হত তার মধ্যে একটি হল শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ অনুরোধে নরেন্দ্রনাথের গাওয়া মাথুরের গান—

"কাঁহে সই জীয়ত মরত কি বিধান
ব্রজকি কিশোর সই কাঁহা গেল ভাগই
ব্রজবধূ টূটল পরাণ।"

গাইতে গিয়ে পুরুষাভিমানী নরেন্দ্রনাথের চোখ ভিজে ওঠে, শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবস্থ! শিক্ষিত সমাজে গানটির পরিবেশন কর্ত্তা সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র (মৃণালিনী উপন্যাস)। আমার চিত্তে ওই গানটি সে যুগের তিন দিকপালকে এক সূত্রে বেঁধে রেখেছে। তাই বিশেষ করে ওর উল্লেখ করছি। উদ্দেশ্য, বৃন্দাবন লীলা যে 'জগমন চোরা' তা-ই প্রতিপাদন।

দার্শনিক হেষ্টিং সাহেব ষ্টেটস্‌ম্যানে শ্রীকৃষ্ণের কটু সমালোচনা করায় বঙ্কিমচন্দ্র কড়া জবাব দিয়েছিলেন। তাঁর 'কৃষ্ণ-চরিত্র' রচনার মূলে ঐ সব বিদেশীদের কৃষ্ণলীলার মূলোচ্ছেদ করারই সদুদ্দেশ্য ছিল। আর রবীন্দ্রনাথ? 'কানু ছাড়া গীত নাই' বাঙ্গালীর এ লোক প্রবাদ রবীন্দ্র-সঙ্গীতেও সপ্রমাণ। তাছাড়া তের বছর বয়সে এ যুগের কবিগুরু প্রথম যে দুইছত্র রসোতীর্ণ কবিতা লিখেছিলেন—"গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে। মৃদুল মধুর বংশী বাজে॥" 'ভানুসিংহের পদাবলী' তারই উত্তর পর্ব।

বিশ শতকে ধর্মজগতে চলেছে শ্রীরামকৃষ্ণের অনুবর্ত্তন, সাহিত্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের একাধিপত্য। সেই সঙ্গে চিন্তাজগতে আরেকটি নবদিগন্তের দুয়ার খুলেছে—স্বদেশীয়ানা, জাতীয়তাবোধ। ১৯০৫ সনের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে

তার প্রকাশ্য পরিচয় মিলল। এই জাতীয়তা আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ—

"অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু স্বদেশ আত্মার
বাণীমূর্তি তুমি—"

বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ আমাদের বাসুদেব কৃষ্ণকে ভালবাসেন? কারাকাহিনী হাতে পড়ল! একনিঃশ্বাসে পড়ছি বা গোগ্রাসে গিলছি যেন। চোখে পড়ল, "যিনি মানব মাত্রে, জাতিতে, স্বদেশে দুঃখী গরীব পতিত পাপীতে নারায়ণকে দেখিয়া সেই নারায়ণের সেবায় জীবন সমর্পণ করেন তাঁহারই হৃদয়ে নারায়ণ আসিয়া বসেন। —সেদিন হইতে আমি জগতের ঘটনা সকল নিরীক্ষণ করিতে করিতে মঙ্গলময় শ্রীহরির আশ্চর্য অনন্তমঙ্গল স্বরূপত্ব উপলব্ধি করিতেছি।" কয়েক পৃষ্ঠা পড়েই এক একবার এমন বোধ হইত যেন ভগবান সেই বৃক্ষতলে আনন্দের বংশী বাজাইতে দাঁড়াইয়াছেন এবং সেই মাধুর্যে আমার হৃদয় টানিয়া বাহির করিতেছেন। বই নামিয়ে রেখে ভাবলাম রবীন্দ্রনাথ কি শুধু শুধুই লিখেছেন 'লহ নমস্কার'। আরও পরে জানলাম কারাগারেই দিব্যদর্শন হয়েছিল শ্রীঅরবিন্দের। সে অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই দেখতেন না তিনি—সর্ব্বত্র সেই সচ্চিদানন্দ যেন ঘন বিগ্রহ পুরুষোত্তম।

অরবিন্দ ঘোষ এর পরই হয়ে গেলেন 'শ্রীঅরবিন্দ'। তাঁর পাশ্চাত্য বিদ্যার অমেয় ঐশ্বর্য নিয়ে গীতার ব্যাখ্যা লিখে তিনি আধুনিক যুগের মণিকোঠায় নতুন করে পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণকে রত্নবেদিতে স্থাপিত করলেন। যাঁর নামে, যাঁর কীর্তিগাথায় একদা—

"হেথায় আর্য হেথা অনার্য হেথায় দ্রাবিড় চীন
শক হুণ দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন···।"

শ্রীঅরবিন্দের মাধ্যমে, তাঁরই হাতছানিতে ইউরোপীয় সভ্যতার খরপ্রভ তড়িচ্ছটার মোহ কাটিয়ে, একটি ছেলে একদিন এসে দাঁড়াল ভারতের 'মেঘমেদুর

অম্বর' তলে শ্যামায়মান বনভূমিতে—ব্রজের বাঁশি শোনার আশায়। আমি 'বৈরাগী কৃষ্ণপ্রেমে'র কথা বলছি

অনির্বাণজীর মুখেই প্রথম তার কথা শুনলাম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বোমারু পাইলট, কেম্ব্রিজের উজ্জ্বল রত্ন, প্রথিতযশা ইংরেজ অধ্যাপক হয়েছেন মুণ্ডিত মস্তক গেরুয়া ধারী বৈষ্ণব! আলমোড়ার হাড়-কাঁপানো শীতে না হয় ইউরোপীয়ানের কষ্ট হয় না। কিন্তু শেষ রাত্রে উঠে স্নানাদি সেরে যথাবিধানে তুলসীমঞ্চ লেপে-মুছে কুশাসন পেতে ধ্যানে বসে যাওয়া! শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যান নিজের আসন ও পাত্রাদি নিয়ে। 'আঁচারী বৈষ্ণব' যাকে বলে আর কি! কুঁড়োজালিও আছে! অনির্বাণজী হেসে বললেন "অতটা খেয়াল করিনি। থাকতেও পারে। আসলে ওরা তো কোন কাজেই আমাদের মত ফাঁকিবাজ নয়। যা করবে বলে পণ করে তা ষোল আনা মন প্রাণ দিয়ে করে। ফলও পায়।"

প্রথমটা হতবাক হয়ে গেলাম। তারপরই মনে হল ওহো! শত শতাব্দীর ঘন কালো পর্দা সরিয়ে হেলিও ডোরসই বুঝি ফিরে এসেছেন। প্রতীচ্যবাসীর মজ্জাগত উন্নাসিকতা সত্ত্বেও যাঁর কথা বলতে গিয়ে V. Smith লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন—The document is of value in the history of Indian religion as giving an early date for Bhakti cult and as proving that people with Greek names and in the service of Greek Kings had become the followers of Hindu Gods (Ox. Hist. of India) 'কৃষ্ণপ্রেম' কি তাঁরই জন্মাতর ?

———

বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের কৈশরলীলা—সেখানে তিনি 'রাখালরাজা'—'জগমনচোরা'। মথুরায় তাঁর মধ্যলীলা—তখন তিনি 'প্রজাপালক রাজা'—সর্ব্ব

'ভয়ভঞ্জনকর্ত্তা'—দ্বারকায় তাঁর অন্ত্যলীলা—ধর্ম্ম সংস্থাপনে তিনি 'রাজার রাজা' —বরাভয় দাতা—সর্ব্বজন পরিত্রাতা। সব মিলিয়েই 'কৃষ্ণস্তু স্বয়ং ভগবান'—ভক্ত-বাঞ্ছা কল্পতরু—'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্'।

ঐতিহাসিক পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় 'মাথুর' প্রবন্ধটিকে পুস্তকাকারে প্রকাশের অনুমতি দিয়ে ভুবনেশ্বরে অবস্থিত নারায়ণী ট্রাষ্ট ও শ্রীশ্রীনিগমানন্দদেবের ভাবধারায় নীলাচল পরিচালিত সারস্বত সঙ্ঘের (মহিলা ও কুমারী বিভাগ) সভানেত্রী বিদগ্ধা সন্ন্যাসিনী সুরবালা দেবী অনুসন্ধিৎসু পাঠকবৃন্দের অশেষ কল্যাণ সাধন করেছেন। প্রবন্ধটি পুস্তকাকারে প্রকাশের সুযোগ পেয়ে আমি কৃতার্থ।

পুস্তকটিকে নির্ভুল করতে যথাসাধ্য সচেষ্ট থাকা সত্ত্বেও যদি কিছু ভুল-ত্রুটী থেকেই থাকে সহৃদয় পাঠকবৃন্দ নিজগুণে আমার অনিচ্ছাকৃত সেই অপরাধ মার্জনা করবেন।

যাদের সক্রিয় সহযোগীতায় পুস্তকটি প্রকাশ সম্ভব হল নিগম-কল্পতরু শ্রীশ্রীনিগমানন্দদেবের রাতুল চরণে তাদের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনা করি। জয়গুরু।—

শ্রীমতী দীপালী দেবী

সূচনা

[নারায়ণী দেবী]

নিবন্ধের নামটা নূতন নয়; এক কথাতেই বোঝা যাচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলার আছে। মধুসূদন যখন ভারতব্যাপী কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তখন এদিকে দ্বারকা ওদিকে বৃন্দাবন মাঝখানে মথুরা নগরীই ছিল সেতুবন্ধ। যেন মথুরামন্ডলের কেন্দ্রবিন্দু হতেই আপনাকে সর্বতঃ সম্প্রসারিত করেছিলেন তিনি। পদাবলীতেও বৃন্দাবন পরিত্যাগের পরবর্তী পর্ব —একেবারে প্রভাস-যজ্ঞ পর্যন্ত যত লীলা সবই মাথুর। দ্বারাবতীপর্বের আলাদা নাম কেউ করেননি—মাথুর বললেই মথুরা ও দ্বারকার অধ্যায়। রাষ্ট্রনীতির প্রয়োজনে সপরিবার বাসুদেবকে দ্বারকায় রাজধানী স্থানান্তরিত করতে হয়েছিল, কিন্তু মথুরার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ কোনদিনই ছেঁড়েনি। পরে আমরা এ নিয়ে আলোচনা করব। মোটকথা, দ্বারাবতীর অভ্যুদয় ও বিলয় সাময়িক ঘটনা, কিন্তু মথুরাপুরীর সঙ্গে শৌরি বাসুদেবের নিত্য সম্বন্ধ। তাই বৃন্দাবনলীলার পরের অধ্যায়গুলির নাম মাথুর হওয়াই সঙ্গত।

মাথুরই বলি বা কৃষ্ণলীলাই বলি—এতকাল ধরে ও নিয়ে এতজন এত কথা বলেছেন যে তারপরে আর কিছু লেখা বিড়ম্বনা। যদি বলি, নূতন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ইতিহাসসম্মত ভাবে কৃষ্ণচরিত আলোচনা করা যাক—মনে পড়ে স্বামী বিবেকানন্দের সাবধানবাণী—"The Gita no doubt has already become the Bible of Hinduism & it fully deserves to be so. But the personality of Krishna has become so covered with haze that it

is impossible to draw any life-giving inspiration from that life." Epistles, First series, LXIII.

বঙ্কিমচন্দ্রের পরিণামটাও ভোলবার নয়।—আধুনিক মনোভাব নিয়ে তিনিও কৃষ্ণচরিত আলোচনা করেছিলেন। তার ফলে বাংলার গুণীজ্ঞানী সমাজের সুচিন্তিত প্রতিবাদ সইতে হয়েছিল তাঁকে।* রবীন্দ্রনাথকেও এ নিয়ে কলম ধরতে হয়েছিল। তিনি কৃষ্ণচরিত্র নিয়ে যা বলেছিলেন তা হতে বর্ত্তমান যুগে বিদগ্ধমণ্ডলীর গ্রহণযোগ্য একটা মূল্যবান্ সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত করা যাক। আশা হয়, রবীন্দ্রনাথের বিচার যথেষ্ট যুক্তিসম্মত বলতে কারও আপত্তি হবে না।

তিনি বলছেন ঃ—"তথ্য, যাহাকে ইংরাজীতে fact বলে ; সত্য তদপেক্ষা অনেক ব্যাপক। এই তথ্যস্তূপ হইতে যুক্তি এবং কল্পনাবলে সত্যকে উদ্ধার করিয়া লইতে হয়। অনেক সময় ইতিহাসে শুষ্ক ইন্ধনের ন্যায় রাশীকৃত তথ্য পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সত্য কবির প্রতিভাবলের কাছেই উদ্ভাসিত হইয়া থাকে।"

"কৃষ্ণের যদি ইতিহাস থাকিত তবে সম্ভবত তাহাতে এমন সহস্র ঘটনার উল্লেখ থাকিত যাহা কৃষ্ণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইলেও তাহার কোন স্থায়ী মূল্য নাই অর্থাৎ সে সকল কাজ কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব প্রকাশ করে না—এমন কি শেষপর্যন্ত সকল কথা জানা সম্ভব নহে বলিয়া তাহার অনেকগুলি কৃষ্ণের যথার্থ স্বভাবের বিরোধী বলিয়াও মনে হইতে পারিত। প্রত্যেক মানুষ অনেক কাজে নিজের যথার্থ প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াও থাকে। মহাভারতের কৃষ্ণচরিত্রে নিশ্চয়ই সেইসকল অনাবশ্যক এবং আকস্মিক তথ্যগুলি বর্জিত হইয়া কেবল প্রকৃত স্বরূপগত

---

* মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ক্ষুণ্ণ হয়ে মন্তব্য করেছিলেন, "এ লোকটা কি বৃন্দাবনের রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণকে মুছে ফেলতে চায়?" ঠিক এই কথাগুলি না বললেও মন্তব্যের ভাবার্থ এই-ই। 'জ্ঞানী গুরু'তে শ্রীনিগমানন্দ সমালোচনা করে বলেছেন, "পাশ্চাত্য শিক্ষাদৃপ্ত সাধনজ্ঞানহীন ব্যক্তির (বঙ্কিমের) নিকটই কৃষ্ণচরিত আদর্শ ঈশ্বরচরিত হইতে পারে, কিন্তু বিষয়বিতৃষ্ণ যোগ-জ্ঞানশালী ভক্তের নিকট উহা মানবচরিত্র মাত্র।" পৃঃ ১৩০-১৩৩।

সত্যগুলি নির্বাচিত হইয়াছে—এমন কি, কৃষ্ণ যে কথা বলেন নাই কিন্তু যেকথা কেবল কৃষ্ণই বলিতে পারিতেন সেই কথা কৃষ্ণকে বলাইয়া, কৃষ্ণ যে কাজ করেন নাই কিন্তু যে কাজ কেবল কৃষ্ণই করিতে পারিতেন সেই কাজ কৃষ্ণকে করাইয়া কবি বাস্তবিক কৃষ্ণ অপেক্ষা তাঁহার কৃষ্ণকে অধিকতর সত্য করিয়া তুলিয়াছেন।"—(রঃ রচনাবলী নবম খণ্ড, পৃঃ ৪৫৪-৫৫)।

কৃষ্ণ যা বলেন নাই বা করেন নাই এমন অনেক কিছুই মহাভারতকার লিপিবদ্ধ করে গেছেন—আজও সরল বিশ্বাসী বহু ভারতবাসী এ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারবে না। ভারত-কথা অবিসংবাদী সত্য, এই যে আমাদের সুচিরপোষিত ধারণা ছিল। কিন্তু যুক্তিনিষ্ঠ আধুনিক চিন্তাকে অস্বীকার করারও উপায় নাই। বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসের খাতিরে একথা মানতেই হবে যে ইতিহাস বলতে আজকাল যা বোঝায় মহাভারত ঠিক সে পদ্ধতিতে লেখা হয়নি। রবীন্দ্রনাথের সার সিদ্ধান্ত এই যে তথ্য যতটুকুই থাক, মহাভারত অসত্যভাষণ করেছে এমন রায় দেওয়া চলে না। তার কৃষ্ণচরিত্র নিত্য সত্য পরমাদর্শ; সেই কৃষ্ণকে কোন যুক্তিতেই নস্যাৎ করা সম্ভব নয়। আধুনিক মহাকবির এ উদার ঘোষণায় আমরা সত্যই কৃতজ্ঞ।

কৃষ্ণলীলা প্রকৃতই জগতে ঘটেছিল কিনা অথবা ওটি ঋষিকল্পিত তত্ত্ববিবৃতি মাত্র—এ প্রশ্ন তুললে মহাজনেরা যা বলেন তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যুক্তিটাই মেলে। তাঁরা বলেন, বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্নভাবে কৃষ্ণতত্ত্বকে গ্রহণ করেছে। কেউ বলে, নরদেহে পূর্ণতম অবতার হয়েছিল। কেউ বলে, বৃন্দাবনলীলা যাঁর তিনি মথুরা-দ্বারকার কৃষ্ণ নন। আবার কেউ কেউ বলে থাকেন, রাসলীলা ব্যাসদেবের রূপক কাব্য। যে যেভাবে ইচ্ছা গ্রহণ করুক প্রত্যেকেই উপকৃত হবে।* অর্থাৎ তথ্যের চেয়ে নিত্য সত্যের প্রতি এদের আকর্ষণ বেশি। কৃষ্ণতত্ত্ব যে প্রামাণিক বস্তু এদেশের মহাত্মারা সে সম্বন্ধে একমত—তথ্য নিয়ে মাথা ঘামাতে তাঁরা প্রস্তুত নন। এমন কি সত্যই কোনদিন ভারতবর্ষে পূর্ণব্রহ্ম

---

* শ্রীনিগমানন্দ-কথা সংগ্রহ, ২য় খণ্ড পৃঃ ১৭৫।

অবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন কিনা তা নিয়ে তর্কযুদ্ধে নামবার প্রবৃত্তিও তাঁদের নাই। যুগে-যুগে অবতার হয় ভগবানের···বুদ্ধ যীশু শঙ্কর গৌরাঙ্গ রামকৃষ্ণ যদি সম্ভব হয়, শ্রীকৃষ্ণ অসম্ভব কিসে? তাঁদের যুক্তির ধারা এই। বলা বেশির ভাগ, আমাদের অনুসন্ধিৎসা এতে মেটে না। বিজ্ঞানের যুগটাই সংশয়ের যুগ—আমরা সংশয়াত্মা, তাতে আর সন্দেহ কি? গীতাপ্রবক্তা বলেছেন, 'সংশয়াত্মা বিনশ্যতি', তবু সংশয় যায় কই? পরমাণু-বোমার বিভীষিকাতেও আমাদের ইহসর্বস্বতা যায় না।

সুতরাং স্বামীজির সতর্কতা, বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিতের প্রবল সমালোচনা, রবীন্দ্রনাথের ভারত-পক্ষ সমর্থন এবং মহাপুরুষদের ঔদাসীন্য সত্ত্বেও আমরা জানতে চাই, শ্রীকৃষ্ণ নামে সত্যই একজন কেউ সুদূর অতীতে ভারতবর্ষে জন্মেছিলেন কিনা; প্রচলিত কৃষ্ণচরিতের কতখানি সত্য; তাঁর জীবনের ঐতিহাসিক পটভূমিকা কি ছিল। আজ পর্যন্ত এ নিয়ে খুব সামান্য চেষ্টাই হয়েছে। পাণ্ডিত্য ও গুণে-জ্ঞানে যাঁরা এই দুরূহ বিষয়ে গবেষণা করার শক্তি রাখেন তাঁরা হয়তো দুরাগ্রহ ভেবেই এ কাজে হাত দেননি। তবু কৌতূহলের নিবৃত্তি নাই। মহাভারতের কর্ম-জ্ঞান-যোগ-সমন্বয় মূর্তি বাসুদেবরূপে শ্রীকৃষ্ণের যে অন্তরঙ্গ পরিচয় আমাদের হৃদয়ে আঁকা আছে তার রদবদল নাই-বা হল। নব্যভারত যাকে গীতা-প্রবক্তা পুরুষোত্তমজ্ঞানে হৃদয়ে-অর্ঘ্য নিবেদন করেছে আমরাও তাঁর পায়ে পুজাঞ্জলী দিতে কুণ্ঠিত নই। তাবলে তাঁর জন্ম-কর্ম বংশপরিচয় বা জীবনী সম্বন্ধে কোনও নূতন তথ্য কোথাও যদি কিছু পাই তা নেড়েচেড়ে দেখতে দোষ কি? আশা হয়, ভবিষ্যতে আরও অনেকে এই মহৎ কাজে হাত দেবেন। প্রাচীন ভারত শ্রীকৃষ্ণকে ভালবেসে ভক্তিরসিক হয়েছিল, ভাবী ভারত তাঁকে ভালবেসে ইতিহাস-পুরাণ-রসিক হয়ে সরস্বতীর লুপ্ত ধারা আবিষ্কার করবে না কি? আমরা সেইসব অনাগত বিশালবুদ্ধিদেরই আগমনী গেয়ে যাই।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ঃ—"মনে করো আজ যদি নিঃসংশয়ে প্রমাণ হয় যে

সুরাসক্ত অনাচারী যদুবংশ গ্রীক জাতীয় এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বাধীন বনবিহার। বংশীবাদক গ্রীসীয় রাখাল ; যদি জানা যায় যে তাঁহার বর্ণ জ্যেষ্ঠ বলদেবের বর্ণের ন্যায় শুভ্র ছিল ; যদি স্থির হয়, নির্বাসিত অর্জুন এশিয়া মাইনরের কোন গ্রীক রাজ্য হইতে য়ুনানী রাজকন্যা সুভদ্রাকে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন এবং দ্বারকা সমুদ্র তীরবর্তী কোনো উপদ্বীপ * * * * * তথাপি বেদব্যাসের মহাভারত বিলুপ্ত হইবে না এবং কোন নবীন কবি সাহস পূর্বক কালাকে গোরা করিতে পারিবেন না।" (রঃ রঃ ৮ম খন্ড পৃঃ ৪৫৯)। তাঁর এই আশ্বাসটি সম্বল করে আমরা কৃষ্ণলীলা-বর্ণনায় ব্রতী হলাম। দুঃসাহসভরে আমরা যাই-ই লিখি না কেন, মহাকাব্য বা শ্রীমদ্ভাগবতের গুরুত্ব তাতে ক্ষুণ্ণ হবে না নিশ্চয়ই।

লেখিকা নিতান্তই সাধারণ মানুষ···অতীন্দ্রিয় দর্শনের ক্ষমতা তার নাই বা প্রত্যাদিষ্ট হয়ে শ্রীকৃষ্ণচরিত্র রচনায় হাত দেবার মত সৌভাগ্য তার নয়। কাজেই সাধু সজ্জন ও উচ্চাধিকারীদের কাছে অনধিকারচর্চার জন্য মার্জনা ভিক্ষা করতে সে বাধ্য। প্রেম-ভক্তি-বিবর্জিত নীরস চিত্ত—এজন্য ভক্ত বৈষ্ণব সমাজের সম্মুখে নতি স্বীকারে লেখিকা সর্বদাই প্রস্তুত। বিদ্যাবুদ্ধির সম্বল অতি সামান্য, অতএব মহামহোপাধ্যায় আচার্যবৃন্দের কাছে সভয়ে ক্ষমা চেয়ে ভুল-ত্রুটি সংশোধনে সে উন্মুখ। পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘনপ্রয়াসকে সুধীজন চিরকালই করুণার চোখে দেখেন—এই মাত্র ভরসা।

———

কথামুখ

[নারায়ণী দেবী]

শ্রীকৃষ্ণ বলে সত্যই একজন গণনায়ক কোনকালে ভারতবর্ষে ছিলেন কিনা ইউরোপীয়ান পন্ডিতেরা সে বিষয়ে সংশয়ান্বিত। অনেক কষামাজার পর তাঁরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে—"Both Rama and Krishna appear to have been tribal heroes, mythical perhaps but not products of Mythology. But as no attempt has ever been made to separate myth from history in India it is impossible to say whether Krishna the divine hero of the Mbh. ever really existed though this is probable." Camb, Hist. Ind. Vol I pp. 258-59.

শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্ব যে এঁদের কাছে অন্ততঃ probability-র পর্যায়ে গেছে এই-ই যথেষ্ট। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে কোন লেখা বা অনুশাসন (ভারতযুদ্ধকালীন) পাওয়া নাই-ই যাক ভারতীয় সাহিত্যে সে-বিষয়ে যে নিরবিচ্ছিন্ন কিংবদন্তী মেলে বিদেশী পন্ডিতের পক্ষে তার মূল্য নির্ধারণ করা সহজ নয়। কাজেই তাঁদের কাছে যা সম্ভব, ভারতীয় ঐতিহাসিকের কাছে তা নিশ্চিত সত্য। শ্রীকৃষ্ণ বলে একজন কেউ ছিলেন না—কোনও ভারতীয় পন্ডিত এক কথায় এমন সিদ্ধান্ত করতে পারবেন না। তাঁরা ছান্দোগ্য উপনিষদের দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে মহাভারতের বাসুদেব কৃষ্ণ বলেই গ্রহণ করেছেন এবং ধারাবাহিক literary evidence-এর সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণকে ঐতিহাসিক পুরুষ হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর জন্ম বাসভূমি সংসারজীবন এবং মৃত্যু ইত্যাদি মানবীয় ব্যাপারগুলির যেরকম

বিশদ বর্ণনা এদেশে ছড়ানো রয়েছে তার পর তাঁকে কবি কল্পনা বা solar myth বলে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টাটাই আশ্চর্য। দেবতা ও দেবমানবের চরিত বর্ণনায় এ তফাৎটুকু সহজেই চোখে পড়ার কথা যে দেবতার আবির্ভাব আছে জীবনী নাই, কীর্তি আছে অথচ শিক্ষা-দীক্ষার উল্লেখ নাই। দশাবতারের মধ্যে প্রথম পাঁচজন এই ধরণের দিব্য আবির্ভাব মাত্র। কিন্তু ভৃগুরাম হতে ব্যাপার অন্যরকম হয়ে দাঁড়িয়েছে বেশ বোঝা যায়। অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃতের সমাবেশে অনেক ক্ষেত্রে হয়তো তাঁদের মানবত্ব চাপা পড়ে গেছে—তাহলেও তাঁরা যে এই পৃথিবীরই কেউ তার অগণিত পরিচয় মহাকাব্যের পাতায় পাতায় ইতস্ততঃ ছড়ানো রয়েছে।

বৈদেশিক মনীষীবর্গের মধ্যে জার্মানীর Prof. Otto Schrader-এর মত পণ্ডিতের কাছেও উপনিষদের দেবকীপুত্র কৃষ্ণ আর পুরাণের বাসুদেব-কৃষ্ণ এক নয়। একে তো প্রাচীন ভারতে 'কৃষ্ণ' নামটার ছড়াছড়ি ছিল—দ্বৈপায়ন কৃষ্ণ, ঋষি কৃষ্ণাঙ্গিরস *, কৃষ্ণাত্রেয়, পাণ্ডব-কৃষ্ণ (অর্জুন) ইত্যাদি ; কাজেই একাধিক কৃষ্ণের অস্তিত্ব না মেনে উপায় নাই। তার উপর জার্মাণ পণ্ডিত আপত্তি তুলছেন, পৌরাণিক দেবকীনন্দনের গুরু ছিলেন সান্দীপনি। বৈদিক সাহিত্যের দেবকীপুত্র ঘোর আঙ্গিরসের শিষ্য। কই, মহাভারত বা ভাগবতে কোথাও তো শ্রীকৃষ্ণের আচার্য হিসাবে কোন আঙ্গিরসের নাম নাই? সুতরাং কেবল কৃষ্ণ যে একাধিক তা নয়, দেবকীপুত্র কৃষ্ণও একাধিক হতে পারে।

---

*"ঋক্‌সংহিতায় কৃষ্ণ আঙ্গিরসের ছ'টি সূক্ত আছে,—৮।৮৫-৮৭ ; ১০।৪২-৪৪ —যথাক্রমে অশ্বিদ্বয় এবং ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে। অশ্বিদ্বয়ের প্রতি তাঁর সখ্যভাব আর ইন্দ্রের প্রতি পরিষ্কার মধুর ভাব। ইন্দ্র সোজাসুজি 'জার' (lover)। এই সূক্তগুলি ঋক্‌সংহিতার আর্যমণ্ডলের বাইরে। আমার কিন্তু এগুলো শ্রীকৃষ্ণরচিত বলে মনে হয়। যোনিবংশের উল্লেখ না করে বিদ্যাবংশের উল্লেখ করা হয়েছে বলে কৃষ্ণ এখানে আঙ্গিরস।

[পঃ, পুঃ, দ্রষ্টব্য]

তিন

কিন্তু 'কৃষ্ণ' নাম বহুজনের থাকলেও ভারতের ইতিহাস পুরাণে যে শৌরি বাসুদেব কৃষ্ণ দেবকীনন্দন পূর্ণব্রহ্ম অবতার বলে খ্যাত তিনি এক এবং অদ্বিতীয়, ভারতীয় ঐতিহাসিকেরা এ বিষয়ে নিঃসংশয়। ছান্দোগ্যোপনিষদের দেবকীপুত্র কৃষ্ণই যে মহাভারত ও পুরাণের কৃষ্ণ, এর স্বপক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে একজন ভারতীয় ইতিহাসবেত্তা বলছেন ঃ—

(১) দেবকীপুত্র কৃষ্ণের বেদাচার্য একজন আঙ্গিরস ছিলেন। আঙ্গিরস-গোত্রিয়দের সঙ্গে ভোজবংশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা ঋগ্বেদে আছে (ঋঃ ৩।৫৩।৭)। ভোজগোষ্ঠী তো যাদবকুলেরই শাখা।

(২) ঘোর আঙ্গিরস সূর্যোপাসক। শান্তিপর্বে পাই (৩৩৫।১৯) শ্রীকৃষ্ণ যে সাত্বত-বিধির প্রবর্তক তা 'প্রাক্-সূর্য্য-মুখ-নিঃসৃত'।

(৩) মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, আঙ্গিরসী শ্রুতিই হল 'শ্রুতিনামুত্তমা শ্রুতিঃ' (৮।৬৯।৪৫)।

(৪) আঙ্গিরস ঘোর দেবকীপুত্রকে 'তমসস্পরি' উত্তম জ্যোতির উপাসনা করতে বলছেন (ছাঃ উপঃ ৩।১৭।৭)। ছান্দোগ্যোপনিষদের এই পুরুষ-যজ্ঞ-বিজ্ঞানাধ্যায়ে বলা হয়েছে 'তপোদানমার্জবমহিংসা সত্যবচনমিতি তা অস্য দক্ষিণাঃ।' গীতায় শ্রীকৃষ্ণও বলছেন 'জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে' (১৩।১৮)। ষোড়শ অধ্যায়ের প্রথমেই তুলেছেন 'দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্। অহিংসা সত্যম্' ইত্যাদির কথা।

ঋগ্বেদে (৮।৯৬।১৩-১৫) আরেকটি কৃষ্ণের দেখা পাওয়া যায় অংশুমতীর তীরে—তিনি ইন্দ্রবিরোধী।"—অনির্বাণ—

শেষোক্ত কৃষ্ণের পরিচয় আজও দুর্জ্ঞেয়। বলেছি তো 'কৃষ্ণ' নাম সেযুগে অনেকেরই ছিল। সে যা হ'ক কৃষ্ণাঙ্গিরসই যে বাসুদেব- কৃষ্ণ এর বিরুদ্ধে একটা তর্ক উঠবে। ইন্দ্রপূজা যিনি বন্ধ করে দিয়েছিলেন সেই কৃষ্ণ আর ইন্দ্রসূক্ত-রচয়িতা কৃষ্ণ এক হবেন কি করে? ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ প্রসঙ্গে আমরা এ সমস্যার মীমাংসা করতে চেষ্টা করব।

(৫) শ্রীকৃষ্ণ সান্দীপনির কাছে গিয়েছিলেন অস্ত্রশিক্ষার্থে। বিষ্ণুপুরাণে (৫।২১।১৯) আছে 'ততঃ সান্দীপনিং কাশ্যমবন্তীপুরবাসিনম্। অস্ত্রার্থং জগ্মতুর্বীরৌ বলদেবজনার্দ্দনৌ ॥' হরিবংশে রয়েছে শ্রুতিধর শ্রীকৃষ্ণ সান্দীপনি-গৃহে ছিলেন 'ধনুর্বেদচিকীর্ষার্থম্।' শ্রুতিধর অর্থ কি এই নয় যে পূর্বেই শ্রুতিশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন তিনি? ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ সান্দীপনি মুনিকেই শ্রীকৃষ্ণের বেদাচার্য বললেও হরিবংশ ও বিষ্ণু পুরাণের মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য।*

দুঃখের কথা প্রথম যুক্তিটি বিতর্কের বিষয়। কারণ বেদজ্ঞ পণ্ডিত বলেন—"ঋক্‌সংহিতার 'ভোজ' শব্দটি কোনও জাতির বা কৌমের নাম নয়। প্রায় সর্বত্রই ওটি দেবতাদের বিশেষণ, ক্বচিৎ যজমানের—যথা ৩।৫৩।৭—'ইমে ভোজা অঙ্গি-রসো বিরূপা' ইত্যাদি বোঝাচ্ছে মরুদ্‌গণকে। একটি জায়গায় আছে—'ভোজং পাকস্থামানম্—সেখানে 'পাকস্থামা' এক রাজার নাম। কিন্তু তিনিও ভোজ-বংশীয় নন। 'ভোজ' সেখানে বোঝাচ্ছে বদান্য—hospitable।" তবে প্রথম যুক্তিটি নাকচ হলেও রায়চৌধুরী মহাশয়ের অন্যান্য যুক্তিগুলি ভেবে দেখার মত। শ্রীকৃষ্ণ যে ঘোর আঙ্গিরসের অগ্নিবিদ্যা গ্রহণ করেছিলেন তার প্রমাণ হিসাবে আমরাও ভাগবতের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করতে পারি :—

"লোকাভিরামং স্বতনুং ধারণাধ্যানমঙ্গলম্।
যোগধারণয়াগ্নেষ্যা দগ্ধ্বা ধামাবিশৎ স্বকম্ ॥" ১০।৩১।৬

আগ্নেয়ী যোগধারণায় নিজ তনু দগ্ধ করে স্বধামে গেলেন শ্রীকৃষ্ণ—এই আগ্নেয়ী যোগ কি আঙ্গিরসদেরই বিশেষ ধারা নয়?

বলা বেশির ভাগ, কৃষ্ণ একাধিক থাকলেও দেবকীপুত্র কৃষ্ণ একজনই ছিলেন এবিষয়ে ভারতীয় জনসমাজ নিঃসংশয়, কিন্তু বিশাল হিন্দু সমাজের বিচিত্র শ্রুতি

* Political History of Ancient India—Hemchandra Roy Chaudhuri. Carmichal Professor & Head of the Departt. of Ancient History and culture, Cal University, See pp. 119-20

স্মৃতি ও দর্শন এবং বহু শাখাপল্লবিত মহাকাব্য-পুরাণাদির মধ্যে সামঞ্জস্য করে বাসুদেব কৃষ্ণ সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা অ-ভারতীয়ের পক্ষে অবশ্যই দুরূহ। Hopkins-এর মত বহুশ্রুত ব্যক্তি ব্রহ্মচারী অবস্থায় অর্জুনের চিত্রাঙ্গদা ও উলুপী-সহবাসের প্রতি কটাক্ষ করে বসেছেন। এ খেয়াল নাই যে স্মৃতি বিধান দিয়েছেঃ মাসে দুইদিন স্ত্রীর ঋতুরক্ষা করলে 'ব্রহ্মচার্যেব ভবতি যত্র তত্রাশ্রমে বসন্' (মনু ৩।৫০)। হিন্দু সমাজের একজন হয়ে পুরুষানুক্রমে প্রচলিত এসব রীতিনীতির হদিশ না জানলে এরকম ভুল স্বাভাবিক। পরদেশী কেন, এখনকার শিক্ষিত ভারতীয়দের অনেকেও প্রাচীন বিধি-নিষেধের এতসব খুঁটি-নাটি জানেন না। মহাভারত ভাগবত পড়তে বসলে তাঁদের মনেও খটকা লাগে। ভারতবর্ষেরই একজন হওয়ায় তাঁদের ভ্রমসংশোধন হওয়া তবু সহজ। ঐতিহ্যের সঙ্গে নাড়ির যোগ না থাকায় যে কোন ইউরোপীয়ানের পক্ষে শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণেতিহাসে সংগৃহীত তথ্যের তত্ত্বনির্ণয় ঢের বেশি কঠিন।

কতকাল আগে মন্ত্র-ব্রাহ্মণাত্মক বেদের উদ্ভব তা সঠিক বলা যায় না। তবে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদকে চারভাগে ভাগ করেছিলেন এই প্রসিদ্ধি অনুসারে বলা চলতে পারে, ভারতযুদ্ধের পূর্বে বা পরেও বিশাল বৈদিক সাহিত্যে সংযোজন ও সঙ্কলন চলেছে। বেদোপনিষদই এদেশের সর্বপ্রাচীন সাহিত্য। তাতেও যদি শ্রীকৃষ্ণ বা যাদব-গোষ্ঠীর উল্লেখ থাকে, তাহলে এঁদের সম্বন্ধে লোকপ্রবাদের ধারাবাহিকতা নিয়ে আর প্রশ্ন ওঠে না। দেবকীপুত্র কৃষ্ণের নাম তো আছেই বৈদিক সাহিত্যে। সুখের বিষয়, প্রাচীনতম ঋগ্বেদেও যদুদের নাম আছে। শুধু তাই নয়, এমন সব ইঙ্গিতের টুকরা ছড়ানো আছে যার মর্মোদ্ধার হলে ভারতেতিহাসের কুয়াশামলিন দূরবিস্মৃত এক অধ্যায় আলোয় উজ্জ্বল হয়ে পরবর্তী বহু রহস্যের কিনারা করতে পারে।

যদু-তুর্বশরা বহু পুরাতন গোষ্ঠী। এত প্রাচীন তাদের ইতিহাস যে ঋগ্বেদের আমলেই তারা রূপকের পর্যায়ে পরিণত হয়েছে। অনেক জায়গায় এমন উল্লেখ রয়েছে যে ইন্দ্র তাদের সাগরপারের এক দূরদেশ হতে সপ্তসিন্ধুতটে

নিয়ে আসছেন (৬।২০।১২ ; ১।১৭৪।৯ ; ৫।৩১।৮ ; ৬।৪৫।১ ; ৪।৩০।১৭)। যদু-তুর্বশরা সাঁতার জানত না, এ ধরণের উল্লেখও আছে।*

সুবিখ্যাত দাশরাজ্ঞ যুদ্ধে (৭।১৮) সুদাসের বিরুদ্ধে যারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিল তাদের মধ্যে যদু তুর্বশ দ্রুহ্যু অনু ও পুরুদের নাম আছে। সে সময় ভরত-বংশীয়েরা ছিলেন ত্রিৎসু-গোষ্ঠীর সুদাসের পক্ষে। এ বিবাদের মূল কোথায় বেদজ্ঞ পণ্ডিতরা তা নির্ণয় করতে পারেন। আমাদের সংশয় হয়, পুরোহিত-নির্বাচন নিয়েই একটা বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়েছিল। কারণ বিশ্বামিত্র দেখছি (তৃতীয়মণ্ডলে ৫৩।১২) সুদাসের যজ্ঞসভায় ঘোষণা করছেন 'বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মশক্তিই ভারতজনকে রক্ষা করছে।' অথচ যুদ্ধান্তে সুদাসের বিজয় গাথা উচ্চারণ করছেন ঋষি বশিষ্ঠ। কেমনভাবে বিপক্ষদের নির্জিত ও বিতাড়িত করে সুদাস গৌরবান্বিত হয়েছেন বশিষ্ঠই তার বর্ণনা করে চলেছে দেখে সন্দেহ হয়, তবে কি শেষকালে বিশ্বামিত্র দাশরাজ্ঞ-যুদ্ধে যদু-তুর্বশদের মত সুদাস-বিরোধী দলেরই নেতা হয়েছিলেন ? বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের শত্রুতা বিখ্যাত ঘটনা। পুরাণেতিহাসে তা পল্লবিত হয়েছে।

সাত্বতদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নাম ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। শ্রীমদ্ভাগবতের ১।৪।৭ শ্লোকে ভাগবতকে বলা হয়েছে সাত্বতী শ্রুতি। মহাভারতের উদ্যোগপর্ব ৬৯ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের এক নাম 'সাত্বত' বলা হয়েছে—অর্থ করা হচ্ছে 'যিনি সত্ত্ব হতে পরিচ্যুত হননা।' পৌরাণিক বংশাবলীতে সাত্বত-গোষ্ঠী যদুবংশেরই

---

* ঋগ্বেদে যদু-তুর্বশদের কথা পাই—১।৫৪।৬, ৮।৭।১৮, ৯।৬১।২ (দিবোদাসের শত্রু), ১০।৪৯।৮ (ইন্দ্র তাদের রক্ষাকর্তা), ১।১০৮।৮ (যদু প্রভৃতি পাঁচজনেরই নাম রয়েছে—অগ্নি তাদের মাঝে), ৮।৯।১৪ (সোমযাজী), ৮।১০।৫ (পুরু ছাড়া সকলেই), ৮।৪৫।২৭।

এছাড়া আরও নানা জায়গায় বিভিন্ন প্রসঙ্গে যদু-তুর্বশদের নাম পাই। তুর্বশরাই পুরাণের তুর্বসু—যদু ও তুর্বসু সেখানে দেবযানীর পুত্র, দুটি সহোদর ভাই।

অন্যতম শাখা। বৈদিক সাহিত্যে এই সাত্বতদের নামও আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে (১৩।৫।৪।২১) দেখি, সাত্বতদের যজ্ঞীয় অশ্ব কেড়ে নিয়ে এক জন ভারত তাদের পরাজিত করছে। অন্তর্বেদীতেই ভারতগোষ্ঠী যাগযজ্ঞ করত। সাত্বতবংশীয়রা তাহলে আশেপাশেই কোথাও ছিল? (শ. ব্রাহ্মণ ৮।৫।৪।১১)। পুরাণমতে যমুনাতীরই তাদের বাসভূমি। বৈদিক যুগেও তারা সেখানেই বসবাস করত এই-ই মনে হয়। পরে সাত্বতদের কোন শাখা দেশান্তরী হয়ে গিয়েছিল সম্ভবতঃ। কারণ ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে সাত্বতদের ভোজরাজন্যগোষ্ঠীর অধীন ও কুরু-পাঞ্চাল রাজ্যসীমার বাইরে দক্ষিণের লোক বলা হয়। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে এক জায়গায় আছে 'চলে গেল যেমন নির্বাসিত যায় দক্ষিণদিকে' (১০।৬১।৮)। শতপথব্রাহ্মণে যাদের অর্ন্তবেদীর আশেপাশে দেখলাম, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে তারা 'দক্ষিণের লোক' বলে চিহ্নিত হওয়ায় সন্দেহ জাগে, সাত্বতদের কি কুরুপাঞ্চাল রাজ্যসীমার বাইরে দক্ষিণে চলে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল? ভারতজনদের সঙ্গে যদুসম্প্রদায়ের এ বিরোধ যে কতকালের পুরাতন!

বিদর্ভের কুণ্ডিননগরী শ্রীকৃষ্ণের পট্টমহিষী রুক্মিণীর জন্মস্থলী। প্রাচীন সাহিত্যে বিদর্ভের রাজা ভীমের নাম পাওয়া যায় (ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ ৭।৩৪)। বৃহদারণ্যকে বিদর্ভী কৌণ্ডিন্য নামে এক ঋষির নাম রয়েছে। প্রশ্নোপনিষদে বৈদর্ভি ভার্গবের উল্লেখ আছে। বিদর্ভ ও কুণ্ডিন তাহলে বৈদিক যুগের জনপদ। দক্ষিণে যে অনেক ভোজ ছিলেন ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ স্পষ্টই তা স্বীকার করছে—"দক্ষিণস্যাং দিশি যে কে চ সাত্বতীং রাজানো ভোজ্যায়ৈব তেঽভিষিচ্যন্তে ভোজ এত্যেনানাভিষিক্তা নাচক্ষতে···।"

ঋগ্বেদে উশীনর ও শিবজাতির উল্লেখ আছে। মহাভারতে উশীনর শিবি-গণের রাজা (৩।১৩০) আবার অন্যত্র (৫।১১৭) তাঁকে ভোজরাজ বলা হয়েছে। যযাতিকন্যা মাধবীর ভোজরাজ উশীনরের ঔরসে শিবি নামে একটি সন্তান হয়। উশীনর শিবজাতি ও যদুবংশের ভোজশাখার মধ্যে কি তবে আত্মীয়তা ছিল?

আপত্তি উঠতে পারে যে বৈদিক সাহিত্যে ভারতকথার বহুপরিচিত ব্যক্তি ও

গোষ্ঠী বা দেশগুলির নাম থাকলেই যে তাদের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয়ে গেল, এ কোন্ যুক্তি ? বৈদিক যুগ ও প্রচলিত মহাভারত বা অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে হাজার হাজার বছরের ব্যবধান। বৈদিক যুগের খ্যাতনামা ব্যক্তি রাজগোষ্ঠী ও দেশগুলির নাম জড়িয়ে কালে মনোহর মহাকাব্য গড়ে উঠেছে, এ কি হতে পারে না ? সনাতনধর্মকে মর্যাদাসম্পন্ন করার জন্য বেদব্যাস বেদপ্রসিদ্ধ চরিত্র ও কিংবদন্তী আশ্রয় করে ভারতকথার পত্তন করেছিলেন। ওর পিছনে বস্তুগত সত্য সামান্যই, ভাবসম্প্রসারণই মূল উদ্দেশ্য এবং বেদব্যাসের সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়নি।

বলা বেশীর ভাগ, এ আপত্তিটা পাশ্চাত্য বুধমণ্ডলী আর যারা তাঁদেরই নিরিখে পুরাণেতিহাসের মূল্য নির্ণয় করেন তাঁদেরই আপত্তি। শ্রদ্ধেয় গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ের মত যাঁরা মৌলিক দৃষ্টিতে পুরাণেতিহাস আলোচনা করেন তাঁদের কাছে কিন্তু ‘পুরাণসমূহে ভারতের অতিপ্রাচীন অতীতের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে’—এই সিদ্ধান্ত-ই গ্রাহ্য। পুরাণেতিহাসের তথ্যগুলির সঙ্গে বেদ-উপনিষদের তথ্যগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিলে যাচ্ছে দেখে ওদের ঐতিহাসিক সত্যতা সম্বন্ধে মনে দৃঢ় বিশ্বাস জাগে। অন্যান্য যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণের মধ্যে পুঁথিপত্রের সাক্ষ্যও (literary evidence) তো একটা প্রমাণ। যদুবংশ ও বাসুদেব কৃষ্ণ সম্বন্ধে এই literary evidence-এর ধারাবাহিকতা কোথাও ছিন্ন হয়নি।

ঋগ্বেদের ষষ্ঠ ও সপ্তম মণ্ডলের প্রাচীনতা সম্পর্কে পণ্ডিতদের মনে সন্দেহ নাই। যদু-তুর্বশদের প্রসঙ্গ এ দুটি মণ্ডলেও রয়েছে। অষ্টম মণ্ডলের এক জায়গায় (৬/৪৬) যদুদের সঙ্গে বিশেষ করে পশুদের উল্লেখ আছে। অনেকে মনে করেন, ওই পশুরাই প্রাচীন পারসিক। সেই সূত্র ধরে কেউ কেউ বলেন, ঋগ্বেদে ইরাণের নদ-নদী ও বিভিন্ন সম্প্রদায়েরও উল্লেখ আছে। পারস্যভূমিই বৈদিক আর্যদের আদি বাসভূমি অথবা ভারত প্রবেশের প্রাক্‌কালে কোন উপনিবেশ—একদল ঐতিহাসিকের মত এইরকম। আর এক দল বলেন, মতদ্বৈধের

ফলে কোন সময় ভারতীয় আর্যদের এক শাখা সপ্তসিন্ধু ছেড়ে পশ্চিমে চলে গিয়েছিল তারাই পারসিকদের পূর্বপুরুষ—ইরাণী সভ্যতার স্রষ্টা। খৃঃ পূঃ ২000 বছর আগেও যে পশ্চিম এশিয়ায় বৈদিক সভ্যতার অবশেষ ছিল Boghaz-koi Inscriptions ও Tel-el-Amarna letters-গুলি আবিষ্কার হওয়ায় তা এখন নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়ে গেছে।* কিন্তু বৈদিক আর্যদের কোনও শাখা ভারত থেকে ওখানে গিয়ে বসবাস করেছিল, না পশ্চিম এশিয়া হতেই আর্যরা ভারতে প্রবেশ করেছে—এ সমস্যাটা আজও অমীমাংসিত। যদুদের ইন্দ্র সাগরপারের দূর দেশ হতে নিয়ে আসছেন এই ঋক্‌টির ভাবার্থ ঠিকমত অনুধাবন করতে পারলে হয়তো কোনদিন ওই সমস্যার উপরে আলোকপাত করা যাবে।

এশিয়া-মাইনর বা পারস্যই বৈদিক আর্যদের প্রাক্-ভারত উপনিবেশ কি না অথবা ভারতবর্ষই তাঁদের আদি বাসস্থান পারস্য-পরবর্তী কালের উপনিবেশ, এ তর্ক আপাততঃ থাক। আমাদের বিচার্য বিষয় হল, যদুগোষ্ঠী কি এককালে ভারতেই ছিল, পরে কোন কারণে দেশ ছেড়ে দূরে চলে যায়? দেবানুগ্রহে তারা আবার স্বদেশে ফিরে এসেছিল? না, আসলে তারা অভারতীয়, কিন্তু বৈদিক আর্যদের সগোত্রীয় কোন শাখা—এই ইন্দ্রযাজী বান্ধবদের আদর করে ডেকে এনেছিল ভারতের কোনও পুরোহিত সম্প্রদায়? কোন্‌টা ঠিক? প্রকৃত সত্য কি?—পৌরাণিক প্রবাদ বিচারে আমাদের কিন্তু ঘরছাড়া ছেলের ঘরে ফিরে আসার কথাটাই মনে নেয়। মহাভারত ও পুরাণাদি একবাক্যে বলছে, যদুগোষ্ঠী ভারতীয়, কিন্তু পিতার অভিশপ্ত সন্তান। দেবযানী-শর্মিষ্ঠার গল্পটা প্রায় সবারই জানা। যদু ও তুর্বশদের ঋগ্বেদে একসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে—ভারতকথায় তারা ক্ষত্রিয় পিতার ঔরসে ব্রাহ্মণী মায়ের সন্তান, সহোদর ভাই।

* যাঁরা এ বিষয়ে খুঁটিয়ে জানতে চান তাঁরা হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর Studies in Indian Antiquities, Cambridge Ancient History (II, 13), V. G. Childe-এর Aryans এবং Hillebrandt ও বালগঙ্গাধর তিলকের লেখা বই পড়তে পারেন।

দাশরাজ্ঞ-যুদ্ধে আর যে সব রাজন্য যোগ দিয়েছিল দ্রুহ্যু অনু পুরুও তার মধ্যে আছে। ভারতকথায় এরা তিনজন যদু-তুর্বসুর বৈমাত্রেয় ভাই—অসুরকন্যা শর্মিষ্ঠা তাদের মা—চন্দ্রবংশী যযাতিই পিতা। অসুর কন্যা শর্মিষ্টার মধ্যে অহুরমাজদা-উপাসক পারসিকদের ইঙ্গিত আছে কিনা তা ভেবে দেখতে হয়। পিতা যযাতির ভোগবাসনা সমর্থন না করায় যদু তুর্বসু দ্রুহ্যু ও অনু রাজ্যাধিকারী হতে পারল না। সর্বকনিষ্ঠ পুরু পিতাকে সমর্থন করায় তিনি হলেন রাজা—বড় ভাইদের তার অধীন হতে হল—(ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণ)। মহাভারত ও পুরাণে যযাতির যৌবনোপভোগের যে বর্ণনা আছে তা কর্মকান্ডসহায়ে স্বর্গভোগ ছাড়া আর কিছু নয় (দ্র. বিশ্বাচ্যা মহোপভোগং ভুক্তা···)। যদু ও তুর্বসু যার সন্তান সেই দেবযানী একদা ভালবেসে ছিলেন মহর্ষি অঙ্গিরার পৌত্র বৃহস্পতিপুত্র কচকে। পুরাণের রূপকগুলির মর্মোদ্ধার বেদবিৎ সুধীর পক্ষেই সম্ভব। আমাদের অস্পষ্টভাবে মনে হয়, দেবযানীর উপাখ্যানটি যদুবংশের অধ্যাত্মবিবর্তনের ইতিহাস। মোট কথা, গোড়াতেই রয়েছে একটা বিপ্লবের সংকেত। ব্রাহ্মণকন্যা দেবযানীর ক্ষত্রিয়কে বরণ করার মধ্যেও সেই ধারা। স্মৃতিশাস্ত্রের বিচারে যদু ও তুর্বসু প্রতিলোমজ সন্তান—সূত নামে সঙ্কর জাতি। মনে রাখতে হবে, মহাভারত প্রচারিত হয়েছিল সূতদেরই দিয়েই। সূত-মাগধদের একত্র উল্লেখ পরবর্তী সাহিত্যে পাওয়া যায়। মাগধেরা যদি ব্রাত্য হয়* সূতেরাও তাই। হতেও পারে প্রবল সমাজ বিপ্লবের নেতা ছিল ওই যদুগোষ্ঠী এবং তার ফলে আর্যসভ্যতার মূল কেন্দ্র হতে তাদের উচ্ছেদ করা হয়। মহাভারতে দেখছি, তুর্বসু হতে যবনগন, দ্রুহ্যু হতে বৈভজ এবং অনু হতে ম্লেচ্ছগণের উৎপত্তি হল। কিন্তু যদু হতে যাদব এবং পুরু হতে পৌরবদের উদ্ভব। বিপ্লবী হলেও দেশান্তরী যদুগাষ্ঠী সনাতন ঐতিহ্যকে বহন করত—বাকী তিনজন হয়তো স্রোতে গা ভাসিয়ে একটু দূরেই সরে গিয়েছিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মত যদুকুলই কি তাদের পথনির্দেশ করে আবার ভারতে ফিরিয়ে এনেছিল? যদুর অধ্যাত্মজিজ্ঞাসা

---

* আর্যদর্পন ১৩৬৪—'ব্রাত্য' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

কোন্ পথ আশ্রয় করেছিল, ভাগবতে তা লিপিবদ্ধ হয়েছে। বক্তা শ্রীকৃষ্ণ, শ্রোতা উদ্ধব—একাদশ স্কন্ধের ৭ম অধ্যায়ে যদু-অবধূত সংবাদটি মন দিয়ে পড়লেই বোঝা যায়, কোন্ অপরাধে যদুকে অভিজাত আর্যগোষ্ঠী ত্যাজ্য মনে করেছিলেন।

"অবধূতং দ্বিজং কঞ্চিচ্চরন্তমকুতোভয়ম।
কবিং নিরীক্ষ্য তরুণং যদুঃ পপ্রচ্ছ ধর্ম্মবিৎ॥" ১১।৭।২৫

শ্রীযদুরুবাচ—"কুতো বুদ্ধিরিয়ং ব্রহ্মন্নকর্ত্তুঃ সুবিশারদা।
যামাসাদ্য ভবাঁল্লোকং বিদ্বাংশ্চরতি বালবৎ॥ ২৬
প্রায়ো ধর্ম্মার্থকামেষু বিবিৎসায়াঞ্চ মানবাঃ।
হেতুনৈব সমীহন্তে আয়ুষো যশসঃ শ্রিয়ঃ॥ ২৭
ত্বন্তু কল্পঃ কবির্দক্ষঃ সুভগোঽমৃতভাষণঃ।
ন কর্ত্তা নেহসে কিঞ্চিজ্জড়োন্মত্তপিশাচবৎ॥ ২৮
জনেষু দহ্যমানেষু কামলোভদবাগ্নিনা।
ন তপ্যসেঽগ্নিনা মুক্তো গঙ্গাম্ভস্থ ইব দ্বিপঃ॥ ২৯

[ব্রহ্মন্ ! যে বুদ্ধি লাভ করে আপনি বিদ্বান হয়েও বালকবৎ জগতে বিচরণ করছেন আপনার এই অকর্তাভাব ও বিশারদী বুদ্ধি কোথা হতে উৎপন্ন হল ? সাধারণতঃ আয়ু যশ ও সম্পদের জন্যই লোকে ধর্মার্থকামের তাৎপর্য গ্রহণে প্রবৃত্ত হয়। আপনি সক্ষম পণ্ডিত সর্বকর্ম-নিপুণ প্রিয়দর্শন ও মধুরভাষী হয়েও কোন কর্মে মন দেননি বা কিছুই কামনা করেন না। কাম ও লোভের দাবাগ্নিতে জনগণ দগ্ধ হচ্ছে আপনি যেন গঙ্গাবক্ষস্থিত গজেন্দ্রের মত সে দাবাগ্নির বাইরে। আপনার কোন তাপ নাই।]

যদুর প্রশ্নগুলির মধ্যে কর্মাভিমানী ভোগৈশ্বর্যবাদীদের প্রতি স্বভাবতঃই কটাক্ষ রয়েছে। পিতা যযাতির সঙ্গে ওই নিয়েই তো তাঁর বিরোধ বেধেছিল ! তারপর তিনি তত্ত্বানুসন্ধিৎসু হয়ে গেলেন কার কাছে—না এক অবধূতের কাছে। অবধূত বৈদিক সন্ন্যাসী নন, তাঁর সন্ন্যাস তন্ত্রোক্ত। শ্রীকৃষ্ণেরও আগে কি অবধূত সম্প্রদায় ছিল ? না থাকার কারণ কি আমরা ভেবে পাই না। অবধূত

নামটা হয়তো ছিল না, কিন্তু শৈব পাশুপতরা যে শ্রীকৃষ্ণের আগেও ছিলেন, এতে পুরাণকোবিদদের সংশয় হওয়া উচিত নয়। তন্ত্র বলেছেন, অবধূত সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ, দ্বিতীয় মহেশ। তাতেই বুঝতে পারি, শৈব সম্প্রদায়েই অবধূতাশ্রমের সৃষ্টি হয়েছিল। ভাগবতের আদি অবধূত যদুকে যা বললেন তাতে আরও ভাল করে বোঝা যায়, তিনি কোন বৈদিক সম্প্রদায়ের মানুষ নন, স্বাধীনচেতা মহা-বিদ্রোহী কেউ। শৈব পাশুপতরাও এমনই ছিলেন। অবধূত যদুর প্রশ্ন শুনে ২৪টি গুরুর কথা বললেন ঃ—

'সন্তি মে গুরবো রাজন্ বহবো বুদ্ধ্যুপাশ্রিতাঃ।
যতো বুদ্ধিমুপাদায় মুক্তোঽটামীহ তান্ শৃণু' ॥ ৩২

এই জ্ঞানযোগীরাই বেদের ব্রাত্য। যদুকুল এদের অনুবর্তন করেছিল বলেই কি যযাতির মুখ দিয়ে ভাগবতপ্রবক্তা তাদের গাল দিয়েছেন 'অনিত্যে নিত্যবুদ্ধয়ঃ অধর্ম্মজ্ঞাঃ' ওরা? কিন্তু এ বিরাগ চিরকাল রইল না। প্রচলিত বিধিবিধান ছেড়েও যদুকুল যখন শাশ্বত ধর্মকেই উজ্জ্বলতর রূপে হৃদয়ে অনুভব করছে দেখা গেল, তখন বোধহয় ভারতবর্ষ তার ঘরছাড়া ভাইদের আবার ডাক দিয়ে নিজেদের একজন করে নিতে চাইল। এই উদারতাটুকু ছিল বলেই ভারতের ব্রাহ্মণ্যধর্ম আজও অমর।

পুরাণের বংশাবলীতে দেখছি ব্রাহ্মণবিদ্বেষী কার্তবীর্যার্জুন যদুবংশেরই বিখ্যাত পুরুষ। ভৃগুরামের সঙ্গে তাঁর বিরাট সংঘর্ষ এবং তার ফলে একুশবার ধরিত্রী নিঃক্ষত্রিয় হওয়ার মধ্যে বিস্মৃত কোন ইতিহাস লুকিয়ে আছে জানি না। কার্তবীর্যার্জুনের ছেলে শূর ও শূরসেনই বোধ হয় জোর করে অন্তর্বেদীর কাছাকাছি কুরু-পাঞ্চাল সভ্যতার গা ঘেঁষে যাদব উপনিবেশ সৃষ্টি করে। তুর্বশদের সঙ্গে পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়দের ঘনিষ্ঠতার ইঙ্গিত* ঋগ্বেদে মেলে (Rv. vi. 27.7; Sat. Br. XIII. 5.4.16.)। বিষ্ণুপুরাণে দেখছি, তুর্বসুরা পুরু

* মূলে আছে—'স সৃঞ্জয় তুর্বশং পরাদাৎ'—সে তুর্বশকে দিয়ে দিল সৃঞ্জয়ের হাতে।

বংশের সঙ্গে মিলে গেল। দ্রুহ্যুগোষ্ঠী ম্লেচ্ছাধিপতি হয়ে গেল—এই হল বিষ্ণুপুরাণের অভিমত—মহাভারত তাদের বৈভোজদের জনক বলেছে। কে এই বৈভোজরা? দক্ষিণের কোন দ্রাবিড় জাতি কি? যদুবংশীয় ভোজদেরও বাস কিন্তু দক্ষিণে। অনু হতে আনব-ক্ষত্রিয় অম্বষ্ঠদের উৎপত্তি এটা পৌরাণিক মত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অম্বষ্ঠদের উল্লেখ আছে। আশ্চর্যের বিষয়, খৃঃ পূঃ চতুর্থশতকে গ্রীক ঐতিহাসিক ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে যেসব ছোট ছোট স্বাধীন রাষ্ট্রের নাম করেছেন তার মধ্যে Abastanoi or Sambastai-রও নাম আছে। ঐতিহাসিকেরা বলেন, এরাই অম্বষ্ঠ জাতি। গণতন্ত্র প্রথায় দেশ শাসন করত অম্বষ্ঠরা···আলেকজান্ডারের সঙ্গীরা এই বলে গেছেন। ধর্মশাস্ত্রে অম্বষ্ঠরা ব্রাহ্মণ পিতা ও বৈশ্যমাতার সন্তান—জাতি-ব্যবসায় চিকিৎসা। কালে অম্বষ্ঠ জাতি ব্যবসায় দক্ষিণপূর্ব ভারতে বিহারে ও বাংলায় ছড়িয়ে গেছে (দ্র. Ptolemy, Ind. Ant., XIII 36; বৃহৎসংহিতায় 'মেকলাম্বষ্ঠ')। বিহারের অম্বষ্ঠ কায়স্থ, বাংলায় বৈদ্য। মজা এই, বিষ্ণুপুরাণের মতে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সুহ্ম ও পুন্ড্র এই পাঁচটি দেশের পূর্বপুরুষরা আনব ক্ষত্রিয়। মহাভারতের সূর্যপুত্র কর্ণের পালন-পিতা সূত অধিরথও আনব-ক্ষত্রিয়। কর্ণকে সেইজন্যই হয়তো অঙ্গ দেশের রাজা করে দেওয়া হয়। ঋগ্বেদে অনুদের বাসভূমি পরুষ্নি বা ইরাবতীতটে। খৃঃ পূঃ চতুর্থশতকেও অম্বষ্ঠরা সিন্ধুতীরে বাস করছে দেখে তারা যে আনব-ক্ষত্রিয় এটা তেমন অবিশ্বাস্য মনে হয় না।

মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণের মধ্যে কিন্তু তুর্বসু অনু দ্রুহ্যুদের নিয়ে মতভেদ রয়েছে দেখছি। মহাভারত বলেছে, তুর্বসু হতে যবনদের উৎপত্তি—বিষ্ণু-পুরাণ বলে, তুর্বসুরা পুরুবংশের সঙ্গে মিলে গেছে। দ্রুহ্যু মহাভারতে বৈভোজদের জনক; বিষ্ণুপুরাণ বলছে, ওরা কালে উদীচ্য ম্লেচ্ছদের অধিপতি হয়। তাহলে বৈভোজরাই কি উদীচ্য ম্লেচ্ছ? কে তারা? দক্ষিণের ভোজগোষ্ঠীর কোন দেশান্তরিত শাখা নাকি? আবার বিষ্ণুপুরাণে আনব-ক্ষত্রিয়দের দীর্ঘ তালিকা থাকলেও মহাভারতে অনুরাই ম্লেচ্ছগণের জনক। মহাভারত বা

বিষ্ণুপুরাণ দুয়ের মধ্যে কে যে এক্ষেত্রে অধিকতর প্রাচীন মত সঙ্কলন করেছে, তা বলা শক্ত। তবে অনুমান করতে দোষ নাই, মহাভারতই পুরাতন কিংবদন্তী রক্ষা করেছে। যদুদের সঙ্গে পশুদের যোগ আর তুর্বসুরা যবনদের জনক—এ দুয়ের মধ্যে কি একটা সামঞ্জস্য নাই? দুয়ে মিলে এই ইঙ্গিত-ই করছে না কি যে একদা এরা বহির্ভারতে বৈদিক সভ্যতার ধারা বহন করে নিয়ে গিয়েছিল? ইন্দ্রের কৃপায় আবার যখন যদু-তুর্বসুরা ভারতে ফিরল বিষ্ণুপুরাণ তখনকার কথাই তুলে বলছেন তুর্বসুরা মিলে গেল পৌরবদের সঙ্গে। দ্রুহ্যুগোষ্ঠীর বৈভোজরাই পরবর্তীকালে উদীচ্য ম্লেচ্ছ হয়ে গেল হয় তো। কর্ণপর্বে মদ্রদেশের যে রকম নিন্দা পাওয়া যায় (৪৫-৪৬ অধ্যায়) তাতে বেশ বোঝা যায়, ক্রমেই উত্তরপূর্ব সীমান্ত প্রদেশকে ভারতবর্ষের লোক অনাচারী ভাবতে সুরু করছিল। আবার বৈদিক যুগে যে পূর্ব ও দক্ষিণ ভারত ছিল ব্রাত্য মগধদের বাসভূমি বিষ্ণুপুরাণের যুগে তারা জাতে উঠে গেছে। তাই মহাভারতে যে অনুবংশ ম্লেচ্ছাধিপতি, বিষ্ণুপুরাণে সেই ম্লেচ্ছরাই আনব-ক্ষত্রিয়।

আমরা বলি, অনু ও দ্রুহ্যু মায়ের ধারাটি বজায় রেখেছিল। অসুরকন্যার সন্ততি হয়ে ওরা যদি ম্লেচ্ছদের ভাল না বাসে তো ভালবাসবে কে? প্রাচীন মতে বর্ণাশ্রমধর্মানুযায়ী যাদের জন্ম ও জীবনযাত্রা নির্বাহ হয় না তারাই ম্লেচ্ছ। তাই যদি হয়, তাহলে তো আজ সারা ভারতে কে ম্লেচ্ছ আর কে নয় এক ডাকে কিছুই বলা যায় না।

শর্মিষ্ঠার ছোট ছেলেটি পিতৃধারার বাহক—ভরতবংশের পূর্বপুরুষ। কিন্তু একটা ইঙ্গিত লক্ষ্য করার মত। পুরুবংশের গৌরবের মূলে বিশ্বামিত্রদুহিতা শকুন্তলা। তাঁর ক্ষেত্রেই রাজচক্রবর্তী ভরতের উদ্ভব—আবার সেই ব্রাহ্মণী ও ক্ষত্রিয়ের মিলন।* স্মৃতির বিচার যদি ধরি, তাহলে ভারতরা-ও কি যদুদের মতই

* এই সময় হতে কিন্তু পুরুবংশের দুটি শাখা—একটি অবিমিশ্র পৌরব, অন্যটি পুরু-ভরত বা ভারত-জন। মগধের জরাসন্ধ-গোষ্ঠী পৌরব ছিল।

সুত নয়? ভেদ ঘুচে গেল যখন, তখন আর যদুদের অমর্যাদা করা চলে না। সম্ভবতঃ এর পরই যদু-তুর্বশরা ক্ষত্রিয়ের মর্যাদা ফিরে পেয়েছিল। তবে ভরত-বংশের মত মান তারা কেমন করে পাবে? প্রবাসী আত্মীয়ের সঙ্গে তেমন করে কি সামাজিক মানুষ মেলামেশা করতে পারে? যাইহোক, ভরতবংশে একটি ধারা দেখি—ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণত্ব লাভ। কাণ্বায়ন-গোষ্ঠী বৃহস্পতিপুত্র ভরদ্বাজ এরা ভরতবংশে জন্মেছিলেন—বিষ্ণুপুরাণের মত এই-ই। গার্গ্য ও শৈন্য নামধেয় ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণরাও ভরতকুলের সন্ততি। এয্যারুণ পুষ্করিণ্য ও কপিল নামে ভারত উরুক্ষয়ের তিন ছেলেই 'বিপ্রতামুপজগাম'। পাঞ্চাল ক্ষত্রিয়েরাও ভারত-জন। তাঁদের মৌদগল্য-শাখা ব্রাহ্মণ। সন্দেহ হয়, এটি বিশ্বামিত্র-গোষ্ঠীর প্রভাবে সম্ভব হয়েছিল। বিশ্বামিত্র নিজেও চন্দ্রবংশী ঐল ক্ষত্রিয়…তাঁর কন্যাকে ঘরে এনেই ভরতকুলে ক্ষত্রিয়ত্ব ছেড়ে অনেকেই ব্রাহ্মণের মর্যাদা পেলেন হয়তো। তারপর হঠাৎ একটা পরিবর্তন এল। ভরতবংশীয় সংবরণ সূর্যকন্যা তপতীকে লাভের আশায় বশিষ্ঠদেবকে গুরুবরণ করলেন। তপতী-সংবরণের আত্মজ কুরুই কুরুক্ষেত্রের স্রষ্টা। মহাভারতে আছে, যদুবংশোদ্ভবা শুভাঙ্গী হলেন কুরুর পট্টমহিষী…কুরু-পান্ডবদের প্রপিতামহ শান্তনু তাঁদের উত্তরপুরুষ। কুরুর পর আর কেউ ব্রাহ্মণ হননি…অভিজাত ক্ষত্রিয়বংশ হিসাবেই তাঁদের যা কিছু প্রসিদ্ধি। বশিষ্ঠের মধ্যস্থতাতেই কি এতকাল পরে পুরু-ভারত গোষ্ঠীতে যাদবীর প্রবেশাধিকার মিলল? বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ বলে মেনে নেওয়াতেও বশিষ্ঠের পরম উদারতার প্রমাণ দিচ্ছেন পুরাণকার। এরপর স্বাভাবিক নিয়মেই বশিষ্ঠের গোষ্ঠী ভারতের গুরুবংশ হয়ে উঠেছেন। শঙ্করাচার্য গুরু-পরম্পরায় তাঁদেরই প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

মহাকাব্য ও পুরাণের জটিল বংশপরম্পরা এবং রূপককাহিনীগুলির সম্পূর্ণ সারোদ্ধার করা একজনের সাধ্য নয়। বহুদিনের চেষ্টায় বহুজনের সম্মিলিত অধ্যবসায়ে তার প্রকৃত মর্মোদ্ঘাটন সম্ভব। দিগ্ দর্শন হিসাবে এই পর্যন্ত বলা যায়. যতদূর দেখছি যদুরা পাঁচ ভাই-ই ভারতবর্ষের ধারক।

পুরু অভিজাতদের প্রতিভু হয়ে বৈদিক সভ্যতার অবিমিশ্র ধারাটি অক্ষুণ্ণ রাখতে চেয়েছিলেন। বাকী তিনজন যদুর নেতৃত্বে জনসাধারণের ভাবনা ও সাধনাকে স্বীকার করতে চেয়েছিল। ভারতকে যদুরাই মহাভারত (greater India) করেছে বেদার্থ উপবৃংহনের সহায় তারাই। বশিষ্ঠের চতুর্থ পুরুষ কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাস তাদেরই চারণ হয়ে পাঁচটি ধারাকে একই প্রভাব হতে উৎসারিত বলে গেছেন। পুরুবংশে বৈদিক ধারা, যদুবংশে অবৈদিক ধারার প্রাধান্য—কিন্তু দুয়ে মিলেই ভারত-কথা, সত্যবতীসুতের বক্তব্য এই-ই। দুই ধারার মিলন ও বিরোধের ইতিহাস আবহমান কাল থেকে শ্রুতি ও স্মৃতিতে রক্ষিত আছে।

যদুদের সম্বন্ধে কোনও ঐতিহাসিক বলেছেন—'They were looked upon as Dasas (unblievers) on account of their heterodoxy. (R. V. Culture P. 153)। কথাটা আমাদের অসঙ্গত ঠেকে না। মনুসংহিতায় দেখি লুপ্তক্রিয় ক্ষত্রিয়রাই দস্যুপদবাচ্য—যথা পৌণ্ড্রক ঔড্র দ্রবিড় কাম্বোজাদি। পুরাণে প্রথম তিন জাতি আনব ক্ষত্রিয়, চতুর্থটিই সম্ভবতঃ বিষ্ণুপুরাণের উদীচ্য ম্লেচ্ছজাতির এক শাখা। যদুরাও লুপ্তক্রিয় ক্ষত্রিয়ের মত চলত-ফিরত নাকি ? অভিজাত ক্ষত্রিয়দের কাছে হয়তো সেইজন্যই হতমান ছিল তারা। বাংলায় দুরন্ত ছেলেকে বলা হয় 'দস্যি'। যদুরা ছিল বেদমাতার 'দস্যি ছেলে'। শ্রীঅনির্বাণ ব্রাত্য বলে যাদের চিহ্নিত করেছেন তাঁদের সঙ্গে যদুগোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠতার পরিচয় ভাগবতে বর্ণিত 'যদু-অবধূত-সংবাদে' পাওয়া যায়। হতে পারে, যদু রাজন্যদের সহায়তা পেয়ে-ই উদাসীন ব্রাত্য সম্প্রদায় ভারতবর্ষে প্রথম মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল।

ব্রাত্যদের নিয়ে ঐতিহাসিকের কৌতূহলের অন্ত নাই। তাদের বেশ-ভুষা চালচলন রীতিনীতি বৈদিক আর্যদের সঙ্গে মেলে না। কে তারা ? কোথা হতে এল ? এ নিয়ে ভাবতে গিয়ে কোন পন্ডিত বলছেন—Whether they were batches of earlier or latest imigrants it is difficult to

decide, but it is significant to note that some sections of the Vratyas retained for a long period, their original non-monarchical institutions as is proved by the history of the Yadavas & of the Lichhavis who were Vratyas if we believe in the tradition recorded in the Manusanhita. * (Hindu Polity & Political Theories pp. 40-41).

বিশ্বজনীন দৃষ্টি থাকায় ব্রাত্যদের পক্ষে রীতিনীতি আচার-ব্যবহার ও বেশভূষায় বৈদিক সমাজের অনুগামী হওয়া সম্ভব ছিল না। আধুনিক কালে বৈদান্তিক এবং সন্ন্যাসী হলেও স্বামী বিবেকানন্দকে আহার-বিহারাদি বহিরঙ্গে এমনি বেপরোয়া দেখি। তার কারণ দর্শাতে গিয়ে তিনি একখানা চিঠিতে কোনও একজন হিতার্থীকে লিখেছিলেন--'If the people in India want me to keep strictly to my Hindu diet, please tell them to send me a cook & money enough to keep him. This silly bossism without a mite of real help makes me laugh (Epistle I, series XLI) চিরাচরিত প্রথার অনুবর্তন না করে যারা একলা চলে তাদের জীবনযাত্রায় বাহ্যত সুবিধাবাদের কিছুটা আধিপত্য থাকবেই। নইলে নিত্য-নূতন পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করা চলে না। ব্রাত্যদের জীবনযাত্রাতে এইজন্য আর্যেতর অন্যান্য জাতির ছাপও পড়েছিল—যাযাবরেরা যেমন নানা দেশের জগাখিচুড়ী। চিন্তাশীল ব্যক্তির চোখে ধরা পড়ত ব্রাত্যরা আর্যভাবনারই একটা বিশেষ ধারার বাহক। কিন্তু সমাজের সাড়ে-পনের-আনা লোকের কাছে তারা বিভীষিকা, তারা ত্যাজ্য। এ হেন ব্রাত্যদের সঙ্গে যদুগোষ্ঠীর আধ্যাত্মিক আদান-

---

* শ্রীঅনির্বাণ বলেন—ব্রাত্যরা নবাগত নয়। তারা আগেই পূবদেশে এসে গিয়েছিল। বৈদিক আর্যরাই তার পড়ে এসেছে। ব্রাত্যদের ভাষা বৈদিক ভাষা ছিল কিনা তা নিয়ে কেউ কেউ সংশয় করেন। কিন্তু তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ তাদের সমভাষীই বলেছেন।

প্রদান ছিল। শাসনব্যাপারে যদুরা বেছে নিয়েছিল গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র নয়। সুতরাং সবরকমেই তারা বিপ্লবী, তারা রক্ষণশীল পুরুবংশীয়দের কাছে কুলকলংক।

আভিজাত্যগর্বী পুরু-ভরতবংশের চাপে যদুকুলকে হয় তো স্বদেশ হতে নির্বাসিতের মত দেশদেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে বহুদিন। তবু তারা মরেনি, বারবার নতুন বিক্রমে মাথা তুলেছে ভারতবর্ষে। অবশেষে অভিজাত-গোষ্ঠী তাদের মেনে নিতে বাধ্য হল—না নিলে নিজেদেরই বলহানি, এ জ্ঞানটুকু ছিল। কিন্তু মনের কোণে বিরাগটা রয়ে-ই গেল সমাজে। তাই আদিপর্বের ৮৬ অধ্যায়ে বলা হয়েছে—রাজা যযাতি যদুদের অন্ত্যজ জাতি মধ্যে স্থাপন করেছিলেন। দ্রোণপর্বে ১৪৩ অধ্যায়ে যদুবংশের বৃষ্ণি-অন্ধক শাখাকে স্পষ্টই ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় বলা হয়েছে। যে মহাভারত বাসুদেব কৃষ্ণের স্তুতিবাদে মুখর সেই মহাভারতেই শ্রীকৃষ্ণের পিতৃবংশের প্রতি এ ধরণের কটূক্তি হতে বেশ বোঝা যায়, যাদব শ্রীকৃষ্ণকে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ বলে মান দিতে ভারতবাসীর অনেক বিলম্ব হয়েছিল নিশ্চয়ই। শ্রীমদ্ভাগবতে দেখি, শ্রীকৃষ্ণনন্দন শাম্ব যখন লক্ষ্মণাকে হরণ করেছিলেন তখন কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম পর্যন্ত যদুকুলকে কটূক্তি না করে পারেননি। ভাগবতের ওই অধ্যায়টিতে তথাকথিত অভিজাত আর্যদের মনে সঞ্চিত গরলরাশি যেন উপচিয়ে উঠেছে—কি ঘৃণা যদুবংশের পরে!

যযাতির জরা গ্রহণে যদু অসম্মত হয়েছিলেন—জানি না এই কাহিনীর মধ্যে পুরাণকার কি রূপক সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু ওই উপলক্ষ্যে যদুর মুখে যেসব কথা বসানো হয়েছে তা নিতান্তই অশ্রদ্ধেয়। সন্দেহ হয়, এ-ও কি আদিম বিদ্বেষবুদ্ধির রচনা নাকি? মহাভারতেরই এক জায়গায় কিন্তু যদু সম্পর্কে অন্য একটি প্রসিদ্ধি আছে। উদ্যোগপর্বে ১৪৭ অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্র বলছেন, 'যদু মহাবল পরাক্রান্ত বীর ছিলেন। তিনি দর্পে বিমোহিত হয়ে পিতার শাসনে অনাস্থা প্রকাশ করে তাঁকে ভাইদের ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়দের অপমান করতে শুরু করেন। পৃথিবীর সমস্ত ভূপালদের বশীভূত করে হস্তিনায় সগর্বে বিচরণ করতেন যদু। তারই ফলে যযাতি তাঁকে অভিশপ্ত ও রাজ্যচ্যুত

করলেন। যদুর যে ক'টি ভাই তাঁর অনুবর্তী ছিল তাদেরও যযাতি ত্যাগ করেছিলেন। পিতার বশবর্তী ছিলেন বলেই সর্বকনিষ্ঠ হয়েও পুরুই সিংহাসন পেলেন।' বলা বাহুল্য, যদু সম্পর্কে এই উক্তিগুলি আমাদের অনুমানের সঙ্গে মেলে, কিন্তু ভাগবত বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারতের অন্যত্র দ্বিতীয় কিংবদন্তীর প্রাধান্য—শেষ পর্যন্ত যদুকে ভোগাসক্ত দুর্বিনীত অনাচারী বলেই প্রতিপন্ন করা হয়েছে। যদুবংশ মহাপবিত্র বলেও শ্রীমদ্ভাগবত যে যদু-সম্পর্কিত বহু-প্রচলিত কিংবদন্তীই বিবৃত করেছেন, এতে বোঝা যায়—ভারতীয় সমাজে যদুগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অবজ্ঞা ও দ্বেষ কিরকম বদ্ধমূল ছিল। সর্বসাধারণের সঙ্গে যথেচ্ছ আত্মীয়তা (আহীর বা আভীর নাম-ধারী মিশ্রজাতির সঙ্গে যদুবংশীয় ক্ষত্রিয়দের বিবাহসম্পর্কের ফলে ব্রজের গোপকুলের উদ্ভব···যাদবকুল এই রকম অগণিত উপজাতি সৃষ্টি করেছিল), ব্রাত্যগোষ্ঠীর সঙ্গে গভীর একাত্মতা এবং বহির্ভারতের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগের ফলে যাদব-সমাজে অমিতাচার বা স্বৈরাচারের আতিশয্য যে ছিল না, তা নয়। বিধিবিধাননিষ্ঠ আচারপরায়ণ সুসম্বদ্ধ বৈদিক সমাজ কোনদিন যদুদের সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে পারেনি। তা না-ই পারুক, সহস্র অনাচার করলেও যাদবগোষ্ঠী ছিল প্রাণবন্ত সজীব—দুর্ধর্ষ গতিবেগ ছিল তাদের সমাজে। তাই ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে ভারতের প্রাণপুরুষ ওই যদুকুলেই আবির্ভূত হয়েছিলেন, কুরু-পাঞ্চালদের মধ্যে আসেননি।

বিধিবদ্ধ রাজনৈতিক ইতিহাস না লিখলেও সাংস্কৃতিক ইতিহাস সংগ্রহ করায় পুরানকারের আলস্য ছিল না। সযত্ন পরিশ্রমে প্রাচীন সাহিত্যের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা চালিয়ে গেলে বৈদিক সমাজের পূর্ণাঙ্গ বিবৃতি মিলবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। মোট কথা, শ্রীকৃষ্ণের পিছনে যে ঐতিহাসিক পটভূমি তা একটা গণবিপ্লবেরই দ্যোতক। যদিও সে পট-ভূমি অসম্পূর্ণ, তবু ইতস্তত বিক্ষিপ্ত যা কিছু উপকরণ পাওয়া গেছে, তাতেই বোঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র জীবন একটা যুগান্তকর ঘোর বিপ্লবেরই ইতিহাস। এইজন্য যদুপতি শ্রীকৃষ্ণকে কাল্পনিক চরিত্র বলে উড়িয়ে দিতে আমাদের বাধে।

যদুকুলের নানা শাখা দক্ষিণ পশ্চিম ও মধ্য ভারতে ছড়ানো ছিল। সাত্বত-গোষ্ঠীর বৃষ্ণিশাখায় শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব। পুরাণাদিতে বৃষ্ণিকুলের নাম তো আছে-ই। মহাভারত বলছেন, শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন বৃষ্ণিদের সংঘমুখ্য (১২।৮১।২৬)। প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে অষ্টাধ্যায়ী পাণিনি ও কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে বৃষ্ণি-অন্ধক ও বৃষ্ণি-সংঘের উল্লেখ রয়েছে (পাণিনি ৪।১।১১৪ ; ৬।২।৩৪ ও অর্থশাস্ত্র ১।৬)। Corporate Life in Ancient India-র গ্রন্থকার জানিয়েছেন, বৃষ্ণিসংঘের একটি মুদ্রা পাওয়া গেছে। অর্থশাস্ত্রের যুগে বৃষ্ণিসংঘের অবদান বোধহয় ছিল সৌরাষ্ট্রে। অর্থশাস্ত্রকে খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকের বলতে যাঁরা দ্বিধা করেন তাঁদের জন্য ঘটজাতকের নাম করা যেতে পারে। এই জাতকটিতে শ্রীকৃষ্ণের কংসবধের কথা আছে।

যাদব বৃষ্ণিকুলের ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে এ-দেশীয় সাহিত্যের সাক্ষ্য ছাড়া বিদেশী সাহিত্যের সাক্ষ্যও পাওয়া গেছে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সমকালীন মেগাস্থিনিস লিখে গেছেন—"The river Jomanes flowes between the towns Methora & Carisobora (or Kleisobora)". মেগাস্থিনিস সম্পর্কিত বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে General Cunnigham নাকি Carisobora বা Kleisobora ভিন্ন Cyriso-borka ও দেখেছেন। যদি Kleisobora হয় কৃষ্ণপুর তবে Cyrisoborka হয় কালিকাবর্ত। মোট কথা, যমুনার একপারে মথুরা অন্য পারে কৃষ্ণপুর বা কালিকাবর্ত নামে একটি জনপদ দেখেছিলেন গ্রীক রাজদূত। সেখানকার অধিবাসীদের নাম Soursenoi এবং তাদের প্রধান দেবতা Herakles or Hercules। পণ্ডিতেরা একবাক্যে বলেন, ওই কৃষ্ণপুর বা কালিকাবর্ত বৃন্দাবনেরই পুরাতন নাম এবং মেগাস্থিনিস শূরসেনবাসী ক্ষত্রিয়দের শ্রীকৃষ্ণপূজার কথাই বলে গেছেন।

খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতকের গ্রীকরা শ্রীকৃষ্ণকে যে কেন গ্রীকপুরাণের Hercules মনে করল, এ একটা রহস্য। সাদৃশ্য বলতে তারা পেয়েছিল ঃ—(১) "He far surpassed other men in personal strength & prowess. (২) He

married many wives & had a very numerous progeny of male children."। গ্রীক মহামানব Hercules ও অমানুষিক বলবীর্যের অধিকারী এবং বহুবিবাহের ফলে সহস্র-পুত্রের জনক। গ্রীকরা লিখে গেছেন, তাদের Hercules এর মতই শূরসেনদের দেবতাও নাকি গদা ও সিংহচর্ম ধারণ করতেন। শ্রীকৃষ্ণের পীতাম্বরকেই সম্ভবতঃ তারা সিংহচর্ম ধরে নিয়েছে। ভারতীয় Herakles সম্বন্ধে আরও নানা অদ্ভুত তথ্য Megasthenes লিপিবদ্ধ করে গেছেন। যথা, তাঁর একটি মাত্র মেয়ে ছিল। তার নাম Pandaia। মেয়েটিকে তিনি নিজে বিয়ে করে তার জন্মভূমিটি তার নামেই দান করেন। Pandaia যে দেশের রানী হল তার নাম হল Pandaia। অগণিত দৈত্যদানব বধ করার পর Hearkles সমুদ্রে মুক্তা নামে এক ধরনের রত্ন পেয়ে আদরিণী Pandaia কে উপহার দেন। তদবধি ভারতীয়েরা মুক্তার ব্যবহার শিখেছে।

দক্ষিণের পাণ্ড্যরাজ্যই কি Pandaia? এককালে শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে সুদূর দক্ষিণে কি কাহিনী প্রচলিত হয়েছিল কে জানে। Megasthenes হয়তো তারই কিয়দংশ শুনে ইচ্ছামত কিছু ভাঙা-গড়া করেছিলেন।

উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের Siboi জাতির সঙ্গে Indian Herakles এর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা Megasthenes বলেছেন। ঋগ্বেদে শিবঃ-জাতির নাম আছে। সুদাস-বিরোধী সম্মিলিত রাজসঙ্ঘে এরা যোগ দিয়েছিল। আর একটি জাতির নাম বিষাণী। শিব-বিষাণীরা কি বিষাণডম্বরুধারী শিব পশুপতির উপাসক সম্প্রদায়? আলেকজান্ডারের ভারতাক্রমণের সময় গ্রীকরা দেখেছিল Siboiদের হাতে গদা (লগুড় না দণ্ড?), পরিধানে পশুচর্ম। কেউ কেউ বলেন, Herakles এর পরিচ্ছদও চর্ম—এই সাদৃশ্য দেখেই গ্রীকরা ধরে নিয়েছিল Siboi জাতি তবে তাঁরই অনুবর্তী। আমাদের কিন্তু আর একটু মনে হয়। খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতকের শৈব-পাশুপতরা গভীর কৃতজ্ঞতাভরে বাসুদেব কৃষ্ণকে স্মরণ করতেন নিশ্চয়ই। শ্রীকৃষ্ণ যে শিবোপাসনা করতেন,

মহাভারতে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। শৈবসম্প্রদায় তাঁরই ছত্রচ্ছায়ায় প্রবল হয়ে উঠেছিল সম্ভবতঃ। অতএব Siboi জাতির মধ্যে গ্রীকরা Indian Herakles এর প্রভাব দেখবেন, এটা আশ্চর্যের কিছু নয়।

বৌদ্ধ সাহিত্যে ষোড়শ মহাজনপদের তালিকায় শূরসেনের নাম আছে। মহাভারতে দেখছি, মগধসম্রাটের দৌরাত্ম্যে যদুগোষ্ঠীর এক শাখা মূল শূরসেন-ভূমি হতে আনর্তমণ্ডলে সরে গিয়েছিল। ক্রমে-ক্রমে প্রায় সমগ্র মধ্যভারত যাদবদের প্রভাবাধীন হয়ে যায়। চেদি অবন্তী মালব সকলেই শৌরি বাসুদেবের শাসন মেনে নিতে বাধ্য হয়। তাই বৌদ্ধযুগে দেখি, শূরসেনদের রাজার উপাধি অবন্তীপুত্র—তখনও পর্যন্ত অবন্তীর সঙ্গে শূরসেন ভূমির সম্পর্ক আছে।

দক্ষিণের ভোজবংশ যে পুরাতন সামন্তগোষ্ঠী, অশোকানুশাসনে তার প্রমাণ মেলে।

বেসনগরের গরুড়ধ্বজ প্রমাণ করে—খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকেই বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ এবং ভাগবত ধর্ম এমনই প্রসিদ্ধি করেছে যে তক্ষশীলার যোন হেলিওডোর ভাগবত বলে নিজের পরিচয় দিয়ে গরুড়স্তম্ভ নির্মাণ করতে কুণ্ঠিত হয়নি। এরপর থেকে বিধিবদ্ধ ইতিহাসের যুগ শুরু হল—বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে তখন সারা ভারতেই আবিষ্কার করা যায়।

যদু সাত্বত ভোজ বৃষ্ণি শূরসেনাদি সম্বন্ধে কম পক্ষে খৃঃ পূঃ ২০০০ বছর হতে নিয়মিত উল্লেখ ভারতীয় সাহিত্যে ছড়ানো রয়েছে দেখা গেল। ঋগ্বেদে শূরসেন বা মথুরা-বৃন্দাবনের উল্লেখ নাই বলে যাঁরা আপত্তি করবেন তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিই—ঋগ্বেদ ভৌগলিক বৃত্তান্ত নয়। প্রসঙ্গতঃ যে সব জাতি বা দেশের কথা উঠেছে মাত্র তাদের নামই ঋগ্বেদে মেলে। শূরসেন-ভূমির নাম ঋগ্বেদে নাই বলেই যে যদু সাত্বত ভোজরাও মিথ্যা হয়ে যাবে এ-যুক্তি অচল।*

---

* হিউয়েন সাঙ্ মথুরার বর্ণনা দিয়ে গেছেন, কিন্তু যমুনা নদীর নাম করেননি। তাতেই কি প্রমাণ হয়, মথুরা সেসময় যমুনাতীরবর্তী ছিল না?

[পঃ পূঃ দ্রষ্টব্য]

ঋগ্বেদপ্রসিদ্ধ যাদবগোষ্ঠীই পরবর্তী কালে ধ্রুবা মধ্যমা দিশস্থ কুরুপাঞ্চাল সভ্যতার প্রবল প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। ঐতিহাসিক কালেও যদুবংশ-শাখা ভোজ-বৃষ্ণিরা ভারতের বুকে বর্তমান। তারা কবির কল্পনা বা পণ্ডিতের জল্পনা নয়। যদু-ভোজ-বৃষ্ণিকুলের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য—কেবল যাদব ঐতিহ্যের গৌরবচূড়া যিনি যাঁর নামে মহাভারতের নাম 'কার্ষ্ণ বেদ' (১।১।২৬৮ ; ১৮।৫।৪১) শুধু তিনিই solar myth কিংবা রূপক পুরুষ? এমন রাম ছাড়া রামায়ণ কি করে সম্ভব তা সাধারণ বুদ্ধির অগোচর।

সমগ্র ভারতেতিহাসের 'পরে, শ্রীকৃষ্ণের অবিসম্বাদী প্রভাব। ভগবান বুদ্ধ ও খৃষ্টের প্রভাব ভূমণ্ডলব্যাপী বটে, কিন্তু লোকায়ত সংস্কৃতির প্রতিটি পর্বে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের মত জড়িত হননি। ভারতীয় সমাজের সর্বোচ্চ শিখর হতে সর্ব-নিম্ন স্তরের অধিবাসী—প্রত্যেকের সঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণের গভীর যোগ। তিনি শুধু গীতা-প্রবক্তা নন, গ্রাম্য 'ধামালী'রও নায়ক। জগতের দ্বিতীয় কোন অবতার-পুরুষ এমন 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্' রূপে প্রকাশিত হননি। তাছাড়া একটি অবাস্তব কল্পপ্রতিমাকে নিয়ে সর্বসাধারণের এত মত্ততা কি সম্ভব?

ব্রত-পূজার মধ্যে অন্তত ১১।১২টি 'শ্রীকৃষ্ণ উবাচ' বলে চলে গেছে। তাঁর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পাত্র-পাত্রীদের (যেমন বসুদেব-দেবকী, রুক্মিণী-সত্যভামা) নিয়ে ব্রতকথা রচিত হয়েছে, এ ধরণের ব্রত গণনা করলে আরও ৭।৮টি মিলবে

সমসাময়িক অন্যান্য বিবরণ হতে জানা যায়, মথুরা তখন যমুনাকূলেই ছিল এবং সে যমুনা নিতান্ত শীর্ণা ছিল না। যমুনার অনুল্লেখটা চীনা পরিব্রাজকের একটা ভ্রম মাত্র। আর এক কথা—ঋগ্বেদে এক জায়গায় এই ধরনের উক্তি আছে—যমুনার তীরে আমি প্রসিদ্ধ গোধন খুঁজি, অশ্বধন খুঁজি (৫।৫২।১৭)। অনেক ঐতিহাসিক বলেন, এখানে যমুনাতীরবর্তী গোপালন-ক্ষেত্র বা গোচারণের ইঙ্গিত আছে। পরে ওইখানে নন্দ-ব্রজ ও গোকুলনগরী গড়ে ওঠে—এই তাঁদের অনুমান।

('পুরোহিত-দর্পণ' দ্রষ্টব্য)। যাত্রা-পর্বের মধ্যে 'শ্রীকৃষ্ণস্য চন্দনযাত্রা' বলে বৎসরারম্ভেই অক্ষয়তৃতীয়া হতে চলল একুশদিন-ব্যাপী উৎসব। তারপর রুক্মিণীদ্বাদশী, শ্রীকৃষ্ণের ফুলদোল, স্নানপূর্ণিমা, রথযাত্রা, ঝুলনপূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী, নন্দোৎসব—কত বলা যাবে? বিষ্ণু আর শ্রীকৃষ্ণ যে আলাদা, পঞ্জিকাকার বা বারব্রত-নির্ণয়কর্তারা তা স্পষ্টই নির্দেশ করে দেন। কাজেই উল্লিখিত পর্বগুলি বৈদিক দেবতা বিষ্ণুরই স্মরণোৎসব, এ বলা চলবে না। ওগুলির পিছনে রয়েছে বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এক দেবমানবের স্মৃতি।

ওড়িশায় মেয়েরা আজও লক্ষ্মীপূর্ণিমা হতে রাসপূর্ণিমা—এই একমাস কার্তিকা-ব্রত ও রাধাদামোদরের অর্চনা করে। বৈষ্ণবের তো কার্তিক মাস ভরা নিয়ম সেবা। দীপান্বিতার পরদিন গোবর্ধন-যাত্রা, অন্নকূট। তারপরই এল গোষ্ঠাষ্টমী, প্রসিদ্ধ রাসোৎসব। পৌষে দধ্যোদন-উৎসব দিয়ে শুরু করে পৌষ-পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক-যাত্রা। বসন্তপঞ্চমীতে (শ্রীপঞ্চমী) শ্রীকৃষ্ণার্চনা করেই দোল বা বসন্তোৎসবের প্রস্তুতি। সে উৎসবের এক নায়ক শ্রীকৃষ্ণ। এই-ভাবে সারা বৎসর ধরে ভারতের প্রতিটি আনন্দোৎসবের সঙ্গে তিনি জড়িয়ে রয়েছেন।

লোকনৃত্যের মধ্যে সাধারণতঃ রাসলীলা ও গোপীকৃষ্ণ-বিলাসই প্রধান বিষয়বস্তু, গুজরাটি গরবা কি মণিপুরী নাচে যেমন। কথক-নাচকে এককালে কৃষ্ণনৃত্য বলত। এক মতে ভরত নাট্যশাস্ত্র শ্রীকৃষ্ণের পৌত্রবধূ ঊষাই এ নৃত্য ভারতময় ছড়িয়ে দেন। ভাগবত দশমস্কন্ধের প্রসিদ্ধ শ্লোক—"রন্ধ্রান্, বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈর্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্ গীত-কীর্তিঃ॥" শার্ঙ্গদেবের মত সঙ্গীত-শাস্ত্রবেত্তারা বলেন, ওইখানেই কীর্তনের আদিরূপ কীর্তিলহরী বা কীর্তিপ্রবন্ধের উল্লেখ রয়েছে।* কীর্তনজাতীয় ভজনাত্মক সঙ্গীত বৈদিক উপাষকদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল ('সবিতা ভগঃ' প্রবন্ধ, 'আর্যদর্পণ' দ্রষ্টব্য) নিশ্চয়। কিন্তু তার বহুল প্রচার যে শ্রীকৃষ্ণকে উপলক্ষ্য

করেই ঘটেছিল এই আমাদের বক্তব্য। কীর্তনের উৎসভূমি বৃন্দাবন, ভজনের আদিপীঠ মথুরা—দুয়ের মূলেই রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ। আর বাংলায় তো প্রবাদই আছে—'কানু ছাড়া গীত নাই'।

বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় যে সব লোক সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে, ছড়া পাঁচালী গাথা গান গল্প—তারও বার আনা কেবল কৃষ্ণকথা। লোকসাহিত্যের উপর পরোক্ষ প্রভাব যদি ধরি, দেখব--বাংলার প্রসিদ্ধ রূপকথাগুলিতে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কৃষ্ণচরিতেরই ছায়া পড়েছে।

'এক হি কুমার ছিল নামেতে মদন।
বারহি বৎসর থাকে পাতাল ভবন॥
চাঁদ না বাঁধন মানে কপালের খেল।
শিকারে গেল রে কুমার বুকে দিয়া শেল।'

এ কি শ্রীকৃষ্ণের গোপনে বৃন্দাবন বাস ও মথুরায় চলে যাওয়ার করুণ কাহিনী হতেই সৃষ্ট নয়? মদনকুমারের 'মধুমালা মধুমালা' জপ ···কুমারের অদর্শনে মধুমালার উন্মাদিনী দশা—সবই যে রাই-কানুর স্মৃতি-অবশেষ। নীলরাজাকে হারিয়ে শঙ্খমালার যে হাহাকার সে তো গোপালকে হারিয়ে মা-যশোদারই বিলাপ। আবার বারদিনের ছেলেকে ভূতদানা বাঘ-বাঘিনীর হাত থেকে বাঁচিয়ে বুকে করে মানুষ করেছিল যে বারবছরের মেয়েটি— সেই মালঞ্চমালার কাহিনীটি কি বাসুদেব কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ সন্তান প্রদ্যুম্ন ও তার পালয়িত্রী মায়াবতীকে মনে পড়িয়ে দেয় না? এক শ্রীকৃষ্ণ শতসহস্র রূপকথার রাজা, তাঁর জীবনচরিত হাজার হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষের কল্পনাজগৎ আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

সুপ্রাচীন কালেই কৃষ্ণকথা কেবল সারা ভারতে নয় বর্হিভারতেও ছড়িয়েছিল, এ অনুমানে দোষ কি? গ্রীকরা আচমকা শ্রীকৃষ্ণকে Hercules বলে ধরে নিয়েছিল কেন? গ্রীকপুরাণের বহু দেবদেবী আর্য দেবতার ঈষৎ পরিবর্তিত সংস্করণ। Hercules-এর উপাখ্যানগুলির বহুলাংশও কৃষ্ণকীর্তির প্রতিবিম্ব নয় তো? ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে এ তথ্য বোঝার ফলেই হয়তো গ্রীক হেলিওডোর

ভাগবতধর্ম আশ্রয় করেছিলেন। বিদেশী ঐতিহাসিককে স্বীকার করতে হয়েছে—"The tendency certainly was for Indo-Greek princes & people to become Hinduised rather than for the Indian Rajas & their subjects to become Hellenized. (Oxford Hist. p 142). ভগবান যীশুখৃষ্টকে শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন 'ঋষি কৃষ্ণ'। যীশু শ্রীক্ষেত্রে এসে গোপাল উপাসনা গ্রহণ করেছিলেন, ওড়িষার বিদগ্ধ সমাজে এ বিশ্বাস প্রবল। এ বিশ্বাসের সঙ্গত প্রমাণ না থাক, যীশুর প্রেমধর্মে যে ভাগবতদের দান আছে, তা অনস্বীকার্য।

ভারতীয় সংস্কৃতি এবং মহাভারতের (Greater India) প্রত্যেক ক্ষেত্রে যাঁর আবেশ স্পষ্টই অনুভবগম্য, সেই শ্রীকৃষ্ণ কোনকালে ছিলেন না, এ কি করে বলি? তাঁর আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে এখনও সঠিক কিছু বলা শক্ত। বৈদিক সাহিত্যের কাল-নির্ণয়-সমস্যা সমাধান হলে শ্রীকৃষ্ণের সাল-তারিখও পাওয়া যাবে। মোটামুটি বলা যায়, তিনি পাঁচ হাজার বছর আগেকার সমাজে এসেছিলেন। মধ্যযুগীয় সন্তদের বিপ্লবী মতবাদকে প্রতিষ্ঠা দিতে যেমন শ্রীগৌরাঙ্গ এসেছিলেন, তেমনি ব্রাত্যদের মর্যাদা দিতেই যেন শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব। অভিজাতকুলে তিনি আসেননি, ব্রাত্যক্ষত্রিয়ের ঘরেই তাঁর জন্ম। পুরাণেতিহাস যাকে পিতৃদ্রোহী মদান্ধ যুবক বলে কলঙ্কের টিকা পরিয়েছিল, শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের কাছে সেই যদুকে বলছেন 'অমিততেজা ধর্মবিৎ', বলছেন 'সুমেধা।' তিনি যদুরই উত্তর-পুরুষ।

'ব্রাতপতি' রুদ্র পশুপতির দিকে গোপালকরা তাকিয়ে থাকে ('উত গোপা অদৃশ্রন্'—বৈশাখ ১৩৬৪র আর্যদর্পণ—'ব্রাত্য') এই সূত্রে অনুমান করা চলে গোকুলে শিবোপাসকের অভাব ছিল না।* শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্রগুরু সান্দিপনি

---

* "লক্ষণীয়—শিব—'পশুপতি', বিষ্ণু ভগ—'গোপ', অর্থাৎ এই দুটি দেবতা গণসাধারণের, যারা পশুপালন করে গরু চরায় সেই বৈশ্যদের। শিবের অবতার 'বামদেব' বলে আমি বিশ্বাস করি 'বেদমীমাংসা'য় তার প্রমাণ দেওয়া যাবে। বামদেবও বিদ্রোহী ছিলেন, যদিও চতুর্থ মণ্ডলের দ্রষ্টা তিনিই।" —অনির্বাণ।

[পঃ পৃঃ দ্রষ্টব্য]

থাকতেন মহাকালপীঠ উজ্জয়িনীতে। তাঁর সন্তান মধুমঙ্গল কিংবদন্তী অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণের বাল্যসখা। মধুমঙ্গলের পিতামহী পৌর্ণমাসী, সম্পর্কিত পিতামহ ঋষি দেবপ্রস্থ (পৌর্ণমাসীর সহোদর) এবং সোদরা নান্দীমুখী ব্রজবাসী ছিলেন। লোকে যাঁকে যোগমায়া ও সিদ্ধা-শিরোমণি বলত, বর্ণনায় মনে হয়, সেই ভগবতী পৌর্ণমাসী শৈব যোগিনী ছিলেন। গৈরিক-ধারিণী তিনি অথচ স্বামী-পুত্র ছিল তাঁর। এঁদেরই হাতে শ্রীনন্দনন্দন অধ্যাত্মবিদ্যার প্রথম পাঠ নিয়েছিলেন কি? যন্ত্র কুড়িয়ে পেয়ে শ্রীবিদ্যার আরাধনা করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ—'ত্রিপুরা-বাসুদেব সংবাদে' এই যে প্রসিদ্ধি—তবে কি পৌর্ণমাসীই ছিলেন সে সাধনার উত্তরসাধিকা? রতিপতিকে বুঝি কৈশোরেই চিনেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ! মোট কথা, গোপরা সরস্বতী-তীরে অম্বিকাবনে গিয়ে হর-পার্বতীর পুজো দিত, ভাগবতে তার উল্লেখ আছে। দেবযাত্রা উপলক্ষ্যে গো-শকটে চড়ে জাতকৌতুক ব্রজবাসী দেবস্থানে চলেছে—

"তত্র স্নাত্বা সরস্বত্যাং দেবং পশুপতিং বিভুম্।
আনর্চুরর্হনৈর্ভক্ত্যা দেবীঞ্চ নৃপতেঽম্বিকাম্ ॥ ১০।৩৪।২

দান-ধ্যান করে ধৃতব্রত গোপকুল নদীজলমাত্র পান করে সেরাত্রি সেখানেই রইলেন। সব মিলিয়ে মনে হয়, যেন শিবরাত্রির কথা বলা হচ্ছে। এখানেই অজগর-গ্রাস হতে পিতা নন্দকে রক্ষা করতে গিয়ে শাপমুক্ত সুদর্শন বিদ্যাধরের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ। 'বিরূপ আঙ্গিরস ঋষিদের অনুগ্রহেই আপনার দেখা পেলাম আমি'—বিদ্যাধরের এ উক্তিতে সন্দেহ হয়, তবে বুঝি এই সূত্রেই ঘোর আঙ্গিরসের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের যোগাযোগ ঘটেছিল। পরমগুরু সদাশিব হলেন শ্রীকৃষ্ণের বেদাচার্য গুরু লাভের নিমিত্ত।

ঘোর আঙ্গিরসের কাছে নিজেকে বাসুদেব না বলে শ্রীকৃষ্ণ দেবকী-পুত্র পরিচয় দিলেন কেন? তাছাড়া ছান্দোগ্য-উপনিষদে যা রয়েছে সেই গুরু-শিষ্য-সংবাদ

আমরা বলি, পশুপতি শিবও ছিলেন মানব-দেবতা। নিজের জীবনে মহাবিপ্লবের বীজ উপ্ত আছে জেনে ক্ষত্রিয়কুলে ফিরে গিয়েও গণদেবতা শিব-শঙ্করকে শ্রীকৃষ্ণ ভুলতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত ইতিহাস-পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ শিবোপাসক বলেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। ভারতের ধর্মজগতে শিব ও কৃষ্ণ, দুই দেবমানবের অপ্রতিহত প্রভাব।

অন্য কোন পুরাণেই বা নাই কেন? বৃন্দাবনের অনেকগুলি গোপন অধ্যায়ের মত কৃষ্ণজীবনীর এ অধ্যায়টিও বহুকাল সবার অজানা ছিল এই-ই মনে হয়। হয়তো গোকুলে থাকাকালেই গুরু-শিষ্যে দেখা এবং ঘোর আঙ্গিরসের কাছেই শ্রীকৃষ্ণ প্রথম জেনেছিলেন—তিনি নন্দসুত নন, তিনি বসুদেব-নন্দন। জাবাল সত্যকামের মতই মায়ের নামে নিজেকে পরিচিত করলেন শ্রীকৃষ্ণ। প্রবাদ আছে, যশোদারও নামান্তর ছিল দেবকী এবং এই নামের মিলের জন্য বসুদেব-পত্নীর সঙ্গে সখিত্ব ছিল তাঁর। এক নামে দুই মাকেই অবিনশ্বর করে রাখতে চেয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, এও হতে পারে। অথবা বৈদিক সমাজের রীতি অনুযায়ী পিতৃ-গোত্র না নিয়ে অনার্যের মত মার নামে পরিচয় দেওয়ার মধ্যেও বৈপ্লবিক চিন্তাধারারই সঙ্কেত ছিল। সত্যকামের না হয় পিতৃপরিচয় বলে কিছু ছিল না, শ্রীকৃষ্ণের তো তা নয়। ঘোর আঙ্গিরস শিষ্যের বিদ্রোহী মনোভাবকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন বলেই তিনি শ্রীকৃষ্ণের বেদাচার্য।

রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' মনে পড়ে—"আনন্দময়ীর দিকে চাহিয়া আগ্নেয়গিরির অগ্নি-উচ্ছ্বাসের মত গোরার মুখ দিয়া একটি কথা বাহির হইল, 'মা, তুমি কি আমার মা নও? অশ্রুহীন রোদনের কণ্ঠে আনন্দময়ীর উত্তর আসিল, 'বাবা আমার, তুই যে আমার পুত্রহীনার পুত্র, গর্ভের ছেলের চেয়েও অনেক বেশি বাবা।' গোরার মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল 'মা,'। আনন্দময়ীর বদলে যদি যশোমতী বসাই? গোরার বদলে গোপাল? শ্রীকৃষ্ণ যেদিন জানলেন—যাদের বুকে তিনি মানুষ হয়েছেন, লোকবিচারে সত্যই তারা তাঁর কেউ নয়, সেদিন সংস্কারের অবশেষটুকুও খসে গেল চিত্ত হতে। জন্মস্বত্বে উদার বুদ্ধি নিয়ে এসেছিলেন তিনি, কিন্তু 'পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে'—এও তো মিছে নয়। তাঁর জীবন হতে সে ঘোর কাটাবার ভার মহামায়া নিজেই নিয়েছিলেন। আত্মপরিচয় জানামাত্র সব রঙ ছুটে গেল যেন—সেদিন থেকে শ্রীকৃষ্ণ হয় দীনবন্ধু, পতিতপাবন, অথবা তাঁর 'বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম'। তা নইলে যদুবংশ ধ্বংস করা কি সম্ভব ছিল?

ঊনত্রিশ

এখন মথুরা সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। বৈদিক সাহিত্যে মথুরার নাম নাই। মহাভারতে অবশ্যই নাম আছে—কিন্তু যে মহাভারতে রোমক মুদ্রা দীনার এবং শক হূন ও চীন রোমের নাম আছে, যে মহাভারতে যবনাধীশ দত্তামিত্র সিন্ধুসৌবীরে রাজত্ব করেছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে তার কোন কোন অংশ যে খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর পর সংযোজিত এতে সন্দেহ নাই।* সুতরাং মহাভারতে মথুরার উল্লেখ থাকলেও তা পরবর্তী সংযোজন বলে সন্দেহ করা যেতে পারে। অবশ্য মেগাস্থিনিসের সাক্ষ্যে নিশ্চয় জানা গেছে যে খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকেই মথুরা বিখ্যাত নগরী। কিন্তু তার আগে? বৌদ্ধ গ্রন্থে শূরসেনকেই ষোড়শ মহাজনপদের অন্যতম ধরা হয়েছে, আর ঘটজাতকে মথুরারই নাম উত্তর-মধুরা। কারণ বাসুদেব কৃষ্ণের সঙ্গে ওই নগরীর সম্পর্কের কথা স্পষ্টই উল্লেখ করা হয়েছে। দক্ষিণের মাদুরা নগরীই ছিল দক্ষিণ-মধুরা। যাই হ'ক বৌদ্ধ যুগে মথুরার নাম যদি 'মধুরা' হয়, প্রাচীনকালে নগরটির 'মধুপুরী' নাম থাকাই সম্ভব। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে (৬০—৭০ সর্গ) এই মর্মে প্রসিদ্ধি আছে যে, যমুনাতীরবাসী মহর্ষিদের অনুরোধে রামচন্দ্র মধু দৈত্যের পুত্র লবণাসুরকে বধ করবার জন্য শত্রুঘ্নকে পাঠান। মধু দৈত্য রাবণের আত্মীয়—মধুপুরীর স্রষ্টা সেই-ই। লবণকে হত্যা করে শত্রুঘ্ন শূরসেন প্রদেশে বার বৎসরের চেষ্টায় নবনির্মিত মধুপুরীকে রাজধানীর যোগ্য করে তুললেন। তখন সম্ভবতঃ ওটির নাম হল শূরসেনা। বৃন্দাবনের প্রাচীন নাম যদি কালিকাবর্ত হয়, মথুরার আদি নাম শূরসেনা হওয়া বিচিত্র কি? তারও আগে মথুরা বৃন্দাবনাদি যমুনা-তীরবর্তী ওই অঞ্চলটি সম্ভবতঃ অরণ্যভূমি ছিল। ধ্রুবোপাখ্যান যদি সত্যই প্রাচীন কথা হয়, তবে সেইখানেই প্রথম যমুনাতটবর্তী মধুবনের উল্লেখ আছে—

যবনাশ্চীনকম্বোজা দারুণা ম্লেচ্ছজাতয়ঃ।

সকৃদ্‌গ্রহা কুলোত্থাশ্চ হূণাঃ পারসিকৈঃ সহ॥ ৬।৯।৫৫-৬৬

যবন দত্তামিত্র = Demetrics the Greek ? খৃঃ পূঃ ২০০। রায়চৌধুরীর Studies in Indian Antiquities পৃঃ ১৭৮—১৭৯ দ্রষ্টব্য।

ত্রিশ

"তৎ তাত! গচ্ছ ভদ্রং তে যমুনায়স্তটং শুচি।
পুণ্যং মধুবনং যত্র সান্নিধ্যং নিত্যদা হরে॥"—ভাগবত ৪।৮।৪২।।*

ধ্রুবকে নারদ যে পরমগুহ্য জপ্য মন্ত্রটি বললেন সেটি 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।' হতে পারে, যমুনাতীরবর্তী অরণ্যভূভাগই এককালে পঞ্চরাত্র ভাগবতদের আদি তপোভূমি ছিল। তারপর সেখানে শৈবদের আধিপত্য দেখা দেয়। জলন্ধর শঙ্খচূর অসুর এবং বৃন্দার কাহিনী আর মধু দৈত্যের ঘটনায় তারই ইঙ্গিত মেলে। জলন্ধর শিবেরই অংশ ছিল, মধু শিবোপাসনার ফলে রৌদ্রী শূল লাভ করে। প্রথমজনকে স্বয়ং বিষ্ণু কৌশলে হত্যা করান, দ্বিতীয়জনকে তাঁরই অংশাবতার শত্রুঘ্ন। অর্থাৎ পাশুপাতদের হটিয়ে আবারও ভাগবতরাই ওই অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করলেন। তাবলে পাশুপাতরা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেন না—ভাগবতদের পাশাপাশি তাঁরাও রইলেন। ফলে এই অঞ্চলটি ব্রাত্যদের নিবাসভূমি হয়ে গেল। ওইখানেই গণ-ধর্মের নেতা যদু রাজন্যদের ছোট ছোট উপনিবেশ ও গোচারণভূমি গড়ে ওঠে। সুপ্রাচীন জনপদ মধুপুরীকে যদুরা নিজেদের মধুশাখার † কীর্তি বলেই দাবী করতেন সম্ভবতঃ। যদুদের হাতেই জনপদ মধুপুরী মহাজনপদে পরিণত হয়। তাছাড়া রামায়ণেও মথুরা অঞ্চলকে শূরসেন বলা হচ্ছে যখন, তখন মধু ও লবণাসুরের আগেই ওখানে যাদবগোষ্ঠীর আবাস ছিল, এ-ও হতে পারে। তারা আগে শৈব ছিল (মধু দৈত্যই যাদব মধু নয় তো? আদি যাদবদেরও শৈব হওয়া অসম্ভব নয়), পরে ভাগবতের আওতায় চলে যায়। শৈব বৈষ্ণব ও শাক্ত এই তিনটি গণধর্মকেই যাদবরা উদারবুদ্ধিতে প্রশ্রয় দিয়েছে—ইতিহাসপুরাণ ঘাঁটলেই তার প্রমাণ মেলে। ভারতধর্মের ইতিহাসে যে সাতটি নগরী মোক্ষদায়িকা, মথুরা তারই একটি।

"অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥"

---

* বিষ্ণুপুরাণেও রামায়ণ ও ভাগবতের উক্তি সমর্থিত হয়েছে।

† বৃষ্ণিবংশের জনক মধু কার্তবীর্যার্জুনের পঞ্চম পুরুষ—বিষ্ণুপুরাণ ৪।১১।১-৭

একত্রিশ

বৈদিক আর্যদের অভিজাতগোষ্ঠী বারবার প্রবল আক্রমণে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় যদুদের মথুরা হতে উৎখাত করতে চেয়েছে। সাময়িক ভাবে যাদবদের সরে যেতেও হয়েছে বহুবার—কিন্তু মধুপুরীর সঙ্গে একেবারে সংযোগ ছিন্ন হয়নি। সুযোগ পাওয়া মাত্র আবার যাদবগোষ্ঠী তাদের চিরপুরাতন প্রিয় নিকেতনে ফিরে এসেছে। এমনি দেশান্তরী হওয়ার ফলে যাদবদের নূতন নূতন উপনিবেশ নব নব নগরী পত্তন হয়েছে মাত্র—প্রতিপত্তি বেড়েছে বৈ কমেনি। দক্ষিণের মাহিষ্মতী কুণ্ডিন বিদর্ভ এইরকম প্রবাসকালেই সৃষ্টি হয়েছে। সর্বশেষ সৃষ্টি আনর্তমণ্ডলে দ্বারাবতী—তার পূর্বনাম ছিল কুশস্থলী। পৌরব জরাসন্ধের অত্যাচারে দুর্ভেদ্য গিরিদুর্গ রৈবতকের আড়ালে বৃষ্ণি অন্ধক বংশ মহাসমৃদ্ধ দ্বারাবতী নগরীর পত্তন করে। তাবলে মথুরা যাদবশূন্য হয়নি···রাজপ্রধানেরা কিছুকালের মত দূরে সরে গিয়ে সাধারণ নাগরিকদের ধনপ্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। জরাসন্ধের রোষ দ্বাবাবতীর উপরেই পড়ল। মথুরাবাসী নিরাপদ হল! শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মথুরামণ্ডলের সার্থক সংজ্ঞা—

মথ্যতে তু জগৎ সর্ব্বং ব্রহ্ম-জ্ঞানেন যেন বা।
তৎসারভূতং যদ্যস্যাং মথুরা যা নিগদ্যতে ॥—গোঃ তাঃ উঃ ভাঃ

গোকুলাখ্য মহদ্বন মথুরামণ্ডলেরই একাংশ—যমুনার এপারে শূরসেন, রাজধানী মথুরা, ওপারে যাদব কুলের ঘোষপল্লী বা ব্রজ। মহাবন যেন সেকালের সংরক্ষিত বনভূমি···গোপালন-কেন্দ্র। গঙ্গা-যমুনার অন্তর্বেদী তখন গভীর অরণ্যবিশেষ। মহাবনের পরই খাণ্ডবপ্রস্থের গহন বন···কুরুজাঙ্গল তারই সম্প্রসারণ না কি? খাণ্ডবপ্রস্থ ও মহাবন সেকালের প্রাগৈতিহাসিক অরণ্যানী··· ইতিহাসপুরাণে একটা রহস্যবিশেষ। ভূ-প্রকৃতি অনেক বদলে গেছে এখন—ভাগবতের বর্ণনানুযায়ী পাহাড়ী ঝরণা (গ্রীষ্মেও নির্ঝরানহ্রাদ—১০।১৮।৪) বা গুহা। (আসন্নাঃ গুহাঃ ১০।২০।২৭) বৃন্দাবনে আছে কি?

এবার এ প্রসঙ্গের ইতি করা যাক। 'কথামুখ' পড়ে কেউ মন্তব্য করতে পারেন এত ভণিতা নিরর্থক; লেখিকা নিজে বিশ্বাস করেন—শ্রীকৃষ্ণ ঐতিহাসিক পুরুষ, এটুকু বললেই যথেষ্ট হত—কারণ যুক্তি ও তথ্য সহায়ে ওটি প্রমাণ

করবার সাধ্য তার নাই। সবিনয়ে স্বীকার করব, এ অভিযোগ সত্য। বিজ্ঞানসম্মত কোনও প্রমাণ আমাদের হাতে নাই। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, পূর্ণব্রহ্ম অবতার ঐতিহাসিক পুরুষ—এইটিই 'মাথুরে'র মূল সুর। দ্বাপরের শেষ সন্ধ্যায় বৈদিক ভারত যখন অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের শিখরে উঠেছিল, বেদবিহিত সমাজশাসনে এদেশের ঘরে ঘরে যখন যোগী জ্ঞানী ও কর্মী সন্তানের জন্ম হয়েছে, সেই স্বর্ণযুগে পরমপুরুষের পূর্ণতম প্রকাশ ঘটেছিল ভারতবর্ষে। ব্রহ্মবিদ্যা অনুশীলনের ফলে 'স্বয়ং ভগবান'কে ভারতবাসী নিজেদের মাঝখানে পেয়েছিল। অন্য সমস্ত অবতারই অংশ বা কলা কিন্তু 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্—ব্যাসের ঘোষণা সেদিনও সবাই ধারণা করতে পারেনি। তবু দ্বৈপায়ন চুপ করে থাকতে পারেননি। অসম্ভব যে সম্ভব হয়েছে, তাঁর পারমহংস-সংহিতায় ওই কথাটিই ছন্দোবদ্ধ বাণীতে ধরে রাখার ব্যাকুল চেষ্টা। যুগে যুগে অবতার তিনি, তবু বলব—'স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন'। এমনটি ঠিক যেন আর হয়নি কোনকালে—ভাগবতের আগাগোড়া এধরনের একটি পুলকিত বিস্ময়ের সুর। মহামহেশ্বর এসেছিলেন মানুষ হয়ে···প্রাকৃতের মাঝে অপ্রাকৃতের দিব্য-বিভাব উপচিয়ে উঠেছিল। ঋষি দেখলেন 'এ দেহে সে দেহে একই রূপ' অত্যুজ্জ্বল প্রকাশ। তাই বার বার বলেছেন—'বড় বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে।'

> ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্ব্বং নাপি চাপরম্।
>
> পূর্ব্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চ যঃ ॥ ১০।৯।১৩
>
> তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্।
>
> গোপীকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা ॥ ঐ।১৪

ব্যাসদেবের বিস্ময়জড়িত স্বগতোক্তিগুলি এত অকৃত্রিম যে কিছুতেই মনে হয় না—ওর পিছনে যথার্থই কোন আবির্ভাব ছিল না, এত কথা কেবল শূন্যের বুকে ভাবের ফুলঝুরি। অতএব—শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্ত্য দেবতা, এই বিশ্বাসটি নিয়েই কথা শুরু করা গেল।

———

মাথুর

কথা

"ঈশ্বর নরলীলা করেন। মানুষে তিনি অবতীর্ণ হন, যেমন শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র চৈতন্যদেব।" --শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৫ম ভাগ, পৃঃ ১১০

শ্রীমদ্ভাগবতের ৩য় স্কন্ধ ২য় অধ্যায়ে একটি শ্লোক আছে, উদ্ধব বলছেন—

"ততো নন্দব্রজমিত পিত্রা কংসাদ্বি বিভ্যতা।
একাদশসমাস্তত্র গূঢ়ার্চ্চিঃ সবলোঽবসৎ॥"

কংসভয়ে ভীত পিতা নন্দ (শ্রীকৃষ্ণকে) ব্রজে নিয়ে যান। শ্রীকৃষ্ণ নিজ মহিমা গোপন করে (গূঢ়ার্চ্চিঃ) এগার বৎসর বলরামের সঙ্গে সেখানে ছিলেন। এই শ্লোকটিকে ভিত্তি করে বলা হয়—বার বছরে পা দিয়েই শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলে যান। তিনি মাত্র এগার বছরের মধ্যেই ব্রজলীলা শেষ করেছিলেন। শ্লোকটির সরলার্থ যদি এই-ই হয়, তবু বলব, ভাগবতকার কিন্তু অন্যত্র এ-ধারণার স্বপক্ষে কথা বলেননি। বরং রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে এমন অনেক কথাই বলেছেন যা ঠিক এগার বছর ছেলেকে মানায় না। শ্রীকৃষ্ণ সাত বছর বয়সে গোবর্ধন ধারণ করেছিলেন এটা স্পষ্ট উল্লেখ করলেও ব্রতচারিণী গোপীকাদের লাঞ্ছনা বা রাসোৎসব শ্রীকৃষ্ণ সেই বয়সেই করেছিলেন কিনা তা ভাগবতকার বলে দেননি। অধ্যায়ের পারম্পর্য দেখিয়ে অনেকে বলতে পারেন—গোবর্ধনধারণের অব্যাহিত পরেই রাসপঞ্চাধ্যায়ের শুরু। কাজেই শ্রীকৃষ্ণের বছর সাত-আটের মধ্যেই ওসব ঘটনা ঘটে গেছে। আমরা তাঁদের খেয়াল করিয়ে দিতে চাই যে ঘটনার পারম্পর্য রেখে ভাগবতের অধ্যায় গুলি সাজানো হয়নি। হয়ত আদি কথক পর পর সব কিছু বলেছিলেন, কিন্তু পরে যাঁরা ভাগবতকথা সংগ্রহ ও সঙ্কলন করেছিলেন

তাঁরা ঘটনা পরম্পরা বজায় রেখে অধ্যায় বিভাগ করেননি। যেমন, রাসোৎসবের শুরুতে গোপীরা শ্রীভগবানকে বলেছেন 'হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি আমাদের বিষজল ব্যাল রাক্ষস বর্ষামারুত বৃষাসুর ও ময়াত্মজের অত্যাচার হতে রক্ষা করেছ' ইত্যাদি (১০।৩১।৩)। অথচ রাসপঞ্চাধ্যায়ের পরে ৩৪ অধ্যায়ে বিদ্যাধর-মোচন ও শঙ্খচূড়-বধ, ৩৫ অধ্যায়ে গোপীকাযুগলগীত -৩৬ অধ্যায়ে এল বৃষাসুর-বধের কাহিনী, তারপর ৩৭ অধ্যায়ের শেষে রয়েছে ব্যোমাসুর বা ময়াত্মজ নিধন প্রসঙ্গ। কাজেই অধ্যায়পরম্পরা দেখিয়ে শ্রীকৃষ্ণজীবনীর ঘটনা-পারম্পর্য নির্ণয় করা ঠিক হয় কি?

আরও কথা আছে। রাসোৎসবকালে শ্রীকৃষ্ণ যদি সাত বৎসরের বালকই ছিলেন, তবে পরীক্ষিতের মনে কেন প্রশ্ন জাগল যে কাজটা বাসুদেবের উচিত হয়েছিল কি? অভিমন্যুতনয় হিসাবে তিনি তো শ্রীকৃষ্ণের নিকট আত্মীয়। আর যে-ই দোষ ধরুক, সাত বৎসরের বালক যদি গোপিকাদের সঙ্গে ক্রীড়াকৌতুক (!) করে থাকে, তাতে পরীক্ষিৎ দোষ ধরবেন কেন? আর শুকদেবই বা বয়সটার কথা উল্লেখ না করে—

"ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা॥"

—বলে রুদ্রের কালকূট গ্রাসের উপমা দিলেন কি ভাবে? অধুনা যে আকারে ভাগবত পাওয়া যায়, তার মধ্যে প্রচুর পরবর্তী সংযোজন রয়েছে, পণ্ডিতমাত্রেই তা জানেন। সুতরাং রাসোৎসবের কথা দূরে থাক, গোবর্ধন-ধারণকালে শ্রীকৃষ্ণের বয়স মাত্র সাত বছর আদি কৃষ্ণকথায় এমন সংবাদ ছিল কিনা তাতেও আমাদের সন্দেহ হয়। কারণ ইন্দ্রযজ্ঞ বন্ধ করার সময় শ্রীকৃষ্ণ জননায়কের ভূমিকা নিয়েছিলেন। অসুরবধাদি ব্যাপারগুলি দেবাবিষ্ট অবস্থায় যে-কোন বয়সে ঘটা সম্ভব। কিন্তু ইন্দ্রযজ্ঞকালে প্রবীণ নন্দরাজের পাশে নন্দকুমার যুবরাজের ভূমিকা নিয়ে গোপবৃদ্ধদের সঙ্গে বিতর্কে অবতীর্ণ হয়েছেন। মুখে তাঁকে সাতবছরের বালক বলেও ভাগবত কাজে তাঁকে কিশোর-বীর প্রতিপন্ন করেছেন। আমরা কীর্তির ব্যঞ্জনাটাই এক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্য মনে করি, বয়সের

হিসাবটা অবান্তর। এতে আশ্চর্যের কিছুই নাই যে অলৌকিকত্ব খ্যাপনের জন্য অর্বাচীন কথকথুরন্ধররা তাঁর বয়স কমিয়েছে। রাসলীলাকালে শ্রীকৃষ্ণ নিতান্ত বালক পরোক্ষে এটি প্রতিপন্ন করার জন্যই দু'-একটা শ্লোকে গোবর্ধনধারীকে 'সপ্তহায়নো বালঃ' সাজানো হয়েছে পরবর্তী কালে। মহামানবের জীবনী নিয়ে তথাকথিত ভক্তদের রঙ ফলানোর বাতিক চিরদিনই আছে। কবিরাই শুধু নিরঙ্কুশ নন, ভক্তবৃন্দ ততোঽধিক নিরঙ্কুশ। কাজেই সাতবৎসরের সিদ্ধান্তটা বাদ দেওয়াই ভাল।

'একাদশসমাস্তত্র' উদ্ধবের এই উক্তিটির অন্য একটা অর্থও হতে পারে। ব্রজে মোট এগার বছর ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, এর তাৎপর্য এরকম না হয়ে এ-ও তো হতে পারে যে ব্রজে এগার বছর পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন 'গূঢ়ার্চিঃ' অর্থাৎ অবিদিতমহিমা। ব্রজবাসীরা এগার বছর পর্যন্ত তাঁকে দেবতা বলে চিনতে পারেনি। রাম ও কৃষ্ণ যে অবতারপুরুষ এটা ধরতে তাদের ওই এগার বছর সময় লেগেছিল। লক্ষ্য করার বিষয়, এগার বৎসর গূঢ়ভাবে ব্রজে ছিলেন বলেই উদ্ধব কিন্তু মধুপুরির কথা তোলেন নি। ওই শ্লোকটির পরের শ্লোকই হল—

'পরীতো বৎস-পৈর্ব্বৎসাংশ্চারয়ন্ ব্যহরদ্বিভুঃ'।

—ইত্যাদি কৌমারলীলার বর্ণনা। এগার বৎসর পর্যন্ত যা-কিছু কৃষ্ণ করেছেন সে সবই তাঁর বাল্যজীবনের ঘটনা এবং ব্রজবাসীরাও সেসব ব্যাপার দেবাবেশ হিসাবেই নিয়েছে। একাদশ বৎসরে অর্থাৎ কৈশোরে পা দিয়েই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপস্ফূর্তি হল।* গোবর্ধন-ধারণের ব্যাপারে ব্রজশুদ্ধ সকলের প্রথম

---

* শ্রীকৃষ্ণের এগার বছরেই মথুরা চলে যাওয়াটা গোস্বামীপ্রবর সনাতনও স্বীকার করতে পারেননি। বৃহদ্ভাগবতামৃতের ভগবদনুগ্রহভর-পাত্রনির্বার খণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায়ের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রীঅনির্বাণ এ সম্পর্কে বলছেন—'পুরুষ ষোড়শকল, পাঁচ কলার তিনটি

[পঃ পৃঃ দ্রষ্টব্য]

চমক লাগে। তারা তখন দল বেঁধে ব্রজরাজ নন্দকে এসে বলে—'তোমার এ ছেলেটি কে বল দেখি?' নন্দ সেই প্রথম সাধারণ্যে গর্গাচার্যের বিখ্যাত ভবিষ্যদ্বাণীটি প্রকাশ করলেন—

"বর্ণাস্ত্রয়ঃ কিলন্যাসন্ গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।"

ইনি যুগে যুগে অবতার—

"ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥"

গূঢ়ভাবে ব্রজে ছিলেন এর অর্থ যে কেবল কংসভয়ে লুকিয়ে থাকা, তা নয়। পরমপুরুষ নিজেকে গোপন করে রেখেছিলেন, এ অর্থই বা না হবে কেন?

গোবর্ধন-ধারণের পর সেই লুকোচুরির আড়ালটা খসে গেল। ব্রজবাসী আবালবৃদ্ধ-বনিতা জানল ননী-গোপাল হয়ে কে এসেছে তাদের মাঝখানে। তার ফলেই মহারাস সম্ভব হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণে ঈশ্বরবুদ্ধি না থাকলে কি আর

"নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ॥"

(১০।৩০।৮)

সম্ভব হয়?

পর্ব, তারপর একটি অতিপর্ব। ষোলর অর্ধেক আট; আট পার হলেই আর পুনরাবৃত্তি হয় না। দশে বিজয়। তারপর থেকে দিব্যলীলার শুরু। অন্তরিক্ষলীলা দশেই শেষ। এগার—ষোল পর্যন্ত দিব্য কৈশোর, গোপীরা সৌম্য পুরুষকে এই সময় পেয়েছিল। সাধনরাজ্যের কল্পনাকে আমার মনে হয় ইতিহাসের সঙ্গে এখানে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভাগবতকারের কৃষ্ণ যেমন ঐতিহাসিক তেমনি আধ্যাত্মিক-ও; যেমন চৈতন্য মহাপ্রভু, রাম ইত্যাদি। এটা এদেশের দস্তুর।'

সুতরাং ঐতিহাসিক পুরুষকে আধ্যাত্মিক করবার তাগিদে ভাগবত-প্রচারকেরা শ্রীকৃষ্ণের বয়ঃক্রম প্রয়োজনমত বাড়িয়েছেন বা কমিয়েছেন। এভাবে বিচার করলে সাতবছরে গোবর্ধন-ধারণের কথাটাও সমর্থনযোগ্য।

তাঁকে দেবতা বলে বিশ্বাস হয়েছিল বলেই কৃষ্ণ-সেবাপরা গোপিকাদের দেখে ব্রজবাসী গোপদের মনে ঈর্ষা জাগত না। মনে হত, ভগবদারাধনা করে ওরা স্বামী-পুত্রের মঙ্গলই করছে। আমাদের কাছে থাকাও যা শ্রীকৃষ্ণের কাছে থাকাও তো তাই। এই হিসেবে গোবর্ধন-ধারণ ও ইন্দ্রযজ্ঞ-ভঙ্গ মহারাসের প্রস্তুতি। সেজন্য যে এগার বছরের মধ্যেই ব্রজের খেলা শেষ ক'রে দিতে হবে এমন কোন কথা নাই। আমরা ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে দেখছি শ্রীকৃষ্ণকে, এটা মনে রাখা ভাল। কাজেই আমরা বলব, এগার বৎসরের পরই বৃন্দাবন-লীলার কৈশোরপর্ব শুরু।*

মোটকথা, শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় এলেন তখন তিনি অতিক্রান্ত-কৈশোর নবযুবা। তাঁকে দেখে মধুনাগরীরা বলাবলি করছেন—

"ক্ক যৌবনোন্মুখীভূতঃ সুকুমারতনুর্হরিঃ।
ক্ক বজ্রকঠিনাভোগিশরীরোঽয়ং মহাসুরঃ॥
ইমৌ সুললিতৌ রঙ্গে বর্তেতে নবযৌবনৌ।
দৈতেয়মল্লাশ্চানূরপ্রমুখাস্তর্তিদারুণাঃ॥"

কোথায় বজ্রসারদেহ মহাসুর চানূর আর কোথায় যৌবনোন্মুখ তরুণ শ্রীকৃষ্ণ! রাম-কৃষ্ণ উভয়েই সুকুমার ললিতকান্তি নবযুবা, চানূরাদি মল্লরা দারুণবীর্য—এ কি অসম যুদ্ধ? (বিষ্ণুপুরাণ ৫।২০।৪৮-৪৯)।

ভাগবতেও আছে, শ্রীকৃষ্ণ যখন চানূরের সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধে অসম্মতি জানিয়ে

---

* ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর গ্রন্থকারকে আমাদের মতাবলম্বী বলা যেতে পারে। তিনি শ্রীকৃষ্ণের কৈশোরকাল আদি মধ্য ও শেষ ভেদে তিনভাগে ভাগ করেছেন। আদিকৈশোরে বর্ণের ঔজ্জ্বল্য, নেত্রান্তে অরুণিমা ও লোমাবলী প্রকাশ ইত্যাদি তারুণ্যলক্ষণ দেখা দেয়। শেষকালে অন্ত্যকৈশোর বর্ণনা করতে গিয়ে গ্রন্থকার বলছেন—"ইদমেব হরেঃ প্রাজ্ঞৈর্নবযৌবনমুচ্যতে"। ব্রজলীলার চরম স্ফূর্তি এই কালে, অতএব নবযৌবনের প্রথম পর্বে শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-যাত্রা।

বললেন, আমরা বালক—তুল্যবলশালীর সঙ্গে যুদ্ধ করব, তোমার সঙ্গে কেন? তখন চানুর উত্তর দিল—

"ন বালো ন কিশোরস্ত্বং বলশ্চ বলিনাং বরঃ।"

তুমি বা রাম কেউ-ই বালক কিংবা কিশোর নও, বলীশ্রেষ্ঠ তোমরা (১০।৪৩।৩৯)।

বৃন্দাবনের অন্তর্লীলা চিরদিন কৈশোরলীলা বলেই প্রসিদ্ধ, বালক বয়সেও ওর পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে না। কৈশোরের দিব্যলীলার পর প্রত্যেক মহামানবের জীবনেই আসে মাথুর। সুখনীড় পিছনে ফেলে বিশ্বহিতে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয় তখন। মাথুর সার্থক তারুণ্যের দীপ্ত মহিমা, ধাতুপ্রসাদ।

সঙ্ঘশাসিত যদুগোষ্ঠীতে কংস স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। রাজতন্ত্রের অগ্রদূত-ই হল একনায়ক প্রথা (Dictatorship)। সাম্রাজ্যলিপ্সু পৌরব জরাসন্ধ ছিলেন মগধের রাজা; তাঁর সঙ্গে কংসের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় স্পষ্ট বোঝা গেল—যাদব ঐতিহ্য নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। কংস চাইছে কুরু-পাঞ্চাল সভাতার দোসর হয়ে অভিজাত সমাজে প্রবেশ করতে—যদুকুলের সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ নাই। যাদবসঙ্ঘ নিঃশব্দে গণ-অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। যোগ্যতার বিচারে যাঁর যথার্থই সংঘমুখ্য হওয়ার অধিকার ছিল সেই আনকদুন্দুভি বসুদেবের কারাবাস পুত্রহত্যা ইত্যাদির ফলে স্বভাবতই যদুকুলের প্রধানদের সহানুভূতি ছিল তাঁর দিকে। গোকুলের তরুণ মল্ল রাম ও কৃষ্ণ বসুদেবেরই ছেলে, নন্দগোপ তাঁদের পালক পিতা মাত্র—গোপনে এ সংবাদ জেনে যদুসংঘ তাঁদের দুই ভাইকে ভাবী বিদ্রোহের নেতা মনোনয়ন করল।

গোকুলে ইন্দ্রযজ্ঞ বন্ধ করে দিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। * বিপ্লবী জননায়ক

---

* এখানে পূর্বোল্লিখিত একটা সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। মাথুরের 'কথামুখে' এক জায়গায় বলেছি ঋগ্বেদের কৃষ্ণাঙ্গিরস ঋষিই বাসুদেব [পঃ পৃঃ দ্রষ্টব্য]

রূপে ওই তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ। বেদশাসিত সমাজে ইন্দ্রই ছিলেন দেবরাজ। সমগ্র ভারত তাঁর নৈষ্ঠিক পূজারী। পশুপতি নৃসিংহ লক্ষ্মীজনার্দন কি কাত্যায়নীর পূজা করলেও ইতরসাধারণ দেবরাজকে ভয় করে, মানেগণে। বজ্রধর বাসবকে পূজা দেব না, সে কি? কি সর্বনাশ!

"মেঘানাং পয়সাং চেশো দেবরাজ শতক্রতুঃ।"

কৃষ্ণ। ছান্দোগ্য উপনিষদে তাঁকেই ঘোর আঙ্গিরসের শিষ্য বলে উল্লেখ করেছেন। এখন কথা এই যে সংহিতায় কৃষ্ণাঙ্গিরসের যে ৬টি সূক্ত আছে তার অর্ধেকটি ইন্দ্রদেবের উদ্দেশ্যে। যিনি গোকুলে ইন্দ্রযজ্ঞ বন্ধ করে দিয়েছিলেন তিনি-ই সংহিতায় ইন্দ্রসূক্ত রচনা করেছেন, এ কিরকম পরস্পরবিরোধী ঘটনা?

শ্রীঅনির্বাণ এ সম্পর্কে আলোকপাত করে লিখেছেন ঃ—প্রত্যেক দেবতারই একটা লৌকিক সংস্করণ থাকে। যেমন ধরা যাক, মানতখেকো কালী, আর শ্রীরামকৃষ্ণের কালী নিশ্চয়ই এক নয়। ইন্দ্র নিঃসন্দেহে বৈদিক আর্যদের পরমদেবতা কিন্তু তাঁর স্থূলভ সংস্করণও ছিল—ইন্দ্রপূজাতে শক্রধ্বজোপস্থাপনে যার পরিচয় পাই। রাঁচিতে কোলদের মাঝে এক সময় ইন্দ্রপূজা প্রচলিত ছিল শস্যদেবতা হিসাবে। তার কিছু স্মৃতি এখনও বেঁচে আছে। রাঁচির একটা পাড়ার নাম 'হিন্দু পীড়ি'—ইন্দ্রপীঠ; তার কাছেই আজও ইন্দ্রপূজার একটা অনুষ্ঠান হয়। ব্রাহ্মণেরা করে না, করে আদিবাসীরা। শ্রীকৃষ্ণ এই ধরণের পূজার বিরুদ্ধেই দাঁড়িয়েছিলেন। ভোগৈশ্বর্যগতিকে লক্ষ্য করে ক্রিয়াবিশেষবাহুল্যযুক্ত যে বেদবাদের গোঁড়ামি ('নান্যদস্তি' ইতি বাদ) তাকে তিনি পরবর্তীকালে গীতাতেও চাবকেছেন। কিন্তু তা বলে তিনি বৈদিক দেবতাদের বিরোধী ছিলেন এ বলা যায় না। গুরুগৃহে থাকাকালীন ইন্দ্র ও অশ্বিসূক্তগুলি তিনি রচনা করেছিলেন বলে আমার বিশ্বাস। রচনায় সরল কবিত্ব আছে। শ্রীকৃষ্ণ জাত-শিল্পী—নৃত্য গীত বাদ্য কবিত্ব সবই তাঁর আসত। তখন তাঁর চারদিকে

[পঃ পৃঃ দ্রষ্টব্য]

তিনি বর্ষা করান বলেই তৃণশস্যের পুষ্টি হয়। গো-গোপাদি সকলেই তাঁর দয়ায় জীবন ধারণ করছে যে! শরৎকালে ইন্দ্রযজ্ঞ হত। পিতৃপক্ষে একটি তিথি আছে জিতাষ্টমী—পাঁজীতে লেখা ওইদিন জীমূতবাহন পূজা। প্রাচীন-কালে ওইটিই ইন্দ্রযজ্ঞের তিথি ছিল কিনা জানি না। শ্রীকৃষ্ণ সেই মহাধুমধামের (মহারুম্ভ) উৎসব বন্ধ করে দিতে চাইলেন। একদিকে প্রবল জনমত, অন্যদিকে অমিতবিক্রমে তিনি একা লড়তে লাগলেন চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধে। গোপকুলের মুখপাত্র হয়ে পিতা নন্দ যেসব আপত্তি তুললেন সমস্তই খণ্ডন করলেন শ্রীকৃষ্ণ। ভাগবতকার আঠারটি শ্লোকে সেই ভাষণের সারাংশ ধরে রেখেছেন। ব্রজে থাকতে কোন ব্যাপারেই এত দীর্ঘ ভাষণ দেননি শ্রীকৃষ্ণ। তাতেই ঘটনার গুরুত্ব বোঝা যায়। হাজার হাজার বছর আগে দেবানুগ্রহে কৃতকাম হবে এই মনোভাবের বিরুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ সেদিন যা বলেছিলেন আজকের কোনও অতিপ্রগতিপন্থী চিন্তা-নায়কের মুখে সে কথা বেমানান হবে না। 'স্বভাববশে মানুষ কর্ম করে—কর্মকেই সে পূজা করুক। যে যার সাহায্যে জীবনরক্ষা করে সেই-ই তার দেবতা। অন্য দেবতার কি দরকার?'

"তস্মাৎ সম্পূজয়েৎ কর্ম্ম স্বভাবস্থঃ স্বকর্ম্মকৃৎ।
অঞ্জসা যেন বর্তেত তদেবাস্য হি দৈবতম্॥

বেদসূক্ত রচনার ঢেউ উঠেছে, তিনিও যে তাতে যোগ দেননি তা কি করে বলি। গীতায় তিনি দার্শনিক। কবি ছিলেন তার আগে প্রথম যৌবনে। ঋক্‌সংহিতায় তারই নিদর্শন রয়ে গেছে।

বেদের সমালোচনা করেও 'আমিই বেদান্তকৃদ্' বলতে যাঁর আটকায়নি ইন্দ্রযজ্ঞ বন্ধ করেও ইন্দ্রসূক্ত রচনা তাঁর পক্ষে আশ্চর্য নয়। গীতায় তিনি কি বেদবাদীদের কটাক্ষ করে বলেননি 'ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা' বা 'যাবানর্থ উদ্‌পানে (২।৪৬) ইত্যাদি? অথচ তিনিই আবার ঘোষণা করছেন 'বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্।' সুতরাং স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতিটা এক্ষেত্রে ভাব নিয়ে। বৃত্রঘাতী দেবরাজ ইন্দ্রকে বাসুদেব মানতেন, মানেননি ওই আদর্শটির লোকায়ত বিকারগুলিকে।

আমরা বৈশ্য। কৃষি বাণিজ্য গোপালন ও কুসীদ—এই চারটি বৈশ্যের বৃত্তি। আমরা গোপালনবৃত্তি গ্রহণ করেছি—গোপূজা করব। যে গোবর্ধন শৈল তৃণ-শষ্প ফলমূল ও ঝরণার জল দিচ্ছে—সে-ও প্রত্যক্ষ দেবতা। তার পূজা-ই বা করব না কেন? সেই সঙ্গে অন্নপানাদি দিয়ে তত্ত্বার্থদর্শী ব্রাহ্মণের সেবা করব। ইন্দ্রযাগের বিপুল সম্ভার সদ্ব্যয় হক এই ভাবে।

"রজসা চোদিতা মেঘা বর্ষন্ত্যম্বূনি সর্ব্বতঃ।
প্রজাস্তৈরেব সিধ্যন্তি মহেন্দ্রঃ কিং করিষ্যতি?"

প্রকৃতির বিধানে যথাকালে আপনিই বর্ষা হয়। এর মধ্যে মহেন্দ্র আবার কি করবেন?

"অন্যেভ্য শ্বাশ্চাণ্ডালপতিতেভ্যো যথার্হতঃ।
যবসঞ্চ গবাং দত্ত্বা গিরয়ে দীয়তাং বলিঃ॥"

যোগ্যতানুসারে সবাইকে অন্নদান কর। কুকুর চণ্ডাল কি পতিতরাও যেন বাদ না যায়—গোবৃন্দকে তৃণগ্রাস দাও—এই তো যজ্ঞ। নিতান্তই অমানব কারও পূজা করতে হয় তো গোবর্ধনগিরিকে এক ভাগ দাও। যাগযজ্ঞকে নারায়ণ সেবায় পরিবর্তিত করতে চেয়েছিলেন নন্দসুত। তাঁর নির্দেশ মানতে অনেক সময় লেগেছিল ভারতবাসীর। বুদ্ধাবতারে মহাগৌতম এসে শ্রীকৃষ্ণের আরব্ধ কর্মকে সুসম্পন্ন করে দিলেন।

সবাই না মানুক, ব্রজবাসী কিন্তু ব্রজযুবরাজের শাসন মেনেছিল। এতেই বোঝা যায়, গোকুলে তাঁর কি বিপুল জনপ্রিয়তা এবং অসাধারণ প্রভাব ছিল। অনুরাগী গোপকুলের মুখ থেকেই মথুরাবাসী কৃষ্ণকথা শুনত। পসরা নিয়ে প্রতিদিনই তো ব্রজবাসীরা এপার-ওপার করত। শ্রীকৃষ্ণ আবার তাদের মুখেই অত্যাচারী কংসের দুষ্কীর্তিগুলি শুনতেন। মথুরা-রাজ যে অকারণে তাদের ব্রজযুবরাজের প্রতি খড়্গহস্ত, এতে গোপকুলের মনে কংসের প্রতি বিরূপতা স্বাভাবিক। শ্রীকৃষ্ণের কাছে কংসের রীতিনীতির অভিপ্রায় বিশদভাবে জেনে

তাদের সে-বিদ্বেষ শতগুণ বেড়েছিল। তাই কংস যখন অক্রূরকে ব্রজে পাঠাচ্ছেন রামকানাইকে আনার জন্য, বলছেন 'গোপরা আমায় বধ করতে চায় আমি জানি। রাম-কানাইকে মারতে পারলে বসুদেব ও নন্দ গোপকে তো মারবই, তাছাড়া গোপকুলের অখিল বিত্ত ও গোধন আমি কেড়ে নেব (বিষ্ণুপুরাণ)।' এ বিদ্বেষের মূলে শুধু শ্রীকৃষ্ণ না আরও কিছু ছিল—এতকাল পরে তা বোঝবার উপায় নাই। তবে ভিতরে ভিতরে যে যদু রাজন্য ও বিশরা একযোগে কংসবধের ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছিল এটা ঠিক। যে অক্রূরকে কংস নিতান্ত বিশ্বাসের পাত্র মনে করতেন তিনিও মনে মনে কংসদ্রোহী ছিলেন। বৃন্দাবনে গিয়েই গোপ-প্রধানদের এবং রাম-কৃষ্ণের কাছে তিনি কংসের গুপ্ত মন্ত্রণা ভেদ করে দিলেন। ধনুর্যজ্ঞ এবং মল্লক্রীড়া সবই ছল—আসল উদ্দেশ্য, কৃষ্ণ-বলরামকে হত্যা করা। মল্লরঙ্গে প্রবেশের মুখেই হাতী খেপিয়ে দুই নবীন জননায়ককে শেষ করে ফেলার পরামর্শ হয়েছে। তাতেও না হলে মল্লশ্রেষ্ঠ চানূরেরা তো আছেই। শ্রীকৃষ্ণ ইতিপূর্বেই তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের কর্মপন্থা স্থির করে ফেলেছিলেন। কি কাজের জন্য তিনি এসেছেন তা আর তখন তাঁর অজানা নাই। গোকুলে ঘোষণা দেওয়া হল, "কাল রাম-কৃষ্ণের সঙ্গে গোপবৃন্দ মধুপুরে যাবার জন্য প্রস্তুত হও"। বেশি কিছু বলার প্রয়োজন ছিল না—সকলেই বুঝে নিল এতদিন যা পরোক্ষে চলছিল এবার তা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম হয়ে দাঁড়াল। এ যে সাধারণ পর্বোপলক্ষ্যে যাওয়া নয়, তাদের ব্রজেন্দ্রনন্দন যে মধুপুরে রাষ্ট্রনায়কের দায়িত্ব নিতে চলেছেন গোপিকারাও তা বুঝেছিল। তিনি সহজে আর মথুরা হতে ফিরতে পারবেন না অনুমান করেই ঘরে-ঘরে কান্নার রোল উঠল। তখনও মেয়েরা জানে না ইনি নন্দসুত নন, দেবকী-বসুদেবের সন্তান—অনুযোগ করে বলছে "ন নন্দসূনুঃ ক্ষণ-ভঙ্গসৌহৃদঃ সমীক্ষতে" ইত্যাদি। তবে বিলাপ কেন? তাতেই বোঝা যায়, মথুরাযাত্রার পরিণাম তাদের অজ্ঞাত ছিল না। যদুপুরীর কর্ণধার হতে হবে রাম-কৃষ্ণকে। আর কি শীঘ্র ব্রজে আসা হবে? রাম-কৃষ্ণ যে জয়ী হবেন এ বিশ্বাস সবারই ছিল। তাঁদের অনিষ্টাশঙ্কা করছে না কেউ—করছে বিচ্ছেদাশঙ্কা।

আবার আসব বলে সস্নেহে গোপীদের বিদায়সম্ভাষণ করে শ্রীকৃষ্ণ রথে উঠলেন। তিনি তখন ঐশ্বর যোগে সমাহিতচিত্ত।

বৈধীমার্গের ভক্ত অক্রূরের চিত্ত বোধহয় গোপিকাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সহজ ভাব দেখে কিছু বীতশ্রদ্ধ হয়েছিল। যমুনা পার হওয়ার আগে স্নান করতে নেমে কালিন্দীর জলে দিব্যদর্শন হল অক্রূরের। সনাতন ব্রহ্মমন্ত্র জপ করতে করতে তিনি দেখলেন সহস্রশীর্ষ মৃণালশুভ্র নীলাম্বর পুরুষের কোলে ঘনশ্যাম পীতাম্বর নারায়ণ বিরাজ করছেন—তাঁরা আর কেউ নন্, রথে যে কৃষ্ণ-বলরাম বসে আছেন সেই দুজন। স্নানকৃত্য সেরে অক্রূর ফিরে আসতেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে শুধালেন, অদ্ভুত কিছু দেখলেন নাকি? আপনাকে যেন কিরকম দেখছি।' অক্রূর বললেন—

'যত্রাদ্ভুতানি সর্বাণি ভূমৌ বিয়তি যা জলে।
ত্বং ত্বা নু পশ্যতো ব্রহ্মন্ কিং মেহদৃষ্টমিহাদ্ভুতম্ ॥' ১০।৪১।৫

ব্রহ্মস্বরূপ! আপনার মধ্যেই সকল আশ্চর্যের অবস্থিতি। সেই আপনাকে যখন দেখেছি তখন জলে স্থলে অন্তরীক্ষে অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে আমার আর বাকী কি আছে? মথুরা প্রবেশের প্রাক্কালে ভক্তের এ-স্তুতি দেবতার প্রয়োজন ছিল।

কংস বলেছিল—

"আরভ্যতাং ধনুর্যাগশ্চতুর্দশ্যাং যথাবিধি।
বিশসন্তু পশূন্ মেধ্যান্ ভূতরাজায় মীঢ়ুষে ॥" ১০।৩৬।২৬

'চতুর্দশীতে' যথাবিধি ধনুর্যাগ আরম্ভ করা হ'ক এবং ভূতরাজের উদ্দেশে যজ্ঞীয় পশু হত্যা করা হ'ক। টীকাকারেরা কেউ কেউ বলেন—ভূতরাজ হচ্ছেন রুদ্র। তাঁর ভূতনাথ নামটি চিরদিনই প্রসিদ্ধ। কিন্তু এই চতুর্দশী কি ভূত-চতুর্দশী? দীপান্বিতার পূর্বদিন? মোট কথা, এই চতুর্দশীর বিকালে মথুরার উপবনে এসে পেঁছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। রথে করে আসায় তাঁদের বোধ হয় ঘোরাপথে কোন সেতুর উপর দিয়ে আসতে হয়েছিল। গোপগোষ্ঠী কিন্তু নৌকায় গরুর গাড়ী পার করে তাঁদের আগেই পেঁছে গেছে। 'আপনি রথ নিয়ে নিজগৃহে

যান। আমরা এখানে বিশ্রাম নিয়ে একটু পরে পুরীতে প্রবেশ করব' এই বলে অক্রূরকে বিদায় দিয়ে কৃষ্ণ-বলরাম ব্রজবাসীদের সঙ্গে মিললেন।

"অথাপরাহ্নে ভগবান কৃষ্ণঃ সঙ্কর্ষণান্বিতঃ।

মথুরাং প্রাবিশদ্গোপৈর্দিদৃক্ষুঃ পরিবারিতঃ॥" ১০।৪১।১৯

অপরাহ্নে গোপ-পরিবারিত হয়ে কৃষ্ণ-বলরাম মথুরা-পুরে প্রবেশ করলেন। এই যে গোপ-পরিবার এরাই শ্রীকৃষ্ণের ভাবী নারায়ণী সেনা।* এদের নিয়েই দুরন্ত ক্ষত্রিয়দলকে বারবার দমিত করেছেন তিনি। রণে বনে অরণ্যে পর্বতে এরাই তাঁর বিশ্বস্ত সহচর ছিল। তাদের নিয়ে নগর প্রবেশ করাটা ঠিক নবাগতের রাজধানী দর্শন নয়, স্পর্ধাভরে আত্মঘোষণা করা। ক্ষত্রিয়ের রীতি হল—কারও অবহেলা সইবে না, উদ্ধতকে নত করবে বাহুবলে। কৃষ্ণ-বলরাম সেই মনোভাব নিয়েই মধুপুরে পা দিলেন।

গোপুরশোভিতা বিশাল মধুপুরী—ভাগবতকার চারটি শ্লোকে তার ঐশ্বর্য-ময়ী রূপ এঁকেছেন। চারদিকে চারটি তুঙ্গ তোরণ, পরিখাবেষ্টিত জনাকীর্ণ মথুরা কোষ্ঠা (শস্যাগার) হর্ম্য নিষ্কুট (বাগানবাড়ী। উপবন উদ্যান শ্রেণীসভা (শিল্পী সঙ্ঘের মিলনস্থলী—ক্লাব জাতীয় ?) রথ্যা আপণমার্গ (দোকান-বাজার) চত্বরে সাজানো। গৌরব-গর্বে ঝলমল করছে উত্তরাপথের অন্যতমা মহানগরী। অক্রূরের রথ ফিরতে দেখেই চঞ্চল হয়ে উঠেছিল মাথুরিকরা। তারা

---

* মহাভারতের উদ্যোগপর্ব ষষ্ঠাধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, "আমার সমযোদ্ধা নারায়ণ নামে বিখ্যাত এক অর্বুদ গোপ এক পক্ষের সৈনিক পদ গ্রহণ করুক"…। আবার দ্রোণপর্বের ২৭ অধ্যায়ে আছে—"কৃষ্ণের পূর্বানুচর চারি সহস্র মহারথ… সংশপ্তক"—এরাই নারায়ণী সেনা। বন-পর্বের ১৮৩ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের কাছে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন তাঁর মাথুরী সেনা পাণ্ডবদের সহায় হবে। মাথুরী সেনা যাদবী সেনা হতে স্বতন্ত্র বলেই মনে হয়। কারণ তখন যাদবী সেনার কেন্দ্র দ্বারকা। তাছাড়া যাদবী সেনা সঙ্ঘের অধীন…কিন্তু মাথুরী সেনা বোধহয় শ্রীকৃষ্ণের নিজস্ব বাহিনী। তাদের উপর তাঁর সম্পূর্ণ অধিকার ছিল।

জানে—রাম-কৃষ্ণকে আমন্ত্রণ করেছেন কংস। তারপর মথুরার দিকে যখন অক্রূরের রথ আসছে তখন পথের আশে-পাশে চলমান মথুরাযাত্রীরা শ্রীকৃষ্ণকে দেখেছে—দেখে চোখ ফেরাতে পারেনি। মুখে-মুখে রটে গেছে—অক্রূর পরম সুন্দর দুটি তরুণকে নিয়ে আসছেন। কে তারা? যিনি রজতকান্তি তিনি রাম· আর যিনি পীতাম্বর শ্যামসুন্দর তিনিই গিরিধারীলাল ব্রজেন্দ্রনন্দন।

আচ্ছা, এত যাঁর রূপখ্যাতি ছিল তিনি কেমন কাল ছিলেন? জানতে বড় সাধ হয়। পাথুরে কাল কি? মিশ্‌কালো যাকে বলে? না, ঠাকুরবাড়ির সাত ছেলের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যেমন কাল ছেলে শ্রীকৃষ্ণও তেমনই কাল? শেষেরটাই বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে। সেকালে ভারতীয় আর্যদের রং ছিল হয় তুষারশুভ্র নয় স্বর্ণদ্যুতি। শ্রীকৃষ্ণের দেহবর্ণ বোধহয় ছিল লালচে সাদা—বাংলায় যাকে বলে দুধে আলতা বা গোলাপ ফুলের মত রঙ। ভাগবতে এক জায়গায় পরিশ্রান্ত গোষ্ঠবিহারীকে 'বদর-পাণ্ডু-বদনঃ' (১০।৩৬।২৪) অর্থাৎ আধপাকা কুলের মত মুখ খানির রং বলা হয়েছে। আধপাকা কুলের রং কেমন? গৌরকান্তি ভারতীয় সমাজে ও রঙটা শ্যামই বটে।*

---

*শ্রীঅনির্বাণের মতে—"শ্যাম ঋগ্বেদে 'শ্যাব', নিঘণ্টুতে সবিতার বাহন 'শ্যাব'। সবিতাকে চক্রবালের উপরে দেখা যায় না, কিন্তু তাঁর ছটায় "দৌরপহতমস্কা ভবতি"—অর্থাৎ আকাশ কোমল পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ করে। এই রঙটি সবিতার বাহনের। সুতরাং শ্যাম বলতে সেখানে কাঁচ কলাপাতার রং। আমরাও উজ্জ্বল শ্যাম বলি। কৃষ্ণ কালো ছিলেন মনে হয় না। তবে আধ্যাত্মিক অর্থে আবার তিনি কালো, ছান্দোগ্যের 'পরঃকৃষ্ণ ভা'।"

আমাদের মনে হয়, ঠিক যেমন ঐতিহাসিক পুরুষকে আধ্যাত্মিক করার তাগিদে ভাগবত-প্রচারকেরা শ্রীকৃষ্ণের বয়স প্রয়োজনমত বাড়িয়েছেন বা কমিয়েছেন গাত্রবর্ণ সম্বন্ধেও ওই রীতি। আসল মানুষটি যে খুব সুন্দর ছিলেন সে বিষয়ে সকলেই একমত। কিন্তু বর্ণবিচার করতে গিয়ে তাঁরা বিষ্ণুর প্রসিদ্ধ নীলবর্ণ

[পঃ পৃঃ দ্রষ্টব্য]

মথুরায় যখন শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হল তখন তিনি উরুকীর্তি। তাঁর কালিয়দমন অসুরনিধন ইন্দ্রযজ্ঞভঙ্গ দাবাগ্নিমোক্ষণ গোবর্ধনধারণের গল্প মুখে মুখে ফিরছে মথুরামন্ডলে। নন্দসুতের বাঁশি নৃত্য গীত অসামান্য সৌন্দর্য নিয়ে উপকথা সৃষ্টি হয়ে গেছে প্রায়। সুতরাং হাওয়ায় খবর ছড়িয়ে গিয়েছিল 'মুহুঃশ্রুতঃ' সেই অপূর্বযশা নন্দকুমার আজ বিকালে পুরপ্রবেশ করবেন। উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় পথ চেয়েছিল—মথুরাবাসী। নগরতোরণে শ্রীকৃষ্ণ পা দেওয়া মাত্র মৌচাকে ঢিল পড়ার মত গুঞ্জরিত হল মধুপুরী—এসেছেন! এসেছেন!

তাঁকে দেখার জন্য মধুনাগরীদের উৎকণ্ঠার যে বর্ণনা ভাগবতে আছে তা পরে সংস্কৃত সাহিত্যের একটা কাব্যাদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দর্শনীয় কিছু দেখতে গিয়ে পুরবাসীদের উৎকণ্ঠার চিত্র আঁকতে কবি কালিদাসও বলেছেন তেমনি করে, অর্ধসমাপ্ত বেশ-ভূষায় অসমাপ্ত কাজ ফেলে ছুটে আসছে ললনারা। অর্থাৎ মথুরার মেয়েদের সেদিন যে উৎকণ্ঠা ও প্রীতি মিশ্রিত বিস্ময় জেগেছিল নন্দসুতকে নিয়ে, সে একটা epoch, জাতির জীবনে সে একটা সন্ধিক্ষণ। ভারতবর্ষের কবিচিত্ত সেই স্মৃতিকে অক্ষয় করে রেখেছে নানা কাব্যে। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নানাভাবে আস্বাদ করেছে অভাবনীয়কে আচম্বিতে প্রত্যক্ষ করার সেই মধুর রস। সে কি ভুলবার?

"মনাংসি তাসামরবিন্দলোচনঃ
প্রগল্ভলীলাহসিতাবলোকনৈঃ।
জহার মত্তদ্বিরদেন্দ্রবিক্রমো
দৃশাং দদচ্ছ্রীরমনাত্মনোৎসবম্।" ভাগবত ১০।৪১।২৭

—তিনি নয়নোৎসব, তাঁকে দেখেই মন হারাল মেয়েরা!

আরোপ করেছেন শ্রীকৃষ্ণের উপর। ঋষির দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের মর্ত্যবিগ্রহের অন্তরালে যে ভাগবতী তনু সেইটিই তাঁর সত্যস্বরূপ। সুতরাং তিনি শ্রীকৃষ্ণকে 'নীলকান্তমণিনিভ' ছাড়া অন্য রকম বর্ণনা করবেন কেন? তার থেকে শ্যাম, নবঘনশ্যাম শেষে কালো। হতে পারে—সত্যই আর্যদের তুলনায় তাঁর দেহবর্ণ নীরস ছিল। ইউরোপে লালচে রঙের মানুষ কিন্তু কাল বলেই বিবেচিত হয়।

কৃষ্ণ-বলরাম পুরোভাগে, পিছনে দেহরক্ষীর মত তাঁদের অনুসরণ করছে গোপবৃন্দ—নির্ভীক সগর্ব ভঙ্গি তাদের—কেউ তাদের কুমারকে কিছু বলে বলুক তো, এমনই ভাব। উত্তেজনায় তপ্ত হয়ে উঠল পরিবেশ—সাধারণ পুরবাসী সহজেই অনুমান করল, একটা রাষ্ট্রবিপ্লব ঘনিয়ে এসেছে নেপথ্যে। পথে লোক দাঁড়িয়ে গেছে—ওদিকে গবাক্ষে বাতায়নে প্রাসাদশীর্ষে পক্ষদ্বারে অলিন্দে মেয়েদের ভিড়। ব্রাহ্মণগোষ্ঠী এবং মেয়েরা অনেকেই ফুল মালা গন্ধ দধি অক্ষতাদি উপচারে রাম-কৃষ্ণকে অভিনন্দন জানাতে শুরু করলেন। পরস্পর বলাবলি হতে লাগল—এঁরাই কৃষ্ণ-বলরাম? আহা, গোপীদের কি ভাগ্য!

উচুঃ পৌরাঃ অহো গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ মহৎ।
যা হ্যেতাবনুপশ্যন্তি নরলোকমহোৎসবৌ ॥ ১০।৪১।৩১

দুঃখের বিষয়, উৎসবটা একটু পরেই রুদ্ররকম হয়ে উঠল। দুই ভাইয়ের সতর্ক দৃষ্টি চারিদিকে ঘুরছিল। হঠাৎ থেমে গেলেন তাঁরা। সম্মুখে সুন্দর পেটিকা হাতে একদল লোক আসছে…তাদের নেতাটি একজন রঙ্গকার 'রজক'… পোষাকে বোঝা গেল। জাঁকজমক এবং দর্পিত ভাব দেখে শ্রীকৃষ্ণ ধরে নিলেন এরা রাজভৃত্য। পথ আটকিয়ে বললেন 'ওহে! এ সমস্ত পোষাক আমাদেরই যোগ্য…যাও কোথায়? আমাদের দিয়ে যাও এসব।' গায়ে পড়ে ঝগড়া করা আর কাকে বলে? রাজভৃত্য রুষ্ট বিদ্রূপে জবাব দিল—

"ঈদৃশান্যেব বাসাংসি নিত্যং গিরিবনেচরাঃ।
পরিধত্ত কিমুদ্বৃত্তা রাজদ্রব্যাণ্যভীপ্সথ ॥" ১০।৪১।৩৫

'রে গিরিকাননবাসী দুর্বৃত্তদল! তোরা বুঝি নিত্য এমনই পরিচ্ছদ পরিস্? রাজার দ্রব্য প্রার্থনা করিস্ কি বলে? সাহস ত কম নয়!' বেশি কথা বাড়ালেন না শ্রীকৃষ্ণ। চক্ষের পলকে কি যে হয়ে গেল, মাথুরিকরা শিউরে উঠে দেখল রক্তধারায় ভিজে গেছে রাজপথ। ছিন্নশির রঙ্গকার মাটিতে লুটাচ্ছে, তার সঙ্গীরা 'বাসঃ কোষ' ফেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাচ্ছে এক এক দিকে। সংহারমূর্তিতে

আত্মপ্রকাশ করলেন শ্রীকৃষ্ণ···কুরুক্ষেত্রের সূচনা হল সেই দিন। ভারতের বায়ুকোণে নিঃশব্দে ঝড় ঘনিয়ে এল।

রাজপরিচ্ছদ হতে বেছে-বেছে নিজেদের মনোমত বসন তুলে নিয়ে বাকী সব পথের মাঝখানে ছড়িয়ে ফেলে এগিয়ে চললেন রাম-কৃষ্ণ। কেবল তাঁরাই যে রাজদ্রব্য ব্যবহার করেছেন তা নয়, সঙ্গীদের অঙ্গেও উঠেছে পবিত্র রাজদ্রব্য। মুহূর্তে গণতন্ত্রের আবহাওয়া ফিরে এল নগরে। বায়ক ও মালাকাররা স্বেচ্ছায় নবীন বীরকে স্বাগত জানিয়ে সানুচর রাম-কৃষ্ণকে বস্ত্র-মাল্যে সাজিয়ে দিল। গ্রাম্য বেশ ছেড়ে নাগরিকের বেশভুষা ধরলেন সকলে। পথচারীরা সভয় সম্ভ্রমে দেখছে শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে—মহার্ঘ ক্ষত্রিয়-পরিচ্ছদে স্বাভাবিক রূপমাধুর্যের উপরে ফুটে উঠেছে রাজমহিমা। প্রীতিমিশ্রিত শ্রদ্ধায় মথুপুরী তার ত্রাণকর্তার দিকে চেয়ে থাকে। অত্যাচারের প্রতিকার কি হবে এতদিনে?

এরপরই কুব্জা-সম্ভাষণ···রৌদ্ররসের পরে একঝলক করুণ মধুর রস। আগের দিনের অনুলেপনকর্মটি ঠিক কি ব্যাপার বোঝা যায়। মনে হয় যেন paint করার প্রথা ছিল অভিজাত সমাজে। কারণ কংসের প্রিয়দাসী নিপুণ হাতে দু'ভাইকে অনুলেপ মাখিয়ে দিল তখন তাঁদের গায়ের নিজস্ব রং আর-এক রকম হয়ে গেল, এমনি বর্ণনা আছে। ভাগবতকার বলছেন—

"ততস্তাবঙ্গরাগেন স্ববর্ণেতরশোভিনা।
সম্প্রাপ্তপরভাগেন শুশুভাতেহনুরঞ্জিতৌ॥" ১০।৪২।৫

কুব্জার আত্মনিবেদনে রাম-কৃষ্ণের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। প্রসন্ন হাস্যে গোপকুমারেরা ভাবছেন—ধন্য এ সৈরিন্ধ্রী! নারী হয়ে রাজরোষকে ভয় করে না। সাধারণ মেয়ে তো নয়। 'রসপ্রদঃ মাধবঃ' হয়তো ত্রিবক্রাকে দেখেই চিনেছিলেন ও রসতৃষ্ণায় পিপাসিতা। তাঁকে দেখেই হীনা কুব্জার নারীসত্তা জেগে উঠেছিল। রাজরোষ দূরের কথা, মরণেও ভয় ছিল না তার। সাধারণের অজ্ঞাত যৌগিক চিকিৎসায় কুব্জার দেহবিকৃতি নিরাময়ের ব্যবস্থা করলেন শ্রীকৃষ্ণ। সাহস পেয়ে কুব্জা আমন্ত্রণ জানাল তাঁকে- বলরাম ও

সহচরদের দিকে চেয়ে একটু হেসে তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন 'যাব তোমার ঘরে।'

এরপর পুরবাসীদের কাছ থেকে যজ্ঞশালার সন্ধান নিয়ে সানুচর রাম-কৃষ্ণ এসে প্রবেশ করলেন ধনুর্যাগস্থানে। শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে কেবল রাষ্ট্রনীতিকুশলতা দেখতে গেলে ভুল হবে। মনে রাখতে হবে, মূলতঃ তিনি ধর্মসংস্থাপয়িতা—রাজনীতি তাঁর জীবনে গৌণ, মুখ্য ছিল ধর্মের গ্লানি মোচন। যেমন বাসুদেব সার্বভৌম ও প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে বিদ্যাচর্চা কি শাস্ত্রবিচারে পরাস্ত করা চৈতন্যদেবের গৌণ কর্ম—প্রেমভক্তি বিতরণই সার কথা। অবতার-পুরুষ যখন যে সমাজে আসেন, মনুজশ্রেষ্ঠ হিসাবে সেই সমাজের উৎকর্ষ ঘটানোও তাঁদের আনুষঙ্গিক দায়। ক্ষত্রিয় ভারতে ক্ষত্রবীর হয়ে এসেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্বন্ধে উদাসীন বা অনভিজ্ঞ থাকবার উপায় ছিল না তাঁর। আর্তত্রাণ-ব্রত তাঁর সহজ কর্ম। কিন্তু মূল লক্ষ্য ছিল ধর্মজগতে যুগান্তর ঘটানো। ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ এবং ধনুর্যাগ পণ্ড করা তারই আদিপর্ব।

অধ্যাত্মবিজ্ঞানের দুটি বিভাগ—জ্ঞান ও কর্মকাণ্ড। কর্মকাণ্ড আনে অভ্যুদয়—ভোগৈশ্বর্য, ইহ-পরকালে সুখসমৃদ্ধির ব্যবস্থা পাকা হয়ে যায়। তন্ত্রের সিদ্ধাই ও যোগের বিভূতি অতীত কর্মকাণ্ডেরই অনুবৃত্তি। বৈদিক সমাজে ঘরে ঘরে কর্মকাণ্ডের চর্চা হত—মেয়েরা পর্যন্ত যোগশক্তি অর্জন করত, বীর্যবান পুরুষের আর কথা কি। অপ্রতিহত ইচ্ছাশক্তি, অপর্যাপ্ত দৈহিক বল ও আয়ু, নানা দিব্যভোগ, ঋদ্ধি, সিদ্ধি—অধ্যাত্মবিজ্ঞান সহায়ে এর কিছু না কিছু প্রত্যেকে অর্জন করত। মহাভারত ও পুরাণাদিতে এমনি সমাজেরই আভাস আছে। ব্রাহ্মণেরা জ্ঞানকাণ্ডের অনুশীলন করতেন; কিন্তু ক্ষত্রিয়কুল মত্ত হয়েছিল কর্মকাণ্ডের অবাধ চর্চায়। জরাসন্ধের মহাভৈরব যজ্ঞ এবং কংসের ধনুর্যজ্ঞ এমনই এক একটি সকাম অনুষ্ঠান। ভূতরাজার উদ্দেশে পশুবলি দিয়ে স্বর্ণরত্নময় এক ধনুর অর্চনা সম্ভবতঃ অভিচার কৃত্য। ধনু স্পর্শ করা মাত্র বিপক্ষ হত হবে বা অমনি কিছু। ভূতবেষ্টিত সাক্ষাৎ রুদ্রের মতই এই

অশিব যজ্ঞ পণ্ড করে দিলেন সানুচর শ্রীকৃষ্ণ। অগণিত রক্ষীকে নিমেষে পরাভূত করে, মত্ত হস্তী যেমন অবলীলায় ইক্ষুদণ্ড ভেঙে ফেলে ('যথেক্ষুদণ্ডং মদকরী') তেমনি অনায়াসে সেই রৌদ্রী ধনু দ্বিখণ্ড করে ফেললেন শ্রীকৃষ্ণ। অংশীর দেহে অংশের তেজ লয় হয়ে যাবার কথা। পুরাণকার বলেন—ত্রেতায় যেমন রামচন্দ্র ভার্গবী ধনু ছোঁওয়া মাত্রই ভৃগুরামের তেজ ক্ষয় হয়েছিল। কংসের ভূতপতি অর্চনার ফলটা তেমনি শ্রীকৃষ্ণতেই বর্তাল, তাঁর মাহেশ্বর তেজে রুদ্রতেজ যুক্ত হয়ে কালান্তক শক্তি লাভ করলেন শ্রীকৃষ্ণ। যজ্ঞহানি করে বিজয়গৌরবে নগরপরিক্রমায় বার হলেন শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম—কারো সাধ্য হল না বাধা দেয়—

"তয়োস্তদদ্ভুতং বীর্যং নিশাম্য পুরবাসিনঃ
তেজঃ প্রাগলভ্যং রূপঞ্চ মেনিরে বিবুধোত্তমৌ ॥" ১০।৪২।২২

তাঁদের শৌর্য বীর্য ঔদ্ধত্য এবং রূপ দেখে মাথুরিকরা তাঁদের দেবশ্রেষ্ট বলেই মনে করল। কংসের সে রাত্রে ভয়ে ঘুম হল না, মাথুরিকদের হল না উৎকণ্ঠায়। কাল সকালে কি না জানি হয়—জল্পনা-কল্পনাতেই রাত কেটে গেল। কৃষ্ণ-বলরাম কিন্তু গোপদের নিয়ে রাত্রে নিশ্চিন্তে ঘুমালেন। পুরবাসীরা সম্পূর্ণ তাঁদের পক্ষে। কংসেরও এত সাহস হবে না যে মথুরার প্রকাশ্য উপবনে তাঁদের হত্যা করবার চেষ্টা করবে। শয়তানের ছল-কৌশলই ভরসা।

পরদিন প্রভাতবেলায় নাগরিকরা ছুটল মল্লরঙ্গের দিকে। শূরসেনের জনপদবাসীরাও জানে সেদিন মল্লক্রীড়া মহোৎসব হবে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে হাজার হাজার দর্শক মল্লভূমিতে ঢুকতে গিয়ে ভীত হয়ে দেখছে—প্রধান তোরণের পাশে দাঁড়িয়ে আছে কুবলয়াপীড়, কংসের রাজহস্তী, যূথপতি। মাহুত সামলাতে পারছে না তাকে, পায়ে শিকল বাঁধা থাকলে কি হবে? শুঁড় দুলিয়ে ফুঁষছে কুবলয়াপীড়, তার গভীর শ্বাসোচ্ছ্বাসে ধুলা উড়ছে সামনে থেকে, চোখ দুটি রক্ত-রাঙা। এ খেপা হাতী এখানে কেন? কাল কি স্নান করায়নি ওকে।

তুরী-ভেরী বাজছে তালে তালে। 'মল্লরঙ্গপরিশ্রিতা'…ক্রীড়াভূমির চারিদিক ঘিরে মঞ্চ পুর ও জনপদবাসীতে ভরে উঠেছে আসন। নন্দাদি গোপবৃদ্ধরা

রাজপ্রাপ্য উপায়ন কর্মচারীদের হাতে দিয়ে এসে বসলেন এক মঞ্চে। তার আগেই মণ্ডলেশ্বরপরিবৃত ভোজরাজ কংস রঙ্গমঞ্চে আসন গ্রহণ করেছে। তূর্যনিনাদের সঙ্গে বীরদর্পে মল্লাচার্যরা রঙ্গভূমিতে আসতে লাগল—নিস্তব্ধ হয়ে গেল সভা। এবার খেলা শুরু হবে। এমন সময়ে ঘোর 'বৃংহতি' শোনা গেল বাইরে। কুবলয়াপীড় গর্জে উঠল কাকে দেখে? কি হল ওখানে?

'মল্লরা রঙ্গে প্রবেশ করছে' তূর্যনিনাদে এই সঙ্কেত পেয়েই জনকয়েক গোপ-কুমার সঙ্গে কৃষ্ণ-বলরাম ক্রীড়াভূমিতে প্রবেশ করতে লাগলেন। কুবলয়াপীড়কে দিয়ে মাহুত অমনি পথ আটকাল। শৌরি মেঘমন্দ্রকণ্ঠে বললেন—'ওহে হস্তিপক, পথ ছেড়ে দাও আমাদের—সরে যাও তাড়াতাড়ি।'

"নোচেৎ সকুঞ্জরং ত্বাদ্য নয়ামি যমসদনম্।"

তার উত্তরে মাহুত অঙ্কুশতাড়িত করল কুবলয়াপীড়কে। চলন্ত পর্বতের মত খেপা হাতী শ্রীকৃষ্ণের উপর এসে পড়ল। আর্তনাদ করে উঠল চার পাশের জনতা—গেল, গেল! ক্ষিপ্ত মাতঙ্গের উৎকট গর্জনে মল্লরঙ্গের ভিতরে যারা ছিল তাদের বুকের রক্ত জল হয়ে যায়। এ কি ব্যাপার?

মথুরাবাসী জীবনে ভুলতে পারেনি সেদিনের দৃশ্য। স্তম্ভিত আতঙ্কে স্মরণ করেছে সেই ভয়াবহ যুদ্ধ—প্রমত্ত বারণের সঙ্গে একা একজনের সংগ্রাম। ক্ষাত্রশক্তিদৃপ্ত আর্য্যাবর্তকে পদানত করতে হলে মহাবীর্যের প্রয়োজন। সেদিনের যুগাবতার তাই অনন্ত শক্তি নিয়ে এসেছিলেন। প্রতিটি কীর্তিতে তিনি যেন বুঝিয়ে দিতেন—তোমরা পুরুষানুক্রমিক অধ্যাবসায়ে যার কণামাত্র আয়ত্ত করেছ তার অক্ষয় ভাণ্ডার আমারই হাতে। মুষ্টিভিক্ষা পেয়ে এত বিমূঢ় তোমরা? এত অহঙ্কার? "পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।" তখন ভারতকেও বলতে হত—'নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত'—এখন যা বলবে তাই করব।

অমানুষিক বলে গজরাজের দীর্ঘ দন্ত দুটি উৎপাটন করে রক্তচর্চিত দেহে শ্রীকৃষ্ণ যখন বলদেব ও গোপদের নিয়ে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁকে

দেখে মল্লদের মনে হল ইনি 'মহদ্ভয়ং বজ্রমদ্যতম্', আর আমাদের রক্ষা নাই। কংসের কাছে তিনি সাক্ষাৎ যম, সাধারণের কাছে নরোত্তম, মেয়েদের মনে হল ইনি মূর্তিমান কন্দর্প। গোপদের কাছে তিনি নিজজন…সম্ভ্রমের কোনও হেতু নাই…তাঁর অগণিত যোগবিভূতি বাল্যকাল হতে দেখেছে তারা। অত্যাচারী রাজন্যবর্গ তাঁকে জানলেন শাস্তা বলে আর নন্দাদিগুরুবর্গ তাঁকে বালক বলেই মনে করলেন! তুমুল হৈহল্লা উঠেছে রঙ্গ জুড়ে। এরা কখনই মানুষ নয়, নিশ্চয়ই নারায়ণ অবতার। এই কৃষ্ণ নন্দসুত বা গোপ নন্।

"এষ বৈ কিল দেবক্যাং জাতো নীতশ্চ গোকুলম্।
কালমেতং বসন্ গূঢ়ো ববৃধে নন্দবেশ্মনি॥" ১০।৪৩।২৪

ইনিই দেবকীর অষ্টমগর্ভজাত সন্তান—শৌরি বাসুদেব—নারায়ণাংশে জন্মাবে সে ছেলে শোনা গিয়েছিল না! নিশ্চয়ই বসুদেব এঁকে গোপনে নন্দালয়ে রেখে এসেছিলেন…এতদিন বলরামের সঙ্গে সেইখানে আত্মপরিচয় লুকিয়ে বাস করেছেন ইনি। শোনোনি ব্রজেন্দ্রকুমারের কীর্তিগাথা? ইনিই গিরিধারীলাল, রাসবিহারী বেণুধর!

"বদন্ত্যনেন বংশোহয়ং যদোঃ সুবহুবিশ্রুতঃ।
শ্রিয়ং যশো মহত্বঞ্চ লপ্স্যতে পরিরক্ষিতঃ॥" ১০।৪৩।২৯

তত্ত্ববিদেরা বলেন—এর দ্বারা পরিরক্ষিত হয়েই যদুকুল বহুবিশ্রুত হবে এবং যশ সমৃদ্ধি ও মহত্ত্ব লাভ করবে।

এইসব জল্পনাকল্পনার মধ্যে মল্লযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। কৃষ্ণ-বলরাম অবহেলায় মল্লশ্রেষ্ঠদের যমপুরে পাঠিয়ে দিয়ে সহচর গোপদের নিয়ে বিজয়োল্লাসে রঙ্গ পরিক্রমা করতে লাগলেন। নষ্টবুদ্ধি কংস মৃত্যুমুহূর্তে নিজেই রাম-কৃষ্ণের পরিচয় প্রকাশ করে দিল—

"নিঃসারয়ত দুর্বৃত্তৌ বসুদেবাত্মজৌ পুরাৎ।"

দুর্বৃত্ত এই বসুদেবপুত্র-দুটিকে বার করে দাও পুরী হতে, গোপদের সর্বস্ব

লুণ্ঠন কর, নন্দবসুদেবকে বধ কর—এইসব বলতে না বলতেই তীব্র রোষে রাজমঞ্চের উপর লাফিয়ে উঠলেন শ্রীকৃষ্ণ। মুহূর্তমধ্যে কংসবধের পর্ব শেষ। তার আটটি ভাইকে রোহিণীকুমারই শেষ করলেন।

"জনাঃ প্রজহৃষুঃ সর্ব্বে কর্ম্মণা রাম-কৃষ্ণয়োঃ।"

—রাম-কৃষ্ণের অলৌকিক বিক্রমে জনগণ হর্ষভরে সাধুবাদ দিচ্ছিল এতক্ষণ। কংসবধে তারা কিছুটা বিমূঢ় হলেও যদুসঙ্ঘ উৎফুল্ল হয়ে উঠল—স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটল মধুপুরে।

রাজপ্রধানদের সঙ্গে দুই ভাই এসে দাঁড়ালেন কারাগারে···যেখানে শৃঙ্খলাবদ্ধ বসুদেব প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু প্রতীক্ষা করছেন ; শোকশীর্ণা দেবকী বন্দিনীদশায় মাটিতে লুটাচ্ছেন। বিনাদোষে—শুধু কংসের অপ্রীতিভাজন হয়ে কত সম্ভ্রান্ত অভিজাত বন্ধন দশায় ছিল, তার হিসাব নাই। কংসের পিতা বৃদ্ধ উগ্রসেনও তাদের একজন—ছেলের অত্যাচারের প্রতিবাদ করায় কারাকক্ষে স্থান তাঁর। যদুমুখ্যরা তাঁদের বন্ধন মোচন করতে লাগলেন। কৃষ্ণ-বলরাম এসে দাঁড়ালেন আধিক্ষীণ বসুদেব-দেবকীর কাছে। হাত-পায়ের শিকল খুলে দিয়ে প্রণাম করে আত্মপরিচয় দিলেন দুই ভাই—'আমরা তোমাদের সন্তান'। সংশয়ভরে স্বামীর দিকে চান দেবকী, দেখেন হতবুদ্ধির মত হাতজোড় করছেন বসুদেব। কতকাল যাদের দেখেননি, আজ সত্যই সে হারানিধি দুটি ফিরে পেয়েছেন, সহজে কি বিশ্বাস হয় সে কথা? সদ্যোজাত শিশু দেখেছেন যাদের, তারা আজ সুদর্শন তরুণ—বাৎসল্য আসতে চায় না মনে। কেবল এই-ই মনে হয়, মুক্তিদাতা ওরা—ওরা বুঝি দীনদয়াল ভগবান। আহা! এজীবনে কি কারামোচন হত আর? দেবকীও সভয় ভক্তিতে কৃতাঞ্জলি হলেন। আমাদের মনে পড়ে ফরাসী বিপ্লবকালে বাস্তিল হতে যারা অভাবিতভাবে মুক্তি পেয়েছিল তাদের কথা। কত বিসদৃশ আচরণই করেছিল হতভাগ্যের দল। বসুদেব-দেবকীও হয়তো দীর্ঘ উৎপীড়নের ফলে শোকে বেদনায় বিমূঢ় ছিলেন। প্রথম সাক্ষাতে ছেলে

দুটিকে দেবতাজ্ঞানে প্রণাম করতে যাওয়া-ই তো স্বাভাবিক—ছেলে বলে বুকে ধরতে পারেননি সাহস করে। পারবেন কি করে? দেবসন্তান যাচ্ঞা করেছিলেন স্বামী-স্ত্রী, তার দাম দিতে হয়েছে বড় কম নয়। নাড়িছেঁড়া ধনকে বুক থেকে টেনে নিয়ে পাথরে আছড়ে মারা কবে কোন্ মা সইতে পারে? তা-ও কি একবার? সাত-সাত বার। শূন্য হৃদয়ে তপ্ত স্মৃতির শূল বুকে নিয়ে কেমন করে বেঁচেছিলেন দেবকী—পাগল হয়ে যাননি? সত্ত্বশুদ্ধ বসুদেব জ্ঞানযোগীর মত নিজের দুঃখ স্থির হয়ে সইতেন। কিন্তু সন্তানহারা মাকে কোন্ জ্ঞানের বুলিতে প্রবোধ দেবেন তিনি? মায়ের প্রাণ যে যন্ত্রণায় হু-হু করে পোড়ে কে তা শীতল করবে? সে যে মহামায়ার দুশ্ছেদ্য পাশ—তিনি নিজে কৃপা না করলে মায়া তো যাবার নয়। তবু বলব, বসুদেবের যোগ্যা সহধর্মিণী দেবকী—ধুলিশয্যা ছেড়ে বার বার স্বস্থ হয়ে উঠে বসেছেন তিনি। করযোড়ে আকাশের দিকে চেয়ে বলছেন—'তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ক প্রভু! তোমায় যে চায় দুঃখ তার নিত্যসহচর। শুধু এই কর যেন ভুলে না যাই তোমাকে।' তবে না পূর্ণব্রহ্ম এসেছিলেন সে মায়ের কোলে। তরুণ রাম-কৃষ্ণ যখন আদর করে 'বাবা' 'মা' ডেকে সান্ত্বনা দিয়ে বার বার বোঝালেন—'স্বপ্ন নয়, সত্যই এসেছি তোমাদের কাছে, আর হারাবার ভয় নাই'—তখন দুঃখহত বসুদেব-দেবকী একটি কথাও বলতে পারলেন না। কেবল দুহাতে তাঁদের জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। চিরসঞ্চিত বেদনার উষ্ণ ধারা গলে পড়তে লাগল ভগবানের পায়ে। সন্তান? না সন্তানকামনা আর নাই। যদি সহজ মানুষ হয়ে কাছে এসেছ, এই কর, যেন বৈষ্ণবী মায়াতে আর না ভুলি। চিরদিন বসুদেব ও দেবকীর এই সম্ভ্রমবোধটি ছিল।

ওদিকে নন্দ-যশোদার ভাগ্যটি কেমন? পরের ছেলেকে মানুষ করতে গিয়ে নিজেদের কন্যাটিও কংসের কবলে পড়েছিল। কি বলে শ্রীকৃষ্ণ সান্ত্বনা দিয়েছিলেন তাঁদের? হয়তো স্নিগ্ধস্বরে বলেছিলেন—'গোপদের আত্মদান বিনিময়ে শূরবংশ অভ্যুদয় লাভ করল। মহারাজ দেবমীঢ় যদি আজ থাকতেন,

তিনি বলতেন—তাঁর বৈশ্যা পত্নী-গ্রহণ সার্থক।* গোপরাজ নন্দ নিজেদের কৃতকৃতার্থ মনে করলেন। ঠিক তো! তাঁদের আপ্রাণ যত্নেই সাধুত্তম বসুদেবের শ্রেষ্ঠরত্ন রক্ষা পেয়েছে। গোপরাই জ্বালিয়ে রেখেছে শূরবংশের রত্নপ্রদীপ, এ কি কম গৌরবের কথা? ক্ষত্রিয়ের সেবায় সর্বস্ব বলি দিয়ে প্রশান্ত মুখে ভাগ্যকে মেনে নিলেন পরম-ভাগবত নন্দ। সেই মুহূর্তে ভগবানকে তাঁরা কিনে নিলেন। ভারতের নিম্নবর্ণরা যুগে যুগে এই উৎসর্গের সাধনাতেই বলীয়ান্। নন্দসুত যশোদাদুলাল কানাই তাঁদেরই ঠাকুর—অভিজাতদের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা নাই কোনদিন।

কংসনিধনের পর যাদব সংঘ একত্রিত হয়ে পরামর্শ করে—সংঘাধিনায়ক কে হবেন? কুকুর অন্ধক ভোজ বৃষ্ণি সাত্বত—অগণিত যাদব শাখা। প্রত্যেক শাখার এক একজন মুখ্য নায়ক আছেন তিনিই সেই শাখার অধীশ্বর—প্রজাদের নির্বাচন মত পদাধিকার পেলেও ক্ষমতায় তিনি সামন্ত রাজার সমান। নিজ নিজ গোষ্ঠীসংঘের সর্বেসর্বা তিনিই। আবার সমস্ত সংঘের উপরে একজন সভাপতি থাকেন, বলতে গেলে তিনিই যাদবকুলের রাজা। তবে রাজতন্ত্রের সঙ্গে তফাৎ এইটুকু যে তাঁর পদ জন্মগত নয় প্রজাদের নির্বাচিত মুখপাত্র তিনি। কংস অবর্তমানে যাদবকুলের সংঘাধিনায়ক কে হবে? জরাসন্ধকে সম্রাট পদবী দিয়ে কংস, কামরূপরাজ ভগদত্ত, সৌভপতি শাল্ব সিন্ধু সৌবীরের রাজ, বিদর্ভপতি ভীষ্মক কালযবন ইত্যাদি পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়েরা একচক্রে হাত মিলিয়েছিল। জরাসন্ধের নেতৃত্বে পৃথিবী জয় করে পরস্পরে ভাগ করে নেবে এমনি ছিল পরিকল্পনা। অকস্মাৎ অন্যতম এক প্রধানের পতনে চক্রবর্তীরা রুষ্ট হবেন নিশ্চই। মহাযুদ্ধ আসন্ন, সে বিপদে মহাবীর কৃষ্ণ-বলরাম ছাড়া যাদবকুলকে আর

*কিংবদন্তী বলে—যদুবংশীয় দেবমীঢ়ের ক্ষত্রিয়া পত্নীর সন্তান শূর, বৈশ্যাপত্নীর সন্তান পর্জন্য। শূরের ছেলে বসুদেব, পর্জন্যের ছেলে নন্দ। শূর ও পর্জন্য বৈমাত্রেয় ভাই সুতরাং নন্দ-বসুদেবের খুড়তুতো-জেঠতুতো ভাই সম্পর্ক।

কে রক্ষা করবে? সবাই তাঁকে রাজপদবী দিতে চায় বুঝে শ্রীকৃষ্ণ প্রস্তাব করলেন—"আর্য উগ্রসেন মথুরামণ্ডলের রাজপদ গ্রহণ করুন। পিতা হয়েও পুত্রের অনাচারের প্রতিবাদ করায় কারাবরণ করতে হয়েছিল যাঁকে, সাধুতা ও মহানুভবতায় তিনিই আমাদের প্রভু হওয়ার যোগ্য। আমি থাকব তাঁর আজ্ঞাবহ ভৃত্য—সর্বশক্তি দিয়ে তাঁর সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধ করব চিরদিন কিন্তু সিংহাসন নেব না। কুলের জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ পুত্র হয়েও যদু পিতৃ-সিংহাসন অধিকার করেননি। আমি পিতৃপুরুষের সে ঐতিহ্য রক্ষা করতে চাই।" বিপুল অনুমোদনে এ প্রস্তাব গৃহীত হল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে একদিকে যেমন ছেলের হাতে দণ্ড পেতে হয়েছে উগ্রসেনকে অন্যদিকে বিনাদোষে সঙ্ঘের দ্বারাও দণ্ডিত তিনি। বৃদ্ধ বয়সে নয়টি ছেলের শোক সইতে হল তাঁকে। তবু সঙ্ঘের বিরোধিতা করেননি উগ্রসেন। সুতরাং যদুকুলের অধিনায়ক-পদ তাঁরই প্রাপ্য সন্দেহ কি? সুবিবেচক বসুদেবের জনপ্রিয়তা আরও বাড়ল মধুপুরে। উৎসাহের আধিক্যে সদ্য সদ্য যতই অভিনন্দন জানাক মাতুল বধ করে শ্রীকৃষ্ণ যদি রাজপদ গ্রহণ করতেন যাদব-সঙ্ঘ সন্তুষ্ট হত না। লোক-চরিত্রে এটুকু অভিজ্ঞতা শ্রীকৃষ্ণের ছিল।

মহাসমারোহে উগ্রসেন গদিতে বসলেন। কংসের নির্যাতনভয়ে যদুকুলের যেসব শাখা-গোষ্ঠী দেশ-দেশান্তরে পালিয়েছিল তাদের শূরসেনে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা চলতে লাগল। এদিকে কৃষ্ণ-বলরাম ক্ষত্রোচিত উপনয়ন সংস্কার নিয়ে গুরুগৃহে বাসের ইচ্ছায় অবন্তীপুরবাসী সন্দীপণি মুনিকে আচার্য বরণ করে এক বৎসরের জন্য প্রবাসী হলেন। বৎসরান্তে শিক্ষা শেষ করে গুরুদক্ষিণা দিয়ে সমাবর্তন করলেন কৃষ্ণ-বলরাম। এই সময় প্রভাস-তীর্থে শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য লাভ করেন।* ভাগবতকার বলেছেন, মহাসমুদ্রে পাঞ্চজন্য অসুর ছিল—পাঞ্চজন্য

---

*পাঞ্চজন্য কথাটা ঋগ্বেদে অনেক জায়গায় আছে। পঞ্চজন কে তা নিয়ে বিতর্ক আছে। মোটের উপর 'পাঁচজন পঞ্চায়েত' জনসাধারণ বলেই মনে হয়। [পঃ পুঃ দ্রষ্টব্য]

তদঙ্গপ্রভব শঙ্খ। মহাভারতের বনপর্বে পাঞ্চজন্য অগ্নির কথা আছে···তিনজন মহর্ষির সঙ্গে একজন আঙ্গিরস মহাব্যাহৃতি ধ্যান করে পাঞ্চজন্যের দেখা পেয়েছিলেন। পরম পাবক পাঞ্চজন্য তাঁদের পুত্রস্থানীয়। পাঞ্চজন্যের সন্ততিদের মধ্যে যজ্ঞবিঘ্নকারী একদল দেবতার নাম পাওয়া যায়। এই পাঞ্চজন্যের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খের কোনও যোগ আছে কি? মোটকথা, একবৎসর গুরু-গৃহে বাস করে শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিকী জ্ঞান বলক্রিয়া আরও শাণিত হ'ল যেন। ভাগবতকার সান্দীপণির মুখ দিয়ে কৃষ্ণ-বলরামের অতিমানুষী মতির কথা বলেছেন। জড়ের বাধা ছিন্ন করতে হলে অতিমানুষেরও তপস্যা চাই। প্রভাস-তীর্থেই শ্রীকৃষ্ণের জীবনব্যাপী তপস্যার সূত্রপাত—পাঞ্চজন্য লাভ তার সেই তপস্যায় সিদ্ধির প্রথম সূচনা। আবার ওই প্রভাসেই 'যোগেনান্তে তনুত্যাগঃ।'

অবন্তীপুর হতে ফিরে কর্মচক্র প্রবর্তন করলেন শ্রীকৃষ্ণ। সম্মুখে বিরাট কর্মক্ষেত্র, আর্তধরিত্রী লক্ষ-কোটি কণ্ঠে আহ্বান করছে তাঁকে—তিলার্ধ বিশ্রাম নাই আর। অক্রূরকে পাঠাতে হবে হস্তিনায়—পাণ্ডবদের সঙ্গে যোগ স্থাপন করা চাই। মথুরায় পা দিয়েই স্থিত-ধী বাসুদেব লক্ষ্য করেছিলেন মদ-মত্ত কুরু-পাঞ্চালদের সঙ্গে যাদবদের খুব বেশী পার্থক্য নাই। রাম ও কৃষ্ণের অপ্রাকৃত শৌর্যে আশ্বস্ত হয়ে যদুকুল স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে—'সারা ভারতের একছত্র আধিপত্য আমাদেরই হবে। অতীত লাঞ্ছনার শোধ নেবে যদুরা—পুরুবংশ ও ভরত গোষ্ঠীকে হটিয়ে আর্যাবর্তের রাজা হবে যাদবকুল। এই মনোভাবের প্রতিবাদ হিসাবেই আরও রাজাসন ত্যাগ করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। ধর্মবিৎ যদুর সন্তান-সন্ততির একি দুরাগ্রহ? তবে তাঁর ধর্মরাজ্য স্থাপনায় সহায় হবে কে, কারা? পুরুষোত্তমের দিব্যদৃষ্টিতে ভেসে উঠলেন দুর্বাসানুগৃহীতা কন্যা কুন্তী। বসুদেবের যোগ্য সোদরা তিনি। মহানুভবা পৃথার পাঁচটি ছেলেই ভাবী ধর্ম-রাজ্য প্রতিষ্ঠায় শ্রীকৃষ্ণের পদানুবর্তী হতে পারে। লোকের চোখে তারা পাণ্ডুর

শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খ পাঞ্চজন্য—যাকে বলা যেতে পারে Vox populi Vox dei—জনগণের কণ্ঠ দেবতারই কণ্ঠ।—শ্রীঅনির্বাণ

ক্ষেত্রজ পুত্র—বিদ্রূপ ও লাঞ্ছনার পাত্র। কিন্তু তত্ত্বদর্শীর কাছে তাঁরা দেবাবতার, তাঁদেরই মধ্যে এসেছেন সনাতন 'নরঋষি'—নারায়ণের সমপ্রাণ, সখা। সুতরাং কুন্তী ও পঞ্চপাণ্ডবকে জানাতে হবে—মাভৈঃ···আমি আছি তোমাদের পক্ষে। ওদিকে কংসের দুই পত্নী···জরাসন্ধ দুহিতা দুটি পিত্রালয়ে ফিরে গেছে। চরমুখে বার্তা নিতে হবে মগধরাজ কবে যুদ্ধযাত্রা করবেন—মাথুরিকদের রণনীতির পাঠ দিতে হবে। ব্রজবাসী সখাদের নিয়ে গড়ে তুলতে হবে নারায়ণী সেনা—তাঁর ধর্মকে নিজ ধর্ম বলে গ্রহণ করবে তারা, তাঁর ব্রতকে জানবে নিজ ব্রত। নিজের হাতে তাদের যুদ্ধকৌশল শেখাতে হবে—তাঁর নামে চিহ্নিত হয়ে তাঁরই নিজস্ব মুক্তিসেনা হবে গোপকুমাররা। কাজ কি কম আছে? উদ্ধবকে ব্রজে পাঠাতে হবে। যাওয়ার দিন অশ্রুমুখী গোপাঙ্গনাদের বলে এসেছিলেন, আবার আসব। বিদায় দিতে গিয়ে পিতা নন্দকে বলে দিয়েছেন "জ্ঞাতীন্ বো দ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখম্" তোমরা আমার জ্ঞাতি—কর্তব্যের দায় চুকিয়ে তোমাদের কাছে যাব আবার। তারা পথ চেয়ে আছে সে তো বটেই আর তাদের কথা শ্রীকৃষ্ণের আত্মজনেরা জানুক— এও যে একটা কাজ। বনের আড়ালে কি ফুল ফুটেছে একদিন আর্যাবর্তবাসীকে তা বলতে হবে। কে বলবে ব্রজের কথা? পুরুষোত্তম বরণ করলেন উদ্ধবকে।

শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রের দুটি ধারা—একটি মহাভারত অন্যটি ভাগবত। গীতা যেমন মহাভারতের সার, ভাগবতের সার তেমনি উদ্ধব-সংবাদ। মহাভারতে যেমন কৃষ্ণার্জুন, ভাগবতে তেমনি শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বচর উদ্ধব, প্রভুর গোপন কার্যের ভার ছিল উদ্ধবের 'পরে (ভর্তুঃরহস্করঃ)। পুরুষোত্তমকে জানতে হলে অর্জুন ও উদ্ধবের মাধ্যমেই জানতে হয়। দুজনেই তাঁর প্রিয়তম ভক্ত, সখা-পদবাচ্য। এঁদের দুজনের কাছেই অন্তরের ঐশ্বর্য উজাড় করে ঢেলে দিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু দুটি ভক্তের মধ্যে সূক্ষ্ম একটা ভেদ আছে। অর্জুনকে সব সময় মান দিতেন শ্রীকৃষ্ণ—সমতুল্য মনে করতেন···'অর্জুনের সঙ্গে যেন আমার নিত্য-প্রণয় থাকে' খাণ্ডবদাহনকালে ইন্দ্রের কাছ থেকে শ্রীকৃষ্ণ এই বর

চেয়ে নিয়েছিলেন। এতেই অর্জুনের মহিমা বোঝা যায়। 'অর্জুনের নিজেরও এমনি একটা প্রতি-স্পর্ধার ভাব ছিল—ধর্মসংমূঢ়চেতা হয়েও আমি তোমার প্রপন্ন শিষ্য' এর বেশি নামতে পারেননি অর্জুন। তিনি সত্যই বাসুদেবের সখা—সম্বন্ধে তো ভাই-ই ছিলেন, আত্মসমা সুভদ্রাকে তাঁর হাতে দিয়ে সম্বন্ধগৌরবটি শ্রীকৃষ্ণ আরও পাকা করে দিয়েছিলেন। দাস্যভাবের দীনতা অর্জুনের মধ্যে কম, বরং মধুরারতির দিকেই মন উঠে গেছে তাঁর। বিশ্বরূপ-দর্শন অধ্যায়ের দাবিটি চমৎকার—বিরাট পুরুষকে দেখে ভয়ে প্রাণ কাঁপছে তবু "পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম॥" ১১।৪৪। ভাগবতের দ্বিজকুমারানয়ন অধ্যায়ে (১০।৮) অর্জুনের প্রবল আত্মপ্রত্যয়ের ভাব পরিস্কার ফুটে উঠেছে ঃ—"নাহং সঙ্কর্ষণো ব্রহ্মন্ নঃ কৃষ্ণঃ বার্ষ্ণিরেব চ। অহঞ্চৈ বাজুর্নো নাম গাণ্ডীবং যস্য বৈ ধনুঃ॥" ব্রাহ্মণ! আমার ত্র্যম্বক-তোষণ বীর্যকে আপনি অবজ্ঞা করবেন না। সদর্পে এসব বলেও ব্রাহ্মণের কাছে নিজের কথা রক্ষা করতে না পেরে গাণ্ডীবী শেষে অগ্নিপ্রবেশ করতে গেলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণই বাধা দিলেন তাঁকে, সখে 'মাবজ্ঞাত্মানমাত্মনা', নিজেকে ছোট ভেবনা অর্জুন। তোমার নিন্দা সে তো আমারই নিন্দা! এস আমি তোমার প্রতিশ্রুতি সত্য করিয়ে দিই। 'শ্রীকৃষ্ণ যা করতে পারেন নি আমি তা করব' অর্জুনের এ স্পর্ধায় ভগবান অসন্তুষ্ট নন। বরং শেষকালে নিজে উদ্যোগী হয়ে সখার বাক্য সত্য করলেন এবং অর্জুনকে শোনালেন ভূমাপুরুষ স্তুতি করে তাঁদের দুই সখাকে বলছেন 'তোমরা পূর্ণকাম নর-নারায়ণ ঋষি'। হে ঋষভদ্বয়! লোকসংগ্রহের জন্য তোমরা ধর্মাচরণ করে চলেছ।"

উদ্ধবের ভাবটি কিন্তু দাস্যপ্রধান। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে দয়িত সখা বললে কি হবে তিনি নিজেকে তাঁর ভৃত্য, তাঁর প্রসাদভোজী কিঙ্কর মনে করেই সুখ পেতেন। কাজে-কাজেই আধ্যাত্মিকতার দুটি বিভাবের মধ্যে অর্জুনের জন্য বিশেষ করে জগদ্ধিত-ব্রতের ব্যবস্থা, উদ্ধবের লক্ষ্য আত্মনো মোক্ষঃ। ব্রজলীলার অধ্যায় অর্জুনের অগোচর ছিল না কিন্তু তাঁর সখা নিজেই তাঁকে যুধ্যস্ব বলে কুরুক্ষেত্রে

ঠেলে দিয়েছেন। ক্লৈব্য তোমায় মানায় না বলে অর্জুনের খসে-পড়া গাণ্ডীব আবার তুলে দিয়েছেন হাতে। এদিকে প্রভুর কর্মজীবনের নিত্যসহচর হলেও উদ্ধবকে পুরুষোত্তম নিজেই পাঠিয়ে দিয়েছেন ব্রজের পথে। উদ্ধব তাঁর পতিতাকে কৃপা করার সাক্ষী। যেখানে তিনি দীনবন্ধু প্রেমের ঠাকুর ছাড়া আর কিছুই নন্ উদ্ধব তাঁর সেই দিকের পরিচয়টি নিবিড়ভাবে জানবার সৌভাগ্য পেয়েছিলেন। অর্জুন ও উদ্ধব দুজনেই জানতেন তাঁদের সখা 'কেবলং জ্ঞানমূর্তি''ও নন্, শুধু আনন্দময়ও নন্।—গোলোকে যিনি আছেন সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহরূপে তিনিই এসেছেন ভূলোকে। তাঁর ইচ্ছাতেই দুটি ভক্তোত্তমের জীবনে দুই সুরের প্রাধান্য —এইমাত্র।

পরবর্তী বৈষ্ণবরা যাই বলুন না কেন,—ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের সমন্বয় ঘটেছিল বলেই শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসদেবের কাছে পূর্ণ পুরুষ। ব্রজবধূরা তাঁকে বলছে 'বিত্তর বীর' ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যেই তারা তাঁর অশুল্কেদাসিকা বিধিকরী কিঙ্করী। আবার শতসমরবিজয়ী শৌরি বাসুদেবকে আর্যাবর্তের মেয়েরা একবিন্দু সমীহ করছে না এমন ছবিও আছে। দ্বারকা প্রবেশ করছেন শ্রীকৃষ্ণ—বারমুখ্যা ও আচণ্ডাল পুরবাসী ছুটে আসছে তাঁকে দেখার জন্য; তিনি যার যেমন প্রাপ্য তাঁকে তেমনি সম্ভাষণ করছেন। ঐশ্বর্যের মধ্যেও কি মাধুর্য ফুটে উঠেছে ব্যবহারে! অর্জুন ও উদ্ধব তাঁর দুটি দিকই জেনে অধিকারানুযায়ী একতরকে বেছে নিয়েছেন, অথবা প্রভুই বেছে নিতে বাধ্য করেছেন।

অক্রূরের মতই শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরাবতার বলে বিশ্বাস করেছিলেন উদ্ধব। বুদ্ধিতে বৃহস্পতি তিনি, মধুপুরীর কর্মকোলাহলের মধ্যে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে ওই তরুণ দেবতাকে অহোরাত্র লক্ষ্য করতেন। যত দেখেন ততই নুয়ে পড়েন মনে মনে। এই তো! একেই বলি ভগবান্···'মানুষে এমন গুণ কভু না দেখিএ।' যেমন রূপ তেমনি অদ্ভুত মহিমা—একাধারে এত গুণ মহাপুরুষেও মেলে না।

সত্যং শৌচং দয়া ক্ষান্তিস্ত্যাগঃ সন্তোষ আর্জবম্।
শমো দমস্তপঃ সাম্যং তিতিক্ষোপরতিঃ শ্রুতম্॥

জ্ঞানং বিরক্তিরৈশ্বর্য্যং শৌর্য্যং তেজো বলং স্মৃতিঃ।
স্বাতন্ত্র্যং কৌশলং কান্তির্ধৈর্যং মার্দবমেব চ ॥
প্রাগল্‌ভ্যং প্রশ্রয়ঃ শীলং সহ ওজো বলং ভগঃ।
গাম্ভীর্য্যং স্থৈর্য্যমাস্তিক্যং কীর্ত্তির্মানোঽনহঙ্কৃতিঃ ॥
এতে চান্যে চ ভগবন্ নিত্যা যত্র মহাগুণাঃ।
প্রার্থ্যা মহত্ত্বমিচ্ছদ্ভির্ন বিয়ন্তি স্ম কর্হিচিৎ ॥—ভাঃ, ১৷১৬৷২৭৷৩০

অগণিত যদুগোষ্ঠীর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ যখন উদ্ধবকেই বিশেষ করে তাঁর কর্মসচিব হিসাবে গ্রহণ করলেন সাধুচরিত্র উদ্ধব আরও নিঃসংশয়ে বুঝলেন কি গভীর অন্তর্দৃষ্টি এঁর। স্তুতিনতিতে যাদবদের কেউ কম যায় না···কংসারির স্তাবক সকলেই, ভক্তিতে না হোক ভয়ে তো বটে। কিন্তু এতজনের মধ্যে উদ্ধব যে সত্যই তাঁকে ভালবেসেছে কেমন করে বুঝলেন উনি? ভাবের ভাবুকের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হতে বেশি সময় লাগে না। অল্পদিনের মধ্যেই ব্রজ-প্রসঙ্গ হল। যাঁকে স্বয়ং ভগবান ভেবেছিলেন তাঁর মুখে গোপকুমারীদের প্রেমের মহিমা শুনে উদ্ধবের বড় অবাক লাগে। সে কেমন ভালবাসা যে এই দেবমানব কোনমতেই ভুলতে পারছেন না তাঁদের? ইনি বলছেন, "সখা! 'তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণা মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ···" একবার চোখে দেখতে পারলে মন্দ হত না। শেখা যেত, কিরকম ভালবাসায় বাঁধা পড়েন পুরুষোত্তম। তাঁর চিত্ত উন্মুখ হওয়া মাত্রই শ্রীকৃষ্ণ দৌত্যের ভার দিলেন তাঁকে—"যাও উদ্ধব! আমার বাবা-মাকে, মদাত্মিকা গোপিকাদের আমার বার্তা দাও গিয়ে।" মনে মনে বললেন—'গোপীদের সঙ্গে পরিচয় না হলে আমায় পুরোপুরি চেনা যায় না। অথচ উদ্ধব আমায় না চিনলে ভাগবত-ধর্ম প্রসার লাভ করবে কি করে? উদ্ধবের ব্রজে যাওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।'

সন্ধ্যার মুখে গোকুলে এলেন উদ্ধব। কর্মব্যস্ত ব্রজবাসী যে যার গোষ্ঠে কাজ করছে···রাজবাড়ীতে কে এল এ খোঁজ নেওয়ার সময় তখন নয়। গোপরাজ নন্দ আদর করে অতিথিকে ঘরে তুললেন। কৃষ্ণসখা উদ্ধব—সে-ও যে নন্দ-যশোদার

আর এক গোপাল। বিশ্রামাদি সৎকারের পরই গোপালের কথা উঠল। 'ব্রজে কি আর সে আসবে উদ্ধব? তার কথা নিয়েই বেঁচে আছি আমরা। যেদিকে চাই সেদিকেই তার কীর্তি। সেসব যখন ভাবি, মনে হয় গর্গাচার্যের বাণী—'দেবকার্যের জন্য পৃথিবীতে এসেছে রাম-কৃষ্ণ।' শতমুখে কৃষ্ণলীলা কীর্তন করতে করতে গাঢ় উৎকণ্ঠায় গলা ধরে এল ব্রজরাজের। যশোমতী প্রথম থেকেই কাঁদছিলেন, একটা কথাও বলেননি। ভক্তির আবেগে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে উদ্ধবের, ভারি আনন্দ হয় তাঁর। দিব্য শিশুটিকে মনে মনে প্রণাম করেন বারবার। কিন্তু গোপদম্পতি এত কাতর হয়ে পড়ছেন কেন? তাঁকে পরমপুরুষ জেনেও কিসের এ অধীরতা? উদ্ধব সান্ত্বনা দিয়ে তত্ত্বোপদেশ শোনান নন্দ-যশোদাকে। হাজার হলেও গোপ বই তো নয়। এঁরা যে কি সৌভাগ্যের অধিকারী, অজ্ঞানতার দরুণ তা ঠিক ধারণা করতে পারছেন না ভেবে কষ্ট হয় উদ্ধবের।

তিনি বলতে লাগলেন—"প্রভুর প্রতি আপনাদের অনুরাগ দেখে মনে হচ্ছে আপনারা আমার মাননীয়। কৃষ্ণ-বলরামই তো 'বিশ্বস্য বীজযোনি'—তাঁরাই তো অখিলগুরু। যোগীজন অন্তকালে তাঁদের স্মরণ করেই পরমধামে চলে যান। শ্রীকৃষ্ণরূপী নারায়ণের প্রতি যখন আপনাদের মনে ভাবনিষ্ঠা জন্মেছে, আর কি চাই? 'কিং বাবশিষ্টং যুবয়ো স্বকৃত্যম্?' তিনি কবে আবার ব্রজে আসবেন জানবার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন আপনারা। আসবেন বৈ কি—অল্পদিনের মধ্যেই আসবেন। তিনি যখন বলেছেন 'আসব'—তাঁর কথা মিথ্যা হবে না। কিন্তু হে মহাভাগ! তাঁকে দূরে ভাবাটাই কি ভুল হয় না? তিনি তো হৃদয়মধ্যে নিরন্তর বিরাজ করছেন। তাঁকে নিজেদের স্নেহের ধন ভেবে কেন এত কষ্ট পাচ্ছেন? তাঁর প্রিয়া-প্রিয় নাই, আপন-পর নাই, তিনি নিরঞ্জন।

'ন মাতা ন পিতা তস্য ন ভার্য্যা ন সুতাদয়ঃ।
নাত্মীয়ো ন পরশ্চাপি ন দেহো জন্ম এব চ॥'

তত্ত্ব বুঝে অহন্তা-মমতার ভ্রম ত্যাগ করুন। তিনি কি কেবল আপনাদের আদরের দুলাল !

'যুবয়োরেব নৈবায়মাত্মজো ভগবান্ হরিঃ।
সর্ব্বেষামাত্মজো হ্যাত্মা পিতা মাতা স ঈশ্বর ॥'

"—তিনি যে বিশ্বব্যাপী ভুমা পুরুষ, তিনি যে সকলের।"

বাৎসল্য-সিদ্ধ নন্দ-যশোদার কাছে উদ্ধব-ও একটি শিশু। 'অমৃতং বালভাষিতম্' মনে করে বাপ-মা যেমন সস্নেহ প্রশ্রয়ে সন্তানের কাকলী শোনেন তেমনি তাঁরাও উদ্ধবের কথায় কোনও প্রতিবাদ করলেন না। জানেন, বড় হলে ছেলে আপনিই তার ভুল বুঝবে। তাছাড়া, উদ্ধব যা বলছেন সে-ও তো কোনও অপ্রিয় কথা নয়। তাঁদের গোপালেরই ব্যাখ্যান হচ্ছে—ও-সবও তো খাঁটি সত্যি কথা। ভাগবত নিজের ভাবে অন্ধ হয়ে চোখে-কানে ঠুলি পরে থাকতে চান না। তাঁরা মৌমাছির মত যেখানে যতটুকু ঈশ্বর-কথা মেলে তার সার সঞ্চয় করেন ভাণ্ডারে। জানেন, গোপালের ইতি করা যায় না, কত জনে কত ভাবে তাকে জেনেছে···আগ্রহ করে সেসব শোনেন ভাগবত।

রাত ভোর হয়ে এল। উদ্ধব তখনও জানেন না, পরমহংসও কেঁদে বলেন 'আয় বাপ, বাপ—খা রে! নে রে! কবে তোকে খাইয়ে জন্ম সফল করব! তুই আমার জন্য দেহ ধারণ করে নররূপে এসেছিস'।* ব্রহ্মজ্ঞানের পরেও যে মহাভাবের হাত থেকে রেহাই মেলে না, বরং লীলানন্দে স্বরূপ বিস্মৃত হওয়ার আকুতি থাকে, উদ্ধবের তা অজানা। নন্দ-যশোদাকে আশ্বাসিত করতে পেরেছি ভেবে ব্যগ্র উৎকণ্ঠায় গোপীদের সঙ্গে মিলবার অবসর খোঁজেন উদ্ধব। প্রভু বলেছেন—'তারা আমার বিরহে জীবন্মৃত হয়ে আছে, তুমি তাদের সান্ত্বনা দিও, বুঝিও।' কিছু জ্ঞানের বুলিও শিখিয়ে দিয়েছেন প্রিয়সখাকে।—উদ্ধব তো জানতেন না তাঁর প্রভু শাঁখের করাতের মত দুদিক কেটে চলেন। গোপীদের জ্ঞানদানের ছলে উদ্ধবের দৃষ্টি খুলে দেওয়া তাঁর অভিপ্রায়। উদ্ধব ভাবছেন—

* কথামৃত, ৪র্থ ভাগ, পৃঃ ২৪৪

'আহা! কি বৈষ্ণবী মায়া। চোখের সামনে তাঁর দিব্যবিভূতি দেখেও অবোধিনীরা হা-হুতাশে মরছে। প্রভুর কৃপায় ওদের যেন আমি ভাল করে উদ্বোধিত করতে পারি।'

ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠে ঘরের কাজ সারে ব্রজবাসিনীরা। উদ্ধব বিমুগ্ধ হয়ে শোনেন দধিমন্থন। পশরা সাজানোর ফাঁকে ফাঁকে গোপিনীরা 'উদ্‌গায়তী অরবিন্দলোচনম্'—ব্রজের ঘরে সেই একজনের প্রসঙ্গ। কঙ্কণ-চন্দ্রহারের ঝঙ্কার তুলে কেউ গাইছে—

"দেইখা আইলাম সখি, দেইখা আইলাম তারে।
এক অঙ্গে অত রূপ নয়নে না ধরে॥
বান্ধ্যাছে বিনোদ-চূড়া নব-গুঞ্জা দিয়া।
উপরে ময়ূরপাংখা বামে হেলাইয়া॥"

কেউ বা ভাঙা-গলায় মিষ্টি করে সুর ধরেছে—

"কালিয়া বরণখানি চন্দনে মাখা।
আমা হৈতে জাতি-কুল নাহি গেল রাখা॥"

উদ্ধবের জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি তরল হয়ে যেতে চায়—চোখে জল আসে। তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সেরে নন্দভবনের বাহির-দুয়ারে এসে দাঁড়ান। সূর্য উঠছে তখন।

রথের চারদিকে ভিড় জমে গেছে এরই মধ্যে। মেয়েরা এ-ওকে শুধাচ্ছে—কে এল গো? কার রথ?' কটূ মন্তব্য চলছে জনান্তিকে—'অক্রূর নাকি রে? একবার এসে তো বড় উপকার করে গেছেন। আবার কেন? 'আমাদের মাংস দিয়ে কংসের বার্ষিক শ্রাদ্ধ করবেন বুঝি?' কথাগুলো উদ্ধবের কান এড়াল না। হাসিমুখে ওদের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন তিনি।

গোপবালারা সবিস্ময়ে ফিরল তাঁর দিকে। কে এই সুদর্শন? ঠিক তাঁর মত বেশভূষা। কোথা হতে এল? কার অনুচর? পরস্পর মৃদুস্বরে বলাবলি করে সকলে। আত্মপরিচয় দিয়ে উদ্ধব শোনালেন ভর্তার অভিজ্ঞান—প্রভু বলেছেন—'গোপিকারা সব ছেড়েছে আমার জন্য, আমিই তাদের শ্রেষ্ঠ দয়িত।'

হাসি ফুটল ব্রজবালাদের মুখে। শিষ্টাচারান্তে উদ্ধবকে নির্জনে ডেকে নিয়ে গেল তারা। কত কথা বলবার আছে, কত যে শোনবার আছে।

দশম স্কন্ধের 'উদ্ধব-প্রতিযান' অধ্যায়টি মাথুরের প্রাণ। প্রেমভক্তির অধিকারিণী গোপিকাদের কাছে জিজ্ঞাসু উদ্ধবের কৃষ্ণপ্রেমে দীক্ষা হয়েছিল। ভাগবতকার খুলে বলেননি কিছুই—পরমরসিকের মত পাঠকের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। তার ফলে বৈষ্ণবমাত্রেই ওর প্রতিটি শ্লোকে অগণিত না-বলা কথার সন্ধান পেয়েছেন।

নিভৃতে এসে উদ্ধবকে মুখ খোলার অবসর না দিয়েই ব্রজবালারা অভিমানে ফেটে পড়ল—"আপনি যা-ই বলুন না কেন, আমরা জানি, যদুপতি তাঁর পিতা-মাতার সংবাদ নেওয়ার জন্যই আপনাকে পাঠিয়েছেন।"

'অন্যথা গোব্রজে তস্য স্মরণীয়ং ন চক্ষ্মহে।'

'আমরা? আমরা তো তাঁর নিতান্তই পর। পরের সঙ্গে প্রণয়বন্ধন হয় স্বার্থে···উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলেই মৈত্রী ফুটে যায়। ভ্রমর যেমন ফুলের মধু খেয়ে উড়ে যায়, নারীদের সঙ্গে পুরুষের সম্প্রীতি সাধারণতঃ তেমনই অন্তঃসারশূন্য। গণিকারা নির্ধনকে ত্যাগ করে, নিঃস্ব প্রজাকে রাজা বিদায় দেন, অধীতবিদ্য শিষ্য গুরুকে ছেড়ে যায়। আবার দেখুন, ফল ঠুকরিয়ে রস খেয়ে পাখি সে ফল ফেলে দেয়। একরাত্রির বাসস্থান অতিথি মনে রাখে কি? মৃগপক্ষী দগ্ধারণ্য ছেড়ে যায়—'জারা ভুক্তা রতাং স্ত্রিয়ম্।' তিনিও তেমনি আমাদের ফেলে চলে গেলেন।"

বলতে বলতে চোখে আঁচল দিল মেয়েরা, উদ্ধব চমকে উঠলেন। মালোপমার মধ্যে শেষ উপমাটিই চরম। তাঁর প্রভুকে এমন কটূক্তি কেউ করতে পারে উদ্ধবের ধারণা ছিল না। তাঁর উপরে এদের এত দাবী? এতদূর ঘনিষ্ঠতা তাঁর সঙ্গে? নাকি এ গ্রাম্যনারীর স্বভাব-চাপল্য?

কিন্তু ক্ষণ পরেই সে-ভুল ভেঙে গেল। গূঢ়ার্থদর্শী উদ্ধব স্তব্ধ হয়ে দেখতে লাগলেন, এইমাত্র যাকে অন্তঃসারশূন্য স্বার্থসন্ধ বলে গাল দিল তার কথা বলতে

গেলে বাহ্যজ্ঞান বিস্মরণ হয়ে যায় গোপিকাদের। উদ্দীপ্ত মহাভাবে গোবিন্দকে স্মরণ করে হাহাকার করতে লাগল সেইসব মেয়ে। তারা কি জানে না—কে তিনি? হীনচেতা সামান্য মানুষ মনে করে শ্রীকৃষ্ণকে? তা নয়, তা নয়, তারাই শতমুখে কৃষ্ণকীর্তি খ্যাপন করে বুঝিয়ে দিতে লাগল—তাঁকে পরমপুরুষ জেনেই আত্মনিবেদন করেছিল গোপাঙ্গনারা। তিনি যে ভগবান্ সেকথা উদ্ধব আর নতুন করে ওদের কি বলবেন? ওরা সব জানে—জানে বলেই বড় বিশ্বাস করেছিল। ভেবেছিল—এইবার তীরে এসে লেগেছে তরী, দুঃখসাগরের কূল পেলাম এতদিনে। তা তো হল না,—সে যে এমন করে ছেড়ে যাবে, আগে কেন জানায়নি? কেন বলল না—চিরদিন আমি তোমাদের থাকব না। কেন সর্বনাশ করল? 'আমার একূল ওকূল দুকূল গেল।' চিন্তামণি পেয়ে হারালাম—এ দুঃখ আমরা সইব কেমন করে?

'ত্যক্তলৌকিকাঃ', লোকব্যবহার ছেড়ে, 'গতহ্রিয়ঃ' 'লজ্জাশূন্য' হয়ে গোপীকারা যখন উদ্ধবের কাছে অকপটে প্রাণের কথা খুলে বলল, তখন চোখের ঠুলি খসে পড়ল তাঁর। কাদের কাছে 'কৃষ্ণতত্ত্ব' উপদেশ করতে চান তিনি? উদ্ধব জানেন দেবতার একদেশমাত্র···এরা জানে তাঁর পুরোপুরি পরিচয়। শ্রীকৃষ্ণকে উদ্ধব জানেন মায়া-মনুষ্য বলে···গোপীরা জানে তিনি একাধারে দেবতা ও মানব, তাছাড়া আরও কত কি! শ্রীকৃষ্ণের মানুষাচারগুলি উদ্ধবের কাছে লীলা। কিন্তু গোপিকার কাছে সেগুলিও সত্য, সে-ও তাঁর একদিক। তিনি কি শুধু সৎ নাকি? তিনি সদসৎ দুই-ই—এবং 'সদসৎ' সংজ্ঞাটা কেবল দার্শনিক অর্থে নয়, লৌকিক অর্থেও সত্য। দোষ-গুণ দু-ই আছে দেবমানবের, তিনি কেবল যে 'পরমসুখদম্' তা নয়, দুঃখ দিতেও কসুর করেন না। উদ্ধব ভাবেন—দুঃখ দিলেও ভোলা যায় না তাঁকে? এমন অনুরাগ জ্ঞানহীনা ব্রজবালারা পেল কোথায়? ওদের কথাতেই নিজের প্রশ্নের জবাব পান। কে বলে জ্ঞান নাই ওদের?* তাহলে ব্রহ্মহ্রদে ডুব দিয়ে

* "গোপীদেরও ব্রহ্মজ্ঞান ছিল। কিন্তু তারা ব্রহ্মজ্ঞান চাইত না। তারা

[পঃ পৃঃ দ্রষ্টব্য]

বৈকুণ্ঠদর্শনের অধিকার পেল কেমন করে? ব্রজবাসীরা তাঁর স্বরূপ জেনেছিল, তবেই না রাসলীলা! কিন্তু তত্ত্ব জানার পরও এ সহজ ভাব থাকে কি করে? নন্দমহারাজকে বরুণালয় হতে উদ্ধার করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, যশোদাকে দেখিয়েছিলেন বিশ্বরূপ। তবু কেন 'আমার গোপাল' বলে ব্যাকুলতা? সম্ভ্রম হয় না? গোপীরা বুঝিয়ে বলে না তো—কেন হবে? তাঁর ভগবত্তা সম্বন্ধে যতই নিঃসংশয় হয়েছি ততই তাঁকে আরও আপন, আরও নিজ জন মনে হয়েছে। সংসারের সবই তো মায়িক সম্পর্ক, 'মুদলে আঁখি সকল ফাঁকি।' কিন্তু তাঁর সঙ্গে তো দুদিনের সম্বন্ধ নয়, তিনি যে আমাদের 'বন্ধুরাত্মা।' তাঁর উপরে মায়া পড়বে না, তাঁর জন্যে কেঁদে মরব না তো থাকব কি নিয়ে? আর আমাদের কে আছে উদ্ধব? তিনি যে আমাদের সর্ব্বস্ব। অন্তরের জ্বালায় তাঁকে কখনও কখনও 'শঠ' 'কিতব' 'কুহকী' না বলে পারি না। কিন্তু মনে জানি—

"শ্যামাদন্যঃ প্রাণনাথঃ নহি নহি মমাস্তি।"

অভিভূত উদ্ধব আর থাকতে না পেরে ব্রজবধূদের পদধূলি নিতে গেলেন তাড়াতাড়ি। পরমহংসদেব বলতেন—"নরলীলায় অবতারকে ঠিক মানুষের মত আচরণ করতে হয়--তাই চিনতে পাবা কঠিন। মানুষ হয়েছেন তো ঠিক মানুষ। সেই ক্ষুধা তৃষ্ণা রোগ শোক, কখন বা ভয়—ঠিক মানুষের মত।" মথুরায় উদ্ধব যাকে দেখে এসেছেন তিনি বাসুদেব—অন্তরে ত্রিগুণাতীত হলেও লোক-

---

কেউ বাৎসল্যভাবে কেউ সখ্যভাবে কেউ মধুরভাবে কেউ দাসীভাবে ঈশ্বরকে সম্ভোগ করতে চাইত।" শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত—৪র্থ ভাগ, পৃঃ ১২৫।

আমরা যতখানি বাগ্‌বিস্তার করলাম ভাগবতকার কিন্তু এত কথা বলেননি। তিনি লিখেছেন—'গায়ন্ত্যঃ প্রিয়কর্ম্মাণি রুদন্ত্যশ্চ গতহ্রিয়ঃ। তস্য সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য যানি কৈশোরবাল্যয়োঃ—।' ১০।৪৭।১০। তারপরেই বলছেন—উদ্ধব পদস্পর্শের উপক্রম করায় কোনও গোপী পরোক্ষে সপ্রণয় তিরস্কার করছেন তাঁকে। গোপীকারা এমন কি বলল বা করল যাতে উদ্ধব একেবারে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গেলেন? কল্পনার অবাধ অবসর দিয়েছেন ভাগবত-রচয়িতা।

সংগ্রহের জন্য বাইরে সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য আশ্রয় করেছেন। গোপীদের আলাপে উদ্ধব বুঝলেন ব্রজের শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন সহজ মানুষ। তবু যে এরা তাঁকে চিনেছে, ভালবেসে দেউলিয়া হয়ে গেছে—এ বড় কঠিন কথা। কত ভাগ্যে এমন 'পরানুরক্তি' জন্মায়? সাধুত্তম উদ্ধবের গোপীপ্রেমে লোভ জাগল, তাই পায়ে হাত দেওয়ার এই আকিঞ্চন।

চৈতন্যদেব নাকি বলতেন—উদ্ধব যাঁর পায়ে হাত দিতে গিয়েছিলেন তিনিই কৃষ্ণাহ্লাদপ্রদায়িনী রাধিকা। ভাগবতকার এখানে ধ্যানপরায়ণা গোপিকাটির মুখে অপূর্ব সুন্দর যে কটি শ্লোক বসিয়েছেন তাতে স্বতঃই মনে হয়, ইনি সাধারণ কেউ নন। কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—

"শ্রীরাধিকার চেষ্টা যথা উদ্ধব দর্শনে।
এই মত দশা প্রভুর হয় রাত্রিদিনে ॥"

ভাগবতের এই দশটি শ্লোকেও অসংলগ্ন চিত্রজল্পের আভাস আছে···যিনি উদ্ধবের সঙ্গে কথা বলছেন তাঁর যেন অর্ধবাহ্যদশা, ঠিক প্রকৃতিস্থ নন। সোজাসুজি উদ্ধবকে সম্বোধন করেননি তিনি একটি ভ্রমরকে লক্ষ্য করেই যেন স্বগতোক্তি চলেছে। আবার মাঝে মাঝে বাহ্যজ্ঞান ফিরে আসছে···বোঝা যাচ্ছে, তাঁর উদ্দিষ্ট দূত উদ্ধবই, ভ্রমর নয়। বাচনভঙ্গিতে গভীর অভিমান আর ভাব-তন্ময়তার উজ্জ্বল রস।

শ্রীকৃষ্ণ-দূতকে সরাসরি কটুভাষা বলতে সৌজন্যে বাধে। তাছাড়া বাক্য প্রকাশের অভিসন্ধিও আছে···দূতকে সম্ভাষণ না করলে তার প্রভুরই অপমান। বিদগ্ধা গোপী তাই বনস্থলীর একটি ভোমরার দিকে চেয়ে বলছেন "মা স্পৃশাঙ্ঘ্রিম্" পা ছুঁয়োনা আমাদের। ধূর্তানুচর! মধুপতির প্রসাদমাল্য সেবা করে তোমার শ্মশ্রুরাজি কুঙ্কুমবর্ণ ধারণ করেছে। মালার কুঙ্কুম তো আমাদের সপত্নীদেরই সৌভাগ্য সূচনা করছে···তোমার সঙ্গে আমাদের কিসের সম্পর্ক বল?' আর সবই ভ্রমরপক্ষে খাটে কেবল শ্মশ্রুরাজির উল্লেখে বোঝা গেল কথার লক্ষ্য উদ্ধবই বটে।

গোপিকার মুখে ভ্রমরধর্মী ভর্তার নিন্দাবাদ শুনে উদ্ধব হয়তো সবিনয়ে কিছু বলেছিলেন, তাই উত্তর হচ্ছে—'পদ্মালয়া কেন তাঁর পাদপদ্ম ছেড়ে যেতে পারেন না বলছ ?

হ্যপিবত হৃতচেতা উত্তমশ্লোকজল্পৈঃ—

এ আর বোঝা শক্ত কি ? তাঁর মন-ভোলান কথায় আটকা পড়েছেন – এই আমরা যেমন। ওহে মধুকর! বৃথাই বনচরীদের কাছে বারবার তোমার যদুপতির গুণগান করছ। মধুনাগরীদের কাছে অর্জ্জুন-সখার প্রসঙ্গ কর গিয়ে —তারা তোমায় পুরস্কৃত করবে।'

শ্রীকৃষ্ণ যে অর্জ্জুনকে প্রিয় সখা বলে বরণ করবেন নারায়ণী সেনার দৌলতে ব্রজবাসীদের ইতিমধ্যেই সে-খবর জানা হয়ে গেছে। সখা-সখী কিছুরই অপ্রতুল নাই তাঁর। তবে আর আমাদের কেন ?

"আমাদের তিনি আজও ভুলতে পারেননি বললেই কি বিশ্বাস করব ? কপটতা রাখ তোমার···এ জগতে কোন্ মেয়ে তাঁর অপ্রাপনীয়া ? তাঁকে দেখে না ভোলে কে ? জানই তো স্বয়ং শ্রী তাঁর পায়ে বাঁধা আছেন, "বয়ং কাঃ ?" আমাদের পক্ষে তাঁর সংবাদ তাঁর নামটুকু শুনতে পাওয়াও দুর্লভ।"

বাগ্মী উদ্ধব কথা খুঁজে পান না···পায়ে মাথা রেখে হয়তো অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে চান।

গোপিকা মধুর ভর্ৎসনায় বললেন—"পা ছাড় উদ্ধব। সখার শিক্ষায় তুমি যে চাটুকারিতা এবং অনুনয় বিনয়ে খুব পটুতা লাভ করেছ সে বেশ বুঝতে পারছি। আমরা তার জন্য সব ছেড়েছিলাম তবু সে আমাদের ত্যাগ করেছে। এরপরও কি সন্ধির আশা রাখ ? ভাব, মিল হয়ে যাবে উভয় পক্ষে ?"

"কার গুণের কথা বলছ ? রাম অবতারে ব্যাধ না হয়েও ঠিক ব্যাধের মতই বালীকে বধ করেছে ও—স্ত্রীর মায়ায় নিষ্ঠুরের মত যাচিকা শূর্পণখার নাসাকর্ণ ছেদন করেছে। জন্মের মত বিরূপা করে দিয়েছে তাকে—একটি মেয়ে বলেও একবিন্দু দয়া করেনি। ফাঁদ পেতে যেমন কাককে বন্দী করে তেমনি করে

বেঁধেছে বলিরাজকে। তার সখিত্বে আমাদের আর প্রয়োজন নাই। যদি বল তবে তোমরা দিনরাত 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কর কেন ? হায় উদ্ধব ! দুস্ত্যজস্তৎ কথার্থঃ। তার কথা কি ভোলা যায় ?"

"তার লীলাকথার কণিকা মাত্র আস্বাদ করেই কতজনের ইহপরকালের বাঁধন ছুটে গেছে। হতভাগ্য গৃহকুটুম্বদের ত্যাগ করে পথের ভিখারী হয়েছে তারা··· বিহঙ্গধর্ম আশ্রয় করেছে। জানি সব, তবু কি ছাড়তে পারি ?"

ঈশ্বরপ্রাপ্তিকে মহাভাগ্য বলেই ভাবতেন উদ্ধব। তাঁকে পাওয়ার যে একটা রিক্ত সর্বহারা দিকও আছে এতকাল হয়তো তা মনে হয়নি। উদ্ধব মানুষ হয়েছিলেন প্রবৃত্তিপরায়ণ কর্মকাণ্ডরত সমাজে। পরমপুরুষ যে বিশেষ করে নিবৃত্তিমার্গের দিশারী আর সে যে কতবড় সর্বনাশের পথ এমন করে চোখে আঙুল দিয়ে কেউ যেন তা দেখায়নি। মুনিঋষিদের সঙ্গ করেছেন উদ্ধব— আত্মারাম আপ্তকাম তাঁরা, তাঁদের দেখলে ভগবদ্ভজনের আনন্দোজ্জ্বল দিকটাই সত্য বলে মনে হয়। কিন্তু পথের শেষে পেঁছাবার আগে কোন নিরাশার মরু কি যন্ত্রণার সাগর তাঁরা পাড়ি দিয়েছেন সে-হিসাব এতদিন মনে ওঠেনি। আজ বৈরাগ্যধূসর সেই বন্ধুর পথ চোখের সামনে ফুটে উঠল যেন।

রূপরম্যা জনপদবধূদের শূন্যহৃদয়ের ছবিটি স্পষ্ট দেখতে পেলেন উদ্ধব। এরাও ওই দুর্গমের অভিসারিকা, সংসারের মাঝখানে থেকেও গৃহকুটুম্বদের ছেড়ে মনে মনে বেরিয়ে পড়েছে ভৈক্ষ্যচর্যায়। দীনা বিহঙ্গী সব, পাখা থাকলে উড়ে যেত অমৃতলোকে···পাখা নাই তবু দুরাগ্রহের ক্ষান্তি কই ? তাই "দীনাঃ বিহঙ্গাঃ"।

গোপী তখন অস্ফুট বিলাপে বলছেন—"ব্যাধের গানে ভুলে হরিণী যেমন কাছে এসে শেষে বাণাঘাতে মরে আমরাও তেমনি সেই কুটিলচেতাকে বিশ্বাস করেছিলাম। তার কথা আর তুল না দূত! ভুলতে দাও তাকে, "ভণ্যতামন্যবার্ত্তা"। বলতে বলতে বুঝি মাটিতে ঢলে পড়লেন গোপিকা···মূর্চ্ছা হল তাঁর।

পরের শ্লোকটি পড়লেই মনে হয়, যেন ভাবস্থা গোপী চোখ মেলে চেয়ে

প্রকৃতিস্থের মত সম্ভাষণ করছেন। এবার কথায় বাহ্যসম্বিতের সুর লেগেছে। বলছেন—"তুমি চলে গিয়েছিলে না? সখা! আবারও বুঝি আমাদের প্রীতম পাঠিয়েছেন তোমায়? কিছু মনে কর না যেন। তুমি যে তাঁর সম্পর্কে আমাদেরও মাননীয়। বল কি চাও? কেন এসেছ?"

বিচলিত উদ্ধব কি বলেছিলেন, 'সখি, তোমাদের আমি মথুরায় নিয়ে যাব। চল আমার সঙ্গে—?

দেখছি গোপিকা করুণ হেসে বলছেন—"কেমন করে নিয়ে যাবে উদ্ধব, কোথায় নিয়ে যাবে?' তিনি যে দুস্ত্যজদ্বন্দ্বপার্শ্বম্"… তাঁর পাশে কি জায়গা খালি থাকে কখনও? আর কেউ নাই-ই থাক, তুমি তো জান লক্ষ্মীদেবী চিরকাল তাঁর বক্ষোবিলাসিনী।"

মর্মার্থ বোধহয় এই যে তিনি এখন নারায়ণাবতার-রূপে লোকপূজ্য—গোপিকারা কেন হৃতমান করবে তাঁকে?

এতক্ষণে যথাবিধি কুশলপ্রশ্ন করবার কথা মনে পড়েছে। সম্পূর্ণ বাহ্যদশায় এসে গোপিকা বলছেন "আর্যপুত্র কি এখন মথুরাতেই আছেন্? তাঁর এই পিতৃগৃহ এখানকার আত্মীয় বন্ধুদের কথা কি কখনও কখনও তাঁর মনে হয়? এই দাসীদের কথা কদাচিৎ উল্লেখ করেন? আবার কবে তাঁর অগুরুসুগন্ধি হাতখানি আমাদের মাথায় বারেক রাখবেন?

উচ্ছ্বসিত উদ্ধব প্রথমেই বললেন—"তোমাদেরই জীবন সার্থক। বিশ্বপূজনীয়া তোমরা,—এমন করে ভগবানকে ভালবাসতে পারে ক'জন? তোমরা যা পেয়েছ মুনিদের পক্ষেও এমন ঈশ্বরপ্রেম দুর্লভ। সমস্ত সাধনভজনের লক্ষ্য হল কৃষ্ণভক্তি…পরমসাধ্য সেই বস্তু তোমাদের আঁচলে বাঁধা। মহাভাগা! তোমাদের বিরহিণী করে প্রভু যেন আমার 'পরেই একান্ত অনুগ্রহ করলেন। তিনি দূরে না গেলে আমি তো এখানে আসতাম না—তোমাদের সর্বাত্মভাবী ভক্তিও দেখতে পেতাম না। তোমরা তাঁর উপরে রাগ করছ, কেন তিনি তোমাদের ছেড়ে গেলেন!

একবার ভেবে দেখছ না আমি এই সুযোগে তোমাদের কায়-মনো-বাক্-সমর্পিত প্রেমের পরিচয় পেয়ে ধন্য হয়ে গেলাম ?”

উদ্ধবের এ কথা কয়টি নিখিল ভক্ত-সমাজেরই মর্মবাণী। মাথুরের মাধুর্যেই ‘গোপীকৃষ্ণবিলাস’ জগৎবাসীর চিত্তহরণ করেছে। শ্রীকৃষ্ণ দূর হতে দূরান্তরে গেলেও যে ব্রজবধূ তাঁর প্রেমে তন্ময়, তাতেই বুঝি—“সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।” ও যে মাটির বুকে আলোকলতা।

উদ্ধবের মুখে শ্রীকৃষ্ণ তদেকচিত্তা গোপিকাদের যে সন্দেশ পাঠিয়েছিলেন তাতেও জড়ের বুকে চিন্ময় বৈদ্যুতী ফুটিয়ে তোলার সঙ্কেত। বিদেহ প্রেমের দীক্ষা দিয়ে তিনি বলেছিলেন তোমাদের মন আরও ধ্যাননিষ্ঠ করে তুলবার জন্যই দূরে এসেছি আমি। সমস্ত মনটুকু কুড়িয়ে আমাতেই আসুক, এই চাই।

“যথা দূরচরে প্রেষ্ঠে মন আবিশ্য বর্ত্ততে।
স্ত্রীণাঞ্চ ন তথা চেতঃ সন্নিকৃষ্টেঽক্ষিগোচরে॥”

“বিমুক্তাশেষবৃত্তি” হয়ে অহোরাত্র আমায় স্মরণ কর, আমাতেই চিত্ত লয় হয়ে যাক। মনে করে দেখ রাসরজনীতে যারা বাইরে আমার সঙ্গে মিলতে পারেনি তারা কেমন করে অন্তরে আমায় পেয়েছিল।

বন্ধুর আদেশ শুনে হরিষে বিষাদ হয় গোপিকাদের। মনে জানে তিনি আমাদের মঙ্গল করতেই চেয়েছেন তবু অভিমান যায় না। উদ্ধবের কাছে সরল ভাবে নিজেদের সংশয় প্রকাশ করে হাসে কাঁদে ভাবিনীরা। মধুনাগরীদের রূপগুণে বাঁধা পড়েছেন তিনি, গ্রাম্যদের সাহচর্য আর ভাল লাগবে কেন ? আর কি ব্রজে আসবেন কোনদিন ? রাজ্য সুহৃৎ রাজকন্যা পেয়ে বনবালাদের মনে রাখবার কি প্রয়োজন ? তাই বলা হয়েছে প্রবাসী দয়িতকে যেমন সর্বদা মনে পড়ে, সে কাছে থাকলে মেয়েদের অতটা তন্ময়তা আসে না। অমরা ভুলে যাব তাঁকে ? যেদিকে চাই সেদিকেই যে রাম-কানাইয়ের স্মৃতি। ভুলতেই তো চাই সেসব—পারি কই ?

"গত্যা ললিতয়োদার হাসলীলাবলোকনৈঃ।
মাধ্ব্যা গিরা হৃতধিয়ঃ কথং তদ্ বিস্মরামহে ॥"

গোপিকাদের কাছে প্রভুর বৃন্দাবনলীলা খুঁটিয়ে শোনেন উদ্ধব। দেখে বেড়ান বনে বনান্তরের লীলাস্থলী। যত শোনেন, যত দেখেন ততই ব্রজভাবের মাধুর্যে মোহিত হয়ে যান উদ্ধব। লোকে যাঁকে মায়াধীশ ব্রহ্মাণ্ডপতি ভাবে, মনে করে দুঃখসুখের অতীত, এরা তাঁকে জেনেছে কাছের মানুষ বলে। গোপী বলে তাঁর সুখদুঃখ হাসিকান্না ক্ষুধাতৃষ্ণা সবই আছে···এবং সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশিই আছে। তফাৎ শুধু এই যে মানুষের মত অনায়াসে দাবি করতে বাধে···তিনি বড় অভিমানী, প্রকাশভীরু, অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর। বিশ্ববাসী তাঁর ঐশ্বর্য আর বিভূতিরই খবর রাখে—বিরাট শক্তির আড়ালে রসসিঞ্চিত যে একটি আশ্চর্য হৃদয় আছে তা কারও চোখে পড়ে না। কেমন করেই বা পড়বে? জগতে হৃদয়হীনের সংখ্যাই তো বেশী। আর অসাধারণ হৃদয়ৈশ্বর্য্যই ব্রজ-পরিবারের নিত্য সম্পদ। এজন্য তাদের কাছে "কৃষ্ণের যতেক লীলা সর্বোত্তম নরলীলা; নরবপু তাঁহার স্বরূপ।" নর-নারায়ণের প্রেমে সিদ্ধিলাভ করেছে গোপগোপীরা। ভগবানও তাই তাদের কাছে সহজ মানুষ, নিতান্ত অন্তরঙ্গ। উদ্ধবকে গোপীরাই এ জ্ঞানদান করল। ক্ষত্রিয় উদ্ধব বিনা দ্বিধায় বলে উঠলেন:—

"বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্ ॥"

কয়েকমাস ব্রজে রয়ে গেলেন তিনি—মথুরায় ফিরতে মন চাইল না।

ওদিকে মধুপুরীতে ভাগবতোজ্জ্বল রসের নূতন একটি ধারা সঙ্গোপনে বইতে শুরু করছে। পথ চেয়ে বসে আছেন কুব্জা···কই? 'আসব' বলে তো তাঁর রাজা আর এলেন না। আসবেন কি কোন দিন? কুব্জার একগুণ সেবার শতগুণ প্রতিদান দিয়ে সরে গেছেন তিনি। দিয়েছেন বহুবাঞ্ছিত রূপলাবণ্য, রাজদত্ত বৃত্তিতে বিত্তশালী কুব্জা—অট্টালিকায় বাস, ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি। বাইরে কোন অভাব নাই কিন্তু অন্তরের রিক্ততা যে যায় না। বৎসরের মত অবন্তীতে

চলে গেলেন শ্রীকৃষ্ণ—একবার মুখের কথাতেও জানিয়ে গেলেন না আমার প্রতিশ্রুতি আমি ভুলিনি। ছিন্নমূল তরুর মত মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন কুব্জা, তাঁর মন বলল আমায় ঘৃণা করেন বাসুদেব। আগুনের তাপে সোনার খাদ যেমন করে পুড়ে যায় কৃষ্ণপ্রেমে তেমনি করে পুড়ে মরে সৈরিন্ধ্রী। কান পেতে যতই শোনে কার হাত ধরে প্রগল্‌ভতা করেছে সে, কোন মহাজনের কৃপাদৃষ্টিতে তার ঐহিক ভোগের ভরা পূর্ণ হয়েছে ততই মরমে মরে যায়। স্বয়ং ভগবান ইনি? কুব্জার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় সেকথা। তাই তো পতিতাকে অত দয়া, তাই না অযাচিত করুণার বিপুল বর্ষণ! কিন্তু শুধুই দয়া আর করুণা? তার বেশী কিছু পাওয়ার আশা কুব্জার দুরাশা বই কি! বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়ানো। কোনদিন কি সাধ মিটবে? অপ্রাপ্য বস্তুতে লোভ করে এ কি হল কুব্জার? তিনি রূপ আর ঐশ্বর্যের ভক্ত ছিলেন এককালে, আজ ভাগ্যবিধাতা দুহাত ভরে সেইসব দিয়ে নীরবে বলে গেলেন, বারনারী তুমি! যা চেয়েছিলে তাই দিলাম। এর বেশী কিছু পাওয়ার যোগ্যতা কি তোমার আছে? কুব্জা চোখের জলে ভেসে মনে মনে বলেন কোন যোগ্যতাই আমার নাই, জানি সেকথা। আমি ঘৃণিতা···পথের কাঙালিনী···তোমার পদস্পর্শ করার অধিকারও নাই আমার। কিন্তু ঠাকুর তোমারও কি পতিতাকে ভালবাসবার অধিকার নাই? তবে কেমন ঠাকুর তুমি? তোমার কৃপা কি এতই দরিদ্র? ছোঁওয়া বাঁচিয়ে দূরে থেকে কেবল দয়াই করবে, কোলে টেনে নিতে পারবে না? স্পর্শমণির ছোঁওয়ায় লোহা নাকি সোনা হয়! তোমার ছোঁওয়া পেলে সৈরিন্ধ্রীও হত ভক্তিমতী তাপসী। তোমার ঔদার্যের অভাবেই বুঝি ভাল হওয়া আমার হল না। অথচ ভাল হওয়ার বুকভরা তৃষ্ণা আমার। দীননাথ কে বলে তোমায়! তুমি তো আমাদের ব্যথা বোঝ না!

অর্থশালিনী হতেই সখিসহচরী জুটেছিল—কুব্জা নিজে বেছে বেছে সেই সব মেয়েকেই কাছে এনে রাখতেন যারা অনিচ্ছায় দেহ বিক্রয় করেছে—অদৃষ্টদোষে বিপথে যেতে বাধ্য হয়েছে। কুব্জার কৃষ্ণানুরাগ তাদের মনেও রং ধরায়, বোঝে অভাগিনী তারা। কর্মফলে দেবতার প্রিয়পাত্রী হওয়ার সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত

হয়েছে। কুলটাকে কোনও মহাপুরুষ দাসীপদও দেন না। তবে কি হবে? এ জীবনে কি আর তাঁর সান্নিধ্য মিলবে না? মথুরা মণ্ডলের আকাশে দুঃখিনী কুব্জার ভজন ভেসে বেড়ায়।

"প্রভু মোরে অবগুণ চিত না ধরো।
সমদরশি হ্যায় নাম তোহারো।"

অনুতাপের দহনে পুড়ে চোখের জলে ধুয়ে কুব্জার মনের ময়লা কেটে যায়। অন্তর্যামীর কাছে সে বার্তা আপনি পেঁছায়।

গোপীদের মুখে প্রেমের ঠাকুরের সম্পূর্ণ পরিচয় জেনে ভরা মনে মথুরায় ফিরে এসেছেন উদ্ধব। তাঁর ভাব দেখেই বাসুদেব বুঝলেন এবার উদ্ধবের কাছে সহজ হওয়া চলবে···ও ভুল বুঝবে না তাঁকে। তখন একদিন বললেন 'একবার কুব্জার গৃহে আমায় নিয়ে যেতে হবে উদ্ধব। আমি তাকে কথা দিয়েছিলাম।'

'সমনস্কঃ সদা শুচিঃ' উদ্ধব ভাবলেন এ তাঁর ভক্তির পরীক্ষা। ব্রজগোপীদের দেখে এসেছেন সদ্য—লোকে তাদের ব্যভিচারদুষ্টা বললেও উদ্ধব জেনেছেন তারাই সতী-শিরোমণি। তারা চিরদিনই যোগিনী···গৃহে থেকেও সন্ন্যাসিনী। কিন্তু কুব্জা? আজন্মবিলাসিনী···অত্যাচারী কংসের প্রিয় অনুচরী···বাসুদেব তার ঘরে যেতে চান কি বলে? মঙ্গল বিধান? গুরুরূপে দূর হতেই কি তা করা যায় না? গোপীদের সম্বন্ধে তো সেই ব্যবস্থাই হয়েছে। তবে কুব্জার উপরে এ-অনুগ্রহ কেন? স্বৈরিণীর ঘরে যাবেন শৌরি বাসুদেব? লোকে বলবে কি? উদ্ধবের জাগ্রত বিবেক গর্জে ওঠে, 'বলুক! যা ইচ্ছা বলুক লোকে। তা বলে তুমিও কি বাসুদেবের অপ্রাকৃত আচরণের বিচার করবে? পাপপুণ্য সদসতের গণ্ডী টেনে তোমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে যেভাবে চল বিরাট পুরুষকেও সেইভাবে চালাতে চাও? এতটুকু একটি কীটও যাঁর পালনীয়, কুব্জাকে কি তিনি ঘৃণা করতে পারেন? চরাচর যে তাঁর বুকে আশ্রয় পায়। তাঁর প্রেমেই জগৎ বেঁচে আছে। নইলে পরস্পরের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষে কোথায় যেতে তোমরা? গ্রাম্য গোপনারী বলে যাদের অবজ্ঞা করেছিলে এই তো দেখে এলে তারাই দুর্লভতম ভক্তি-যোগের

অধিকারী। পতিতা বলে যাকে হীন ভাবছ হয়তো দেখবে এই মথুরায় প্রভুর শ্রেষ্ঠ ভক্ত একা সে-ই।'

উদ্ধবের সংশয়গুলি সম্ভবতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে লুকানো ছিল না। কুব্জার ঘরে যাবার আগে প্রিয়সখার ভুল ভেঙে দিয়েছিলেন তিনি। তাই ভাগবতে দেখছি কুব্জার গৃহে গিয়ে কুব্জার দেওয়া আসন মাথায় ঠেকিয়ে সরিয়ে রেখে মাটিতে বসে পড়লেন উদ্ধব। কুব্জা তাঁর মান্যা···তাঁর দেওয়া আসনে কি বসতে পারেন উদ্ধব? হ্যাঁ মথুরামণ্ডলে ওই সৈরিন্ধ্রী যেমন করে ভালবেসেছে বাসুদেবকে এতখানি আর কেউই দিতে পারেনি। প্রভুর মুখ থেকেই কুব্জারাণীর মহিমা উদ্ধব শুনেছিলেন।

লোকশিক্ষায় অবহিত ভাগবতকার কুব্জার কথা সংক্ষেপে সেরেছেন। কিন্তু একাদশ স্কন্ধে ভগবদুদ্ধব-সংবাদে শ্রেষ্ঠ ভক্তদের নাম করতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গোপীকাদের সঙ্গে কুব্জারও উল্লেখ করতে ভোলেননি। বৈষ্ণব বলেন—সংসারে মণিরত্ন যেমন পথেঘাটে মেলে না কুব্জার অনুরাগও তেমনি সহজলভ্য নয়। এদিকে বৃন্দাবন, ওদিকে দ্বারাবতী, মাঝখানে কুব্জারাণীর আসন। মথুরামণ্ডলের অধিশ্বরী তিনি···তাঁর কৃপা না হলে মথুরারতির সাধনা শুরুই করা যায় না। কুব্জার সাধারণী রতি, অর্থাৎ জীবসাধারণের হৃদয়ে ওই অনুরাগের অঙ্কুর আছে···ত্রিবক্রা যেন আমাদেরই মনের ছবি।

শ্রীকৃষ্ণ যে সত্যই প্রেমের ঠাকুর কুব্জার নিকষে তা যাচাই হয়ে গেছে। কুব্জাকে গ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণকে প্রমাণ দিতে হয়েছিল সত্যই প্রেমসিন্ধু নিত্যলোকের পুরুষ তিনি। কুব্জার ভালবাসাকে তিনি যদি মর্যাদা না দিতেন এ পৃথিবীর কোটি কোটি দুর্ভাগাও শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলে স্বীকার করত না। আছ আছ, সাধু মহাত্মা পুণ্যবানের ঠাকুর আছ তুমি, তাতে আমাদের কি? ইন্দ্রিয়পর দুশ্চরিত্রদের সঙ্গে কি সম্বন্ধ তোমার? কিন্তু ওই যে পতিতার ভালবাসাও ঠেলে ফেলতে পারলেন না তিনি, এতেই কলির মানুষ সাহস পেয়েছে। সমঞ্জসা সমর্থারতি

কোথায় পাব? কিন্তু সাধারণী রতিও তো বাঁধে তোমায়—এই আশ্বাসে কত হতভাগ্যের জীবনের মোড় ফিরে গেছে কে বলবে।

ভাবি মথুরামণ্ডলের কুঞ্চিকা হাতে নিয়ে কে সে কৃষ্ণপ্রিয়া যে হতশ্বাস জনতাকে আশ্বাস দেওয়ার জন্য নিজে কালি মেখেছিল? কুব্জার জীবন আমাদেরই সমষ্টি জীবনের প্রতিরূপ, বড় দুঃখের সে-জীবন। দেবতাকে অবিশ্বাস করি আমরা; ভাবি তিনি থাকুন তাঁর মত, আমি থাকি আমার মত। নাস্তিকের মত শ্রেয়োবিধান দুপায়ে দলে ক্ষণিকসুখের মত্ততায় পাপের কুণ্ডে নেমে যাই। স্পর্ধিত অবহেলায় ভাবি কোথায় ভগবান? যদি কেউ থেকে থাকে হাত ধরুক না এসে, তুলে নিক পঙ্ককুণ্ড হতে। যদি না নেয়, ভাল···প্রবৃত্তির দাস হয়েই থাকব চিরদিন। কিন্তু সে দম্ভ কি থাকে? কোন মাহেন্দ্রক্ষণে দেখা দেন তরুণ রবি···আঁধার পিছনে ফেলে আলোর তৃষায় বুক শুকিয়ে ওঠে। তখন কান্না আর কান্না! যাকে সুদূর ভেবেছিলাম মোহ ভেঙে দেখি কত সহজেই কাছে দাঁড়ান তিনি, হেসে হাত ধরেন। তাঁর শুচিশুভ্র প্রেমধারায় স্নান করেও মনের জ্বালা তো জুড়ায় না। বিবেকের কশাঘাতে জর্জরিত হয়ে ভাবি কায়মনোবাক্যে নিজেকে অর্ঘ্য দেওয়া আমার হল না। যা পেলাম তাই নেবার যোগ্যতা কই? কৃতকর্মের ঘোর ব্যবধান দুজনের মাঝখানে। এ আমি কি করেছি? নিজের হাতে সর্বনাশ করেছি নিজের?

অনুমান করি, মথুরানাথকে ঘরে এনেও গভীর উল্লাসের পরিবর্তে বেদনার গুরুভারে কুব্জার হৃদয় প্রতিমুহূর্তে ধূলায় লুটিয়ে পড়ত। দেবতার প্রতি বিশ্বাস জন্মেছে, সেই সঙ্গে দেখা দিয়েছে আত্মধিক্কার। অন্তরের অগ্নিদাহে ছটফট করতেন কুব্জা। প্রভু তো দু'হাত ভরে দিতেই চান, আমি কোন মুখে নিই? রাজা আমার! আপন দুষ্কৃতিতে তোমাকেও টেনে নামালাম পথের মাঝখানে- -প্রচণ্ড ক্ষোভে কুব্জার কি বারবারই একথা মনে হত না? পুরুষোত্তমের পায়ে হাত রেখে ঊর্ধ্বমুখে তিনি জানতে চাইতেন—'কেন জ্বলে মরছি এমন করে? তোমার ভালবাসাতে শান্তি পাইনে, এ কি অগ্নিদাহ?' শরণাগতাকে

গুরু স্মিতমুখে বলতেন ঃ "আত্মানং বিদ্ধি। নিজেকে জান কুব্জা, সব জ্বালা জুড়িয়ে যাবে।" কুব্জা কেঁদে বলতেন ঃ 'দাসীকে তুমিই জ্ঞানদান কর নাথ! বলে দাও "কে আমি, কেন আমারে জারে তাপত্রয়।" ভক্তবৎসল পরমস্নেহে বলেন, 'বলব বলেই তো এসেছি কুব্জা। আমি যাকে আত্মসাৎ করেছি, তার আবার ভয় কি, ভাবনা কি? তোমার সব মালিন্য আমার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।'

লোকচক্ষুর অন্তরালে অনলস চেষ্টায় আপনাকে গড়ে তোলার সাধনাই কুব্জার জীবনেতিহাস। ভালবেসে ভাল হতে চেয়েছিলেন তিনি, তাঁর মর্মছেঁড়া আকূতি বাসুদেবের অন্তর স্পর্শ করেছিল। পাশে দাঁড়িয়ে মাটিমাখা প্রাণটিকে দিব্যলোকে উত্তীর্ণ হবার তপস্যায় প্ররোচিত করেছেন তিনি। কুব্জার কাছ হতেই ভারতের দীনহীন কাঙালেরা জেনেছে সত্যই মথুরানাথ সমদর্শী···পতিতপাবন অধমতারণ শরণাগতপালক। মথুরার যত অনাথ আতুর অভাগার সহায় ছিলেন কুব্জা, ছিলেন অতি দরিদ্রজনের বান্ধবী···তাঁর দুয়ার এদের জন্য সর্বদাই খোলা থাকত। মহাযুদ্ধের বেড়াজালে মধুপুরী যখন অবরুদ্ধ তখন কুব্জা হয়তো দুই হাতে তাঁর ধনসম্পদ কাঙাল ভিখারীদের বিলিয়ে দিয়েছেন। তাঁর দানশীলতায় কত শত গৃহস্থ দু-মুঠো খেতে পেয়েছে। কুব্জার অসাধারণ জনপ্রিয়তার অবশেষ আজও মথুরায় বেঁচে আছে। মথুরাবাসী কুব্জারাণী ছাড়া আর কাউকে বড় কৃষ্ণচন্দ্রের বামে বসাতে ভালবাসে না। এটা শুধু শুধু হয়নি।

শুধু মানুষের বিচারে নয়, ভগবানের বিচারেও কুব্জার অতন্দ্র সাধনা সিদ্ধ হয়েছিল। তাই কুব্জার গৃহেই ব্রজ-লীলার নব অধ্যায় অভিনীত হল। লোক-প্রবাদ বলে, গোপিকারা তারই ঘরে গোপনে দৌত্য করত···শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করে যেত। মাথুরের পালা কুব্জারই জানা ··মথুরার আর কারও সেদিন এ সৌভাগ্য হয়নি। ব্রজবাসীদের সঙ্গে সৈরিন্ধ্রীর যোগাযোগ স্বভাবের নিয়মেই ঘটেছিল। ভারতের অনভিজাত সমাজ নিঃশব্দে ভাগবত ধর্মকে হৃদয়ে ধারণ করে ভাবী সমাজবিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল।

অমানুষিক ক্ষত্রবীর্যে কুরুপাঞ্চাল সভাতার অভ্রভেদী প্রাসাদ যেন ভূমিকম্পে ধ্বসিয়ে দিলেন বাসুদেব, বজ্রাগ্নির মত ভস্ম করে দিলেন বৈদিক সমাজের আভিজাত্য। সেই শতধাবিদীর্ণ দগ্ধ রুক্ষ মাটিতে নূতন সৃষ্টির ফসল ফলিয়ে মাথা তুলল "কিরাতহূণান্ধ্রপুলিঙ্গপুক্কসা আভীরশুহ্মাযবনাঃ সুশাদয়ঃ।" কুব্জা ও গোপকুল তাদেরই অগ্রদূত, ক্ষাত্রিয় সমাজের চির অবজ্ঞাতদের সঙ্গেই বাসুদেবের পরম হৃদ্যতা। ওদের কাছে তিনি সুদাক্ষিণ, তিনি প্রেমস্বরূপ।

ভারতের রাষ্ট্রজীবনে লোকক্ষয়কৃৎ মহাকালের মতই উদয় হয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। মধুপুরে এসেই দুর্ধর্ষ নারায়ণী সেনা গঠনে মন দিয়েছিলেন। তাঁর কর্মদক্ষতায় শূরসেন প্রদেশে ইতস্ততঃ বিদ্রোহী যাদব সামন্তদের মধ্যে ঐক্যের বাঁধন দৃঢ় হল—উগ্রসেনের অধিনায়কত্ব স্বীকার করে নিল বিভিন্ন যদু গোষ্ঠী। দুর্বিনীতদের কঠোর হাতে শাসন করে আর প্রজাসাধারণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির সর্বাধিক উপায় উদ্ভাবনে মনদিয়ে শ্রীকৃষ্ণ অল্পদিনেই যদুকুলকে বুঝিয়ে দিলেন বন্ধু হিসাবে তিনি যতখানি কল্যাণকারী শত্রু হিসাবে ঠিক তেমনই ভয়ঙ্কর। সত্রাজিৎ শতধন্বা শতজিৎ নিশঠ উল্মুক এমন কি ভক্ত অক্রুরের সঙ্গেও প্রয়োজন বোধে বিরোধ ঘনিয়ে আসে। শৌরি বাসুদেব চান গণতন্ত্রের বিশুদ্ধ আদর্শ মত রাজ্যপালন করুন যদু রাজন্যরা। উগ্রসেনের অধিকারে রাজতন্ত্রের স্বৈরাচার প্রজা পীড়ন চলবে না। যদু মুখ্যরা এতে অসন্তুষ্ট হলে কি হয় সর্বসাধারণের মধ্যে দিনে দিনে জনপ্রিয়তা বাড়ে শ্রীকৃষ্ণের। লোকে বলতে লাগল মথুরাধিপতি যদুনাথ তো বাসুদেবই—উগ্রসেন নামে মাত্র রাজা। হয় তো শক্তি লিপ্সু যাদব সামন্তরা বাসুদেবের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে আর একটা গৃহ বিবাদ বাধাত কিন্তু বহিঃশত্রুর আগমনে দেবকীনন্দনের প্রতিষ্ঠা দৃঢ়মূল হয়ে গেল। খবর এল মগধরাজ জরাসন্ধ বিপুল বাহিনী নিয়ে মথুরা আক্রমণ করতে আসছেন। আতঙ্কে শিউরে উঠল যাদবকুল। ত্রয়োবিংশ অক্ষৌহিণী সঙ্গে? সে কি! রাম-কৃষ্ণের নেতৃত্বে এক হয়ে আসন্ন সংকটের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল যাদব গোষ্ঠী। এখন বাসুদেবই প্রধান ভরসা।

যুদ্ধযাত্রার পূর্বক্ষণে শৌরি যোগারূঢ় হয়ে বলদেবকে বলেছিলেন—

"পশ্যার্য্য ব্যসনং প্রাপ্তং যদূনাং ত্বাবতাং প্রভো।
এষ তে রথ আয়াতো দয়িতান্যায়ুধানি চ ॥
যানমাস্থায় জহ্যেতদ্ব্যসনাৎ স্বান্ সমুদ্ধর।
এতদর্থং হি নৌ জন্ম সাধূনামীশ শর্ম্মকৃৎ।
ত্রয়োবিংশত্যনীকাখ্যং ভূমের্ভারমপাকুরু ॥

কথা গোপন রইলনা। মাথুরিকদের কানে গেল রাম-কৃষ্ণ দিব্যায়ুধ এবং দিব্যবাহনাদি লাভ করেছেন, যোগ শক্তিতে বলীয়ান তাঁরা। অলৌকিক সাহসে বুক ভরে উঠল যদুদের···শার্ঙ্গপাণি নারায়ণ তাদের সেনাপতি, হলধারী সঙ্কর্ষণ পার্শ্বরক্ষক···এ ভুবনে কার সাধ্য তাদের পরাজিত করবে।

তারপরে যা হল তা অবিশ্বাস্য মনে হয়। ভাগবতকার বলছেন—অগ্নিচক্রের মত রণ-ভূমিতে বিচরণ করলেন শার্ঙ্গপাণি। আগুনের হলকায় তুলারাশি যেমন নিমেষে একমুষ্টি ছাই হয়ে যায় তেমনি করে মাগধ সেনা নিঃশেষিত হল। মথুরার মেয়েরা পর্যন্ত প্রাকারে গোপুরমে উঠে কৃষ্ণ বলরামের অদ্ভুত শৌর্য দর্শন করল। কৃষ্ণের ইচ্ছায় বলরাম হাতে পেয়ে ছেড়ে দিলেন জরাসন্ধকে। প্রাণ নিয়ে পালাল মাগধ। বিজয় সমারোহে মথুরা প্রবেশ করে শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসু যাদবদের বললেন, 'আমরা ক্ষত্রকুল সংহার করতে কৃতসংকল্প। জরাসন্ধকে এখনই যদি হত্যা করি একসঙ্গে এত ক্ষত্রিয় পাব কোথায়! উনি দিগ্বিদিক হতে ক্ষত্রিয়দের সংগ্রহ করে আনুন, আমরা তাদের শেষ করি।' যাদবরা সোল্লাসে সিংহনাদ করে। কালে তারাই সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হবে বাসুদেবের ইচ্ছা বুঝি এই-ই —সে ধারণা আরও পাকা হয়।

সতেরো বার বিরাট সৈন্যদল নিয়ে মথুরা অভিযান করলেন জরাসন্ধ— প্রতিবার একা পালাতে হল। ভারতের ক্ষত্রিয় সমাজ স্তম্ভিত বিস্ময়ে ভাবে কে এই বাসুদেব? দেশে-দেশে রটে যায় নারায়ণী সেনা অজেয়···এমন মৃত্যু-ভয়হীন দুর্ধর্ষ বাহিনী আর্যাবর্তে দ্বিতীয় আর নাই।

শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু বুঝেছিলেন আর বেশিদিন এভাবে সম্মুখ যুদ্ধ চলবে না। মথুরাবাসী নাগরিকবৃন্দ যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী ক্ষয়ক্ষতির আঘাতে জর্জরিত। মনোবল নষ্ট হয়ে আসছে তাদের। চারিদিক হতে যখন পুরী অবরোধ করে মাগধী সেনা তখন যমুনার ওপার হতে মহাবনের ফল শস্য দধি দুধের পণ্যই মাথুরিকদের একমাত্র অবলম্বন। ব্রজবাসীরা অর্ধাশনে থেকে মধুপুরে রসদ যোগায়। কতদিন এ ভাবে শোষণ চলবে তাদের উপরে? যদুমুখ্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে গোপনে রাজধানী স্থানান্তরিত করবার আয়োজন করতে লাগলেন বাসুদেব। আবারও পৈত্রিক আবাস ছেড়ে কিছু দিনের মত দূরে পালাতে হবে যদুদের··পৌরব ও ভারতদের অত্যাচারে বারবারই দেশান্তরী হয়েছেন পূর্ব-পুরুষরা, আর একবারও না হয় তাই হল। দুর্ভেদ্য রৈবতক পর্বতের আড়ালে সমুদ্র দুর্গ দ্বারাবতী গড়ে তুলতে লাগলেন শ্রীকৃষ্ণ। দৈব স্থাপত্য বিদ্যা স্বাষ্ট্র-বিজ্ঞান সহায়ে নিজে ওই নগরীর পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি।

ইতিমধ্যে জরাসন্ধের সঙ্গে যোগ দিয়েছে কালযবন, অগণিত ম্লেচ্ছসেনা তার সঙ্গে। কে এই কালযবন তার সঠিক হদিশ আজও মেলেনি। বিষ্ণুপুরাণে দেখি ব্রাহ্মণ গার্গ্য (যদুকুল পুরোহিত গর্গাচার্যের কোনও বংশধর?)-কে যদুগোষ্ঠে তাঁর শ্যালক উপহাস করে বলেছিলেন তুমি নপুংসক। সমবেত যাদবরা হেসে উঠল সেই পরিহাসে। পুরাণের বংশাবলীতে দেখি পুরুবংশের গার্গ্য নামধেয় একটি ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণশাখা ছিল। এ-ও হতে পারে বিষ্ণুপুরাণের এই গার্গ্য কোনও পৌরব ব্রাহ্মণ। ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ বলে যদুবংশের কোনও মেয়েকে বিবাহ করেছিলেন তিনি কিন্তু পুত্রোৎপাদন করেননি। শ্যালকটি সম্ভবতঃ যাদব তা নইলে যদুগোষ্ঠে ভগ্নীপতিকে উপহাস করবেন কেন? বিষ্ণুপুরাণ বলছে অপমানিত গার্গ্য "সুতমিচ্ছংস্তপস্তেপে যদুচক্র ভয়াবহম্।"

গার্গ্যের তপস্যার ফল-ই কালযবন···ব্রাহ্মণের ঔরসে যবনীর গর্ভে তার জন্ম। এ ছেলেটি যদুকুলান্তক হবে জেনে কোন যবনরাজ তাকে নিজ রাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। যবন রাজেরও কি যদুদের প্রতি সুচির পোষিত কোনও দ্বেষ ছিল।

অথবা ভারতে রাজ্যবিস্তারের জন্যই কোনও মহাশক্তিমান তরুণ বীরকে অপুত্রক যবনেশ্বর পুত্র বলে গ্রহণ করেছিলেন ? কিংবদন্তী হতে সঠিক কিছু বোঝা যায় না। তবে এটুকু ঠিক যে যদুগোষ্ঠীর উপরে কেবল পৌরব ক্ষত্রিয় নয় ব্রাহ্মণের রোষও পড়েছিল। ব্রাহ্মণের আমন্ত্রণেই ভারতের মাটিতে যবনের প্রবেশ··· ইতিহাসে এর একাধিক নজির আছে। স্বদেশ-বিদ্বেষী ভারতীয় বিদেশীকে ডেকে আনল ঘরে। একসঙ্গে দুদিক থেকে কালযবন ও জরাসন্ধ মথুরা আক্রমণ করতে আসছে জেনেই বিদ্যুৎ গতিতে রাজ-প্রধানদের দ্বারাবতীতে সরিয়ে দিলেন শ্রীকৃষ্ণ। তারপর বলরামকে মথুরা রক্ষার ভার দিয়ে নিজে কালযবনের সম্মুখীন হলেন। শেষ পর্যন্ত কি করে যে কালযবন ও তার কোটি সংখ্যক ম্লেচ্ছ সেনা ধ্বংস হল, জরাসন্ধের হাত এড়িয়ে কৃষ্ণ-বলরাম কি ভাবে যে নিরাপদে দ্বারকায় পালালেন সে বিবরণ রহস্যাবৃত। এতকাল পরে তো নয়ই, তখনও ভারতবর্ষের লোক এর তথ্যানির্ণয় করতে পারেনি। বেশ কিছুদিন যাবৎ সকলেই জানত জরাসন্ধ পলায়মান রাম-কৃষ্ণকে এক গিরিদুর্গে বন্ধ করে পুড়িয়ে মেরেছেন। হঠাৎ একদিন খবর মিলল কালযবন তো সপরিবারে মরেইছে তার ধনরত্নাদি লুটে এনে রাম-কৃষ্ণ দ্বারাবতীতে সুখে আছেন। 'মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী ?' ভীমকান্তি রৈবতকের আশ্রয়ে সুরক্ষিত আনর্তমণ্ডলে হানা দিতে জরাসন্ধের সাহস হলনা। ভয় পেয়ে যদুরা যে কুরু-পাঞ্চাল সীমান্ত ছেড়ে অপরান্তে পালিয়েছে, আর্যাবর্তের কেন্দ্র হতে উৎখাতিত হয়েছে এই তাঁর বিজয় গৌরব ভেবে তখনকার মত নিরস্ত হলেন মগধরাজ। সহজে যেন যাদবরা আবার দেশের মাঝখানে শিকড় গাড়তে না পারে সেদিকে জরাসন্ধের দৃষ্টি রইল। তাঁর ছত্রচ্ছায়া তলে করূষরাজ বক্র, সৌভপতি শাল্ব, পৌণ্ড্রক, কাশিরাজ, বিদর্ভরাজ ভীষ্মক, চেদিগোষ্ঠী একত্র হয়ে শক্তিশালী অরিমণ্ডল গড়ে উঠল। যাদবশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের প্রতিপক্ষ এরা—যদ কুলের সঙ্গে বিরোধ গৌণ—এরা চাইল নবোদিত মহিমা শৌরি বাসুদেবের বিনষ্টি। জরাসন্ধের তাতে আপত্তি হবার কথা নয়। কারণ বাসুদেবের পতন মানেই যাদবদের বিনাশ।

কিন্তু রৈবতকের আশ্রয়ে দ্রুত অভ্যুদয় লাভ করল বৃষ্ণি বংশ। রৈবতক সম্ভবতঃ বলদেবের যোগপীঠ। ওখানেই রেবতীকে পেলেন তিনি। বলরাম যদি নারায়ণের কর্ম সহচর কেন্দ্রীকৃত যোগবীর্য হয়ে থাকেন, রেবতী তাঁর আত্ম-শক্তি। ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন হলেন এতদিনে। বলরাম পূর্ণত্ব লাভ করার কিছুদিন পরেই শ্রীকৃষ্ণের ঘরে এলেন রুক্মিণী। বাপ ভাইয়ের সম্পূর্ণ অমতে শ্রীকৃষ্ণকে বরণ করলেন বিদর্ভ রাজকুমারী। গোপনে দূতের হাতে চিঠি দিয়ে জানালেন, 'যদুনাথ! তুমি এসে হরণ কর আমায়।' খুঁটিয়ে লিখলেন, কোন সময়ে কি ভাবে কোন খান হতে নিয়ে যাওয়া যাবে তাঁকে। চক্রী বাসুদেবের সুযোগ্যা সহধর্মিণী একেবারে! বীর্যশুল্কার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করা ক্ষত্রিয়ের রীতি নয়। তাছাড়া শৌরি মনে মনে জানতেন ভীষ্মকের ঘরেই তাঁর 'কুটো বাঁধা আছে'। ভাগবতকার বলছেন,

তাং বুদ্ধিলক্ষণোদার্য্যরূপশীল গুণাশ্রয়াম্।
কৃষ্ণশ্চ সদৃশীং ভার্য্যাং সমুদ্বোঢ়ুং মনোদধে ॥

কিন্তু বিদর্ভ যুবরাজ যোগ দিয়েছেন জরাসন্ধ চক্রে···ছেলের মত-ই বৃদ্ধ ভীষ্মকের মত। পিতাপুত্র উভয়েই কৃষ্ণ বিদ্বেষী—ঘরের মেয়েটিকে চেদিরাজ শিশুপালের হাতে সম্প্রদান করে চেদিগোষ্ঠীকে বিধিবদ্ধভাবে জরাসন্ধচক্রের একজন করে নেওয়াই বিদর্ভের রাজনীতি। অবস্থা বুঝে নিজ মনোভাব শ্রীকৃষ্ণ গোপন রেখেছিলেন। তাঁর ভরসা ছিল রুক্মিণীর সতীচিত্তের পরে। ও যদি তারই হয় তবে আর কেউ ওকে পাবে কেন? শক্তিস্বরূপিনী স্বয়ং এসে দাঁড়াবেন তাঁর পাশে। ঠিক তাই-ই হল। রুক্মিণী নিজেই উদ্যোগী হয়ে ডাক দিলেন।

শুক্লা ত্রয়োদশী রুক্মিণী দেবীর বিবাহ তিথি বলে নির্দিষ্ট হয়েছিল। একাদশীর দিন মঙ্গলাচরণের জন্য রাজকুমারীকে কুলদেবী অম্বিকার মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হল। তাঁকে দেখার জন্য চারপাশে জনতার ভিড়··রাজন্যবর্গরাও যে-যার রথে বসে পদচারিণী রুক্মিণীর রূপ দেখছেন চোখ ভরে। এমনি সময়

"শৃগাল মধ্যাদিব ভাগহৃদ্ধরিঃ" সিংহ যেমন শিয়ালের পালকে আগ্রাহ্য করে নিজের শিকার কেড়ে নিয়ে চলে যায়, মাধব হাজারো লোকের মাঝখান হতে বৈদর্ভীকে নিজের রথে তুলে নিলেন। জরাসন্ধ, পৌণ্ড্রক, বিদূরথ, দন্তবক্র ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিপক্ষরা সকলেই উপস্থিত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আত্মীয়দের কাউকে কিছু না বলে একাই রুক্মিণী-দূত সুদেব ব্রাহ্মণের সঙ্গে চলে এসেছিলেন। বলরাম ব্যাপার অনুমান করে সসৈন্যে তাঁকে অনুসরণ করেন। খুব সম্ভব নারায়ণী সেনা এসেছিল বলদেবের সঙ্গে। কারণ রুক্মিণী হরণ করে শ্রীকৃষ্ণ যখন সপরিকর রামের সঙ্গে মিললেন তখন জরাসন্ধ প্রমুখ ক্ষত্রিয়েরা বলে উঠলেন ঃ "অহো ধিগস্মান্ যশ আত্তধন্বিনাং গোপৈর্হৃতম্" গোপরা আমাদের যশ নষ্ট করল ? ধিক আমাদের।

আবার কিছু লোকক্ষয়। বুদ্ধিমানের মত শাল্ব জরাসন্ধরা রণে ভঙ্গ দিলেন। অপমানিত রুক্মী প্রতিজ্ঞা করে বসলেন, 'কৃষ্ণ বধ না করা পর্যন্ত কুণ্ডিনে ফিরব না।' পশ্চিম সমুদ্রকূলে ভোজকট নামে নূতন নগরী গড়ে নিজের বিদ্বেষ লালন করতে লাগলেন রুক্মী। শিশুপাল ও দন্তবক্র ছিলেন বাসুদেবের আপন পিসতুতো ভাই—পাণ্ডবদের মতই সম্পর্ক শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে। রুক্মিণী হরণের ফলে জন্মের শোধ বৈরিতা রয়ে গেল তাদের মনে। আর দাক্ষিণাত্যে শৌরি বাসুদেবের যশ ছড়িয়ে পড়ল। এ পর্যন্ত উত্তরাপথেই জয়পতাকা উড়েছিল তাঁর। দক্ষিণের শ্রেষ্ঠ রাজবংশ ভোজকুলকে পর্যুদস্ত করায় এতদিনে দক্ষিণাপথেও বাসুদেবের কীর্তি বিস্তার হল।

পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে আজও জৈষ্ঠ্যের শুক্লাএকাদশীতে রুক্মিণী হরণের যাত্রাভিনয় হয়। তবে কি ওইটিই রুক্মিণীর অধিবাস তিথি ?

রুক্মিণীকে দ্বারকায় আনবার কিছুদিন পরেই স্যমন্তক মণি নিয়ে আবার একটা গৃহযুদ্ধ ঘনিয়ে এল যদুকুলে। সত্রাজিতোপাখ্যান সকলেরই মোটামুটি জানা। স্যমন্তক মণি উদ্ধার করতে গিয়েই ঋক্ষরাজকন্যা জাম্ববতীকে বিবাহ করলেন শ্রীকৃষ্ণ। দ্বারকা সন্নিহিত দুর্গম অরণ্যানীতে মাসাধিকাল নিরুদ্দিষ্ট

ছিলেন তিনি। কোন পাহাড়ের গুহায়যে হারিয়ে গেলেন সঙ্গিরা খুঁজে পেলনা। বারোদিন পরে হয়রান হয়ে দ্বারকায় ফিরল তারা—কান্নার রোল উঠল দ্বারাবতীর ঘরে ঘরে। কিন্তু আবারও মৃত্যুমুখ হতে ফিরে এলেন শৌরি, সঙ্গে এলেন অনার্য কন্যা জাম্ববতী। ঋক্ষ নামটা সেকালের অনেক ক্ষত্রিয় বংশেই থাকত। ঋক্ষরাজ জাম্ববান হয়তো বিন্ধ্যারণ্যে বিতাড়িত কোনও ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের বংশধর। বহুকাল অরণ্যচারণের ফলে আদিম জাতির মতই অসংস্কৃত বর্বরতা দেখা দিয়েছিল ঋক্ষদের মধ্যে। কিন্তু ধর্মে তারা তখনও ভাগবত—নারায়ণাবতার রামচন্দ্রের ভক্ত। বাসুদেব তাদের নিজ গোষ্ঠীতে টেনে আনলেন। অন্ধ্র পুলিন্দ পুক্কসদের মধ্যে কৃষ্ণকথা ছড়ানোর আর একটা সূত্র সৃষ্টি হল।

স্যমন্তক মণি ফিরে পেয়ে লজ্জিত সত্রাজিৎ দুহিতা সত্যভামাকে বাসুদেবের হাতে তুলে দিলেন। কিন্তু অন্যান্য যাদবদের মনে কৃষ্ণ-দ্বেষের আগুনটা ধূমায়িত হতে থাকল। জতুগৃহ দাহের সংবাদ পেয়ে কৃষ্ণ-বলরাম গেছেন হস্তিনাপুরে—এই অবসরে বিরোধীপক্ষ সত্রাজিৎকে হত্যা করে বাসুদেবের প্রতি বিদ্বেষ চরিতার্থ করল। ঘরে বাইরে শত্রুবিজড়িত জীবন শ্রীকৃষ্ণের···আর ঠিক সেই সময় দুর্ভাগ্যতাড়িত হয়ে তাঁর পাঁচটি সুহৃৎ কোথায় কোন বনে হারিয়ে গেল। শ্রীকৃষ্ণের সংকটসঙ্কুল মথুরা-পর্ব কালে পাণ্ডবরা কোথায়? তাঁরা তখন দ্রোণের কাছে শিক্ষানবীশ, ধৃতরাষ্ট্রের অধীন, পরান্নভোজী। শূরসেনের উপর দিয়ে ঝড় বইছে—পাণ্ডবদের কানে আসত এ খবর। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও সাহায্য করবার কোনও পথ তাঁদের ছিল না। প্রতিমুহূর্তে দুর্যোধনের কুটিল রোষ তাঁদের প্রাণ বিপন্ন করছে। আত্মরক্ষায় যারা ব্যতিব্যস্ত অন্যের সহায়তা কেমন করে করবে তারা? এদিকে শ্রীকৃষ্ণও নিয়মিত সংবাদ রাখতেন পৃথাপুত্রদের, তবে প্রকাশ্যে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন না। তাতে পাণ্ডবদের বিপদ আরও বাড়বে এ এক কথা। আর ওরা নিজের পায়ে দাঁড়াক এ ভাবও বাসুদেবের মনে ছিল। তিনি দেখতে চান যুধিষ্ঠিরের ধর্মবল ও ভীমার্জ্জুনের বাহুবলে ব্রহ্মক্ষত্রের মিলন। মাদ্রীসুত দুটি বৈশ্য-শূদ্রের সেবা

ও আনুগত্য অনুশীলন করুক—তবে না ওই পাঁচটি প্রাণ ভাবী ধর্মরাজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ হবে। বাসুদেব কেবল দূর থেকে কামনা করেন 'অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু'।

রুক্মিণীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের যখন বিবাহ হল সেই মহোৎসবে কুরুকুলের অন্যান্যদের সঙ্গে পৃথা ও পাণ্ডবদের নিশ্চয়ই বিশেষ আমন্ত্রণ গিয়েছিল। সম্ভবতঃ পঞ্চপাণ্ডবদের সঙ্গে বাসুদেবের চাক্ষুষ পরিচয় সেই প্রথম। কিন্তু উৎসবের মধ্যে কতক্ষণের জন্যই বা পরস্পরের সন্নিহিত হতে পেরেছিলেন উভয় পক্ষ? তাই দ্রৌপদী-স্বয়ম্বরে দেখি পঞ্চপাণ্ডবকে চিনতে কষ্ট হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের··· ভাল করে বারবার মিলিয়ে দেখছেন এরাই তারা কিনা। ও দিকে কর্মকার গৃহে গিয়ে নিজেরা পরিচয় দিচ্ছেন আমরাই কৃষ্ণ-বলরাম তবে পাণ্ডবদের সংশয় ভঞ্জন হচ্ছে।

স্যমন্তক মণি নিয়ে বলরামের মনেও সংশয় ঢুকেছিল। শতধন্বাকে হত্যা করে যখন মণি পাওয়া গেল না, রুষ্ট হয়ে মিথিলায় বাস করতে লাগলেন বলদেব। দ্বারকা ত্যাগ করলেন তিনি, তার অর্থই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ বর্জন। দুর্যোধন মিথিলায় এসে বলদেবের কাছে গদা যুদ্ধের পাঠ নিতে লাগলেন। দুই ভাইয়ের যে একটা মনান্তর হয়েছে দুর্যোধনের নিশ্চয়ই তা জানা ছিল। পাণ্ডব-পক্ষপাতী বাসুদেবের সঙ্গে বলদেবের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতা যদি থাকত দুর্যোধনের গদাযুদ্ধ শেখা হত কিনা সন্দেহ।

কিন্তু অটল বীর্যে সমস্ত প্রতিকূলতা হটিয়ে দিলেন বাসুদেব। গীতা কি তাঁর 'পরোপদেশে পাণ্ডিত্য' মাত্র? ওই তাঁর জীবন গাথা···"সুখে দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ। ততো যুদ্ধায় যুধ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি"। জয় তাঁর অবধারিত।

রুক্মিণী-হরণ কালে সামান্য নারায়ণী সেনা নিয়ে জরাসন্ধদের মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি। বিপক্ষের ভাব দেখে বুঝেছিলেন তাঁকে ভয় করতে আরম্ভ করেছে এরা—সহজে আর দ্বারাবতী অভিযান করছে না কেউ। কাশী রাজ্য

দগ্ধ করে এবং পৌণ্ড্রক বাসুদেবকে হত্যা করে মোটামুটি আর্যাবর্তের ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠদের সঙ্গে লড়াইয়ের পালা চুকে গেল। পৌণ্ড্রক বাসুদেব সেকালের একটি অভিনব বিদ্রোহ। পৌণ্ড্রককে ভাগবতকার 'করুষাধিপতি' বলেছেন···বিষ্ণুপুরাণ বলছেন, ইনি পৌণ্ড্রবংশীয় বাসুদেব নামে কোনও রাজা। মহাভারতে দেখছি পৌণ্ড্র বাসুদেব বঙ্গ, পুণ্ড্র ও কিরাত দেশের অধিপতি। পৌণ্ড্রক নামটায় এঁকে পুণ্ড্র বংশের একজন বলেই মনে হয়। কারণ তাঁর সখা দন্তবক্রই ছিলেন করুষাধিপতি···তাঁকে করুষাধিপতি বলাটা হয় ভাগবত সঙ্কলয়িতাদের ভুল, আর নয়তো ধরতে হবে, তাঁর নাম দিয়ে করুষাধিপতি দন্তবক্রই শ্রীকৃষ্ণকে বলে পাঠিয়ে ছিলেন, 'তুমি নারায়ণাবতার হও কি বলে ? দেখ আমিই নারায়ণাবতার বাসুদেব'। এই জন্যই বলছি পৌণ্ড্রকের ব্যাপারটা নূতন ধরণের বিদ্রোহ। বাসুদেব নাম, বনমালা, ময়ূর, মুকুট আর গদাচক্র গ্রহণ এবং রথে গরুড় লাঞ্ছিত পতাকা জুড়লেই কি সে বৈকুণ্ঠের বাসুদেব ? অবতার পুরুষ ? তবে আমিও অবতার—বাসুদেব নাম আমারও···সাজসজ্জাটা ওই রকম করলেই হয়। পৌণ্ড্রক বাসুদেব কাহিনীতে অবতারকে অবিশ্বাস এবং ব্যঙ্গ করার সুপ্রাচীন দৃষ্টান্ত মেলে। খুব সম্ভব এই ভুঁইফোঁড় অবতারটি বঙ্গবাসীরাই খাড়া করেছিল। এত সাহস এবং অবতার যাচাইয়ের স্পর্ধা ওই পূবদেশের ব্রাত্যদের ছাড়া আর কার ? মগধ ও পুণ্ড্র···বাংলা বিহারেই শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে জনমত সবচেয়ে প্রবল ছিল কি ? ব্রাত্য যদুবংশের একজন হলে কি হবে, এই নবাবির্ভূত ক্ষত্রিয়টি কালে-দিনে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পাণ্ডা হয়ে সবার মাথায় পা তুলবেন পূব দেশের ব্রাত্যদের এ ভয় স্বাভাবিক। দীর্ঘদিন এ-বিরূপতা ছিল। আমরা বলি আজও আছে। দ্বারকাধীশ বাসুদেবকে কোনদিন বাংলা হৃদয়ে গ্রহণ করেনি। লোকসাহিত্যের মাধ্যমে যখন গোপবেশী বেণুধর বৃন্দাবনচন্দ্রের লীলা বাংলায় ভেসে এল তখন অনার্যদের হাত থেকে কানাইয়ালালকে বাঙালী লুফে নিল। নারায়ণাবতার বাসুদেবকে ওই জন্যই বোধ হয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা শ্রীনন্দনন্দন হতে আলাদা বলেন।

"কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে।
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যান কাঁহাতে ॥"

জতুগৃহদাহের পর হতেই শ্রীকৃষ্ণের কর্মনীতির মূল লক্ষ্য হল পাণ্ডবদের অভ্যুদয়। মোটামুটি ঘরে বাইরে শান্তি ফিরিয়ে এনেছেন তিনি। যদুকুলের বহিঃশত্রুরা শৌর্যের প্রাধান্য স্বীকার করেছে, নিজেদের মধ্যেও পারস্পরিক বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ যে একা তার জন্যে কোনও ঋদ্ধি আহরণ করতে চাননা যাদব-প্রধানদের ক্রমে সে-কথায় আস্থা জন্মেছে। বলদেবকে অন্যান্য যদু মুখ্যরাই মিথিলা হতে ফিরিয়ে আনলেন। বাসুদেব সত্যই নির্দোষ, হলধর নিজের ভুল বুঝে অনুতপ্ত হন। তখন নিশ্চিন্ত হয়ে পাণ্ডবদের দিকে মন দিলেন শ্রীকৃষ্ণ। দেশ হতে দেশান্তরে লক্ষ্যহীনের মত ঘুরছেন পাঁচ ভাই সঙ্গে বৃদ্ধা কুন্তী ··বাসুদেবের কল্যাণামৃতবর্ষি দৃষ্টি সবার অলক্ষ্যে অনুসরণ করে তাঁদের। আচার্য দ্রোণকে দিয়ে আর্যাবর্তের পরাক্রান্ত দুটি অভিজাত কুলে সূক্ষ্ম বিদ্বেষের অংকুর জন্মেছে। শ্রীকৃষ্ণ চাইলেন সেই সূক্ষ্ম চিড়টুকু বিস্তার লাভ করুক। অর্জুন যেন পাঞ্চালীকে স্বয়ংবরে জয় করে। খুব সম্ভব তাঁর ইচ্ছামতই ব্যাস জড়িয়ে পড়লেন এই কূটনীতির সঙ্গে। পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করে তিনি বললেন যদিও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ এবং তোমরা আমার পক্ষে উভয়েই সমান, কিন্তু আমি এখন তোমাদের ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের চেয়ে অধিক স্নেহ করি। কারণ দীন ও শিশুরাই যথার্থ স্নেহের পাত্র। ধার্ত্তরাষ্ট্রদের অসদভিপ্রায়েই তোমরা দুরবস্থাগ্রস্ত এ আমি বুঝেছি। আমি স্নেহবশে তোমাদের হিতসাধনে উদ্যত হয়েছি। বৎস! তোমরা বিষণ্ণ হয়োনা, পরিণামে তোমাদের পরম সুখ হবে। নিরপেক্ষ মহর্ষির এই উদ্যোগ কার নির্দেশে? কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন কি নিমিত্ত মাত্র নন?

দ্রৌপদী সয়ম্বরের পর থেকে পাণ্ডবদের উৎসব ব্যসনে নিত্য সহচর হলেন বাসুদেব। বেশ বোঝা যায় পাঞ্চালের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ্য সৌহার্দ্যে পাণ্ডবরা বলীয়ান দেখেই এতকাল পরে ধৃতরাষ্ট্র অর্ধরাজ্য ছেড়ে দিলেন তাদের। বাসুদেবের পরিকল্পনা মতই খাণ্ডব প্রস্থের অরণ্য

প্রদেশে রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থের পত্তন হল। ভিত্তি স্থাপন হতে নগরীর প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত আগাগোড়া, ব্যাপারটা প্রধানতঃ শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বাবধানেই ঘটল। বর্ষার চারমাস দ্বারাবতী ছেড়ে ইন্দ্রপ্রস্থে কাটাতেন তিনি। দ্বারাবতী ছেড়ে তাঁর এই পাণ্ডবদের কাছে বেড়াতে যাওয়াটাই কি রথযাত্রার প্রাক্‌কালে পাণ্ডুবিজয় অনুষ্ঠান নামে শ্রীক্ষেত্রে প্রচলিত হয়েছে। *

ইন্দ্রপ্রস্থে এসে অর্জ্জুন সখাকে নিয়ে বনবিহার করবার জন্য ('বিপিনং মহৎ'

---

* এ বিষয়ে অনেকগুলো সূত্র ঠিক ঠাক খেটে যায়। মথুরা ছেড়ে দ্বারাবতী যাওয়ার পর বেশ কিছুদিন কোথাও নড়তে পারেন নি শ্রীকৃষ্ণ। হয় তিনি নয় বলরাম—পুরী রক্ষার জন্য পালা করে দুভাইয়ের একজন থাকতেন। স্যমন্তকের হাঙ্গামা মিটে দ্বারকায় শান্তি স্থাপনের পর বলরাম একবার ব্রজে গিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন পৌণ্ড্রক বধের আয়োজনে ব্যস্ত। দীর্ঘকালের মধ্যে বিশেষ প্রয়োজন বা যুদ্ধযাত্রা ভিন্ন অন্য কোনও কারণে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা ছাড়েন নি। বলরামকে রেখে একবার নিজে গোকুলে তো যেতে পারতেন! কেন যাননি তার যুক্তি দর্শিয়ে গৌরাঙ্গদেব শ্রীকৃষ্ণের জবানীতে বলতেন, "চারিদিকে আমার শত্রু। ব্রজবাসীরা যে আমার প্রাণ হতে প্রিয় এ যদি তারা বোঝে তবে তাদের রোষ পড়বে গোকুলের উপর। এমন কি যদুরাও আমার গোপ প্রীতি পছন্দ করে না। সকলকে বঞ্চনা করার জন্যই বাইরে আমার সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে হয়—সেই শত্রুগণ হৈতে ব্রজজনে রাখিতে রহি রাজ্যে উদাসীন হঞা। যে বা স্ত্রী পুত্র ধন করি বাহ্য আচরণ যদুগণের সন্তোষ লাগিয়া॥" (চৈঃ চঃ মধ্যলীলা ১৩ পরিচ্ছেদ)। হতে পারে পরম সুহৃৎ পাণ্ডবদের অভ্যুদয়ের পর শ্রীকৃষ্ণ আশ্বস্ত চিত্তে ব্রজভ্রমণে যেতে পেরেছিলেন। পাণ্ডু বিজয়ের সঙ্গে তাই রথযাত্রার অবিনাভাবী সম্পর্ক। রথযাত্রা যে ব্রজভ্রমণ তার অন্য প্রমাণ পরে দেওয়া যাবে। গৌরাঙ্গদেব তো বলছেনই সুন্দরাচল বা মাসীর বাড়ী যাওয়া বৃন্দাবনে যাওয়া। তাছাড়া ওই পর্বটির নামান্তর নব যাত্রা (নূতন করে যাওয়া বা নয় দিনের জন্য যাওয়া) এবং নন্দী ঘোষ যাত্রা।

কি মহাবন ? ব্রজভূমির একাংশ ?) যমুনাতীর ধরে বহুদূর চলে যেতেন তিনি। এই সময়ই সূর্যসুতা কালিন্দীর বরমাল্য পেলেন শ্রীকৃষ্ণ। কে এই কালিন্দী ? তপতীর মত কোনও সিদ্ধবিদ্যা ? আশ্চর্যের বিষয় বনপর্বে তীর্থ যাত্রাপর্বাধ্যায়ে যমুনাতট দেখিয়ে লোমশ মুনি বলছেন এই স্রোতস্বতী যমুনাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তপস্যা করেছিলেন (১২৪ অঃ)। কত কথাই যে হারিয়ে গেছে ! কালিন্দীকে পাওয়ার পরই খাণ্ডব দাহন পর্ব। কালিন্দী কোনও সিদ্ধবিদ্যা না ছদ্মপরিচয়ে কোনও বাগদত্তা গোপকন্যাকে সেবার মহাবন হতে কৃষ্ণার্জুন নিয়ে গিয়েছিলেন এ রহস্য যেমন অমীমাংসিত, তেমনি খাণ্ডব দাহন কোনও অধ্যাত্ম রূপক না দুইসখার বন কেটে নগর বসানোর অধ্যবসায়—কোনটা ঠিক বলা দুরূহ।

এদিকে পাণ্ডব ওদিকে যাদবদের অপ্রতিহত প্রতিষ্ঠা এবং দুই পক্ষের নিবিড় সহযোগিতায় ভারতের ক্ষাত্রিয়বর্গ কৃষ্ণার্জুনের বিরোধিতা করতে সাহস পায় না। তখন সামসহায়ে মিত্রমণ্ডল গড়তে চাইলেন শ্রীকৃষ্ণ। কেকয় ও মদ্রের রাজকুমারী দুটিকে ঘরে আনলেন তিনি···অবন্তীর মিত্রাবিন্দা স্বয়ংবরা হলেন। কোশলরাজ নগ্নজিতের কাছে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই চাইলেন তাঁর কন্যা সত্যাকে। এই উপলক্ষ্যে সপ্ত গোবৃষ জয়ের কথা আছে। গল্পটার সঙ্গে Greek Legends এর Golden Fleece পর্যায়ের একটি কাহিনীর মিল রয়েছে।

অষ্টমহিষীকে লাভ করার পরই নরকাসুর বধের কথা তুলেছেন ভাগবতকার। মনে হয় কূটনীতিবলে ভারতবর্ষের ক্ষাত্রিয়শক্তিকে একরকম হাতের মুঠোয় আনবার পর কিছুদিন অন্তরে ডুব দিয়েছিলেন বাসুদেব। নরকাসুর বধের পর্বটি তাঁর গূঢ় তপশ্চর্যা। ভাগবতে দেখছি ভূমিপুত্র নরকাসুরের অত্যাচারের কথা ইন্দ্র জানাচ্ছেন তাঁকে। ভোগৈশ্বর্যবাদী ক্ষত্রকুলের কর্ম্মকাণ্ড চর্চার ফলে পৃথিবীব্যাপী অশুভশক্তির অভ্যুত্থানই ভূমিপুত্র নরকাসুরের আবির্ভাব। অতিমানস বা সদ্‌ভূত বিজ্ঞান সহায়ে 'অন্ধতমিস্রার দুর্ধর্ষ দানবীশক্তি' নিরাকৃত হবে এই ছিল বাসুদেবের সঙ্কল্প। ভাগবত বলছেন তাঁর সঙ্কল্প অমোঘ—নরকাসুর নির্জিত হয়েছিল। নরকাসুরের প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর বর্তমান কামরূপ কিনা বলা কঠিন।

তবে শক্তি সাধনার জন্য শ্রীকৃষ্ণ কিছুদিন কামরূপে ছিলেন এ হতে পারে। সে সময় ওই অঞ্চলের রাজা ভগদত্ত তাঁকে উৎখাত করতে চেয়েছিলেন এ-ও অসম্ভব নয়। মায়াবিদ্যার পীঠভূমি কামাখ্যায় এমন অনেক তাপসই নির্যাতিত হয়েছেন—ওটি শক্তির পরীক্ষা। পীঠরক্ষক ভগদত্তই নরকাসুরের মর্ত্য বিগ্রহ বা আত্মজ—এ কল্পনাটিও অন্বর্থ। তবে আসল সংগ্রাম যে হিমালয় পৃষ্ঠে চলেছিল তার দুটি সংকেত দেওয়া যেতে পারে। প্রথম—বনপর্বে গন্ধমাদন পর্বতশীর্ষ দেখিয়ে লোমশমুনি যুধিষ্ঠিরকে বলছেন, ওই যে মেঘসন্নিভ পাণ্ডুর বস্তু দিক ব্যাপ্ত করেছে ওই নরকাসুরের অস্থিপঞ্জর (১৪২ অধ্যায়)। ওইখানেই বলা হয়েছে ঐন্দ্রপদ প্রার্থী নরকাসুরকে সংহার করা নারায়ণের অন্যতম কর্ম। স্পষ্ট বোঝা যায় সূক্ষ্মলোকের ব্যাপার এটি। শ্রীকৃষ্ণাবতারে তিনি হিমাচলে যোগ যুক্ত অবস্থায় ভৌম নরকের সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হয়েছিলেন এ কিছু আশ্চর্য নয়। কিন্তু কোথায় তাঁর সে আসন? আশ্চর্যের কথা কুলু উপত্যকায় রোহটাং গিরিসংকটের উত্তরে হিমালয়ের একটি চূড়ার নাম ব্যাস ঋষি শৃঙ্গ (সমুদ্র সমতা হতে ১৫ হাজার ফুট উচ্চতা)। চন্দ্রভাগা ও বিপাসার জন্ম ব্যাস ঋষি শৃঙ্গের নিম্ন হতে। বিপাশাকে বিয়াস নদী বলে কি জন্য? চন্দ্রভাগা ছাড়িয়ে সোজা উত্তরে গেলে বড়লাচা গিরিসংকট। ওই পথে আঠারো কি কুড়ি হাজার ফুট উচ্চে হানলে ও রূপসু উপত্যকায় লবণাক্ত এক বিরাট হ্রদের নাম মুরারি হ্রদ। ভাগবতে দেখছি পাঞ্চজন্য নাদে কুপিত হয়ে জলতলে শয়ান মুর দৈত্য উঠে এল। মুরই নরকাসুরের প্রধান সহায়। মুরারি হ্রদের তীরেই কি নরকবিজয়ের সংকল্প নিয়ে আসন পেতেছিলেন বাসুদেব? হিমালয়ের কুড়ি হাজার ফুট উচ্চে মুরারি হ্রদের নাম দেখে স্বতঃই মনে হয় ওইটি নরকাসুর 'বধের' যোগপীঠ। নরকের অন্তঃপুরে ষোড়শ সহস্র বন্দিনী রাজবালার দেখা পাওয়াও অধ্যাত্ম রূপক হতে পারে। কিংবা লৌকিক ব্যাখ্যা এই রকম দেওয়া যেতে পারে মেয়েরাই সমাজের ধারিণী শক্তি। হিমালয় হতে নীচে নেমে এসে ক্ষত্রিয়কন্যাদের আনুকূল্যে শ্রীকৃষ্ণ প্রথম বুঝলেন নরক সত্যই পরাজিত হয়েছে। মেয়েরা তাঁর ভাব গ্রহণ

করতে উন্মুখ, তাঁকে স্বীকার করতে ব্যাকুল। ধীরে ধীরে ভোগৈশ্বর্যবাদের মোহ মেয়েদের মন থেকে কেটে যাচ্ছে—এ লক্ষণ দেখে উৎফুল্ল হলেন বাসুদেব।

দুই সখার জীবন একই খাতে বইছিল। শ্রীকৃষ্ণ যখন বৈবাহিক সম্বন্ধে মিত্রতা সৃষ্টি করছেন রাজন্যমণ্ডলে, সম্ভবতঃ সেই সময়ই ব্রহ্মচর্যব্রত নিয়ে ভারত পর্যটনে বেরিয়ে পড়েছেন ফাল্গুনী। পথে পথে দার পরিগ্রহ করে চলেছেন তিনিও। প্রভাসে দুই বন্ধুর যখন এগার বৎসরান্তে নিভৃতালাপের সুযোগ ঘটল তখন অর্জ্জুনের পর্যটন বৃত্তান্ত আদ্যন্ত শুনে তাই বুঝি শ্রীকৃষ্ণ বললেন সঙ্গত কাজই করেছ তুমি। সুভদ্রাকে অর্জুনের হাতে তুলে দিয়ে মিত্রসংগ্রহের পর্ব শেষ করলেন শ্রীকৃষ্ণ। নর-নারায়ণের পরম মিলন গ্রন্থি সুভদ্রা, যদুপাণ্ডব মৈত্রীর প্রকাশ্য নিদর্শন। সুভদ্রার মাধ্যমে কৃষ্ণার্জুনের আত্মীয়তা দিনে দিনে বেড়েছে।

নববধূ সুভদ্রা অর্জ্জুনের পরামর্শে গোপালিকা বেশে পাণ্ডব অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছিলেন। কুন্তী ও দ্রৌপদী গোপবালা রূপিণী সুভদ্রাকে বুকে টেনে নিলেন। আদিপর্বের ২২১ অধ্যায়ের ওই দুটি ছত্রে ইঙ্গিত পাচ্ছি, ব্রজবাসিনীদের প্রতি কুন্তী ও দ্রৌপদীর বিশেষ পক্ষপাতের খবর অর্জ্জুন জানতেন। অনুমান করি কৃষ্ণসখা পার্থের কাছ হতেই অন্য ভাইরা এবং কুন্তী ব্রজলীলার বিশদ বিবরণ শুনেছিলেন। সখী কৃষ্ণাকে বাসুদেব নিজেই বলে থাকবেন। সুভদ্রা যে সেই গোপীভাবের উত্তরাধিকার নিয়েই পাণ্ডবদের মধ্যে এলেন তাঁর গোপালিকা বেশে কি তারই ইঙ্গিত? সুভদ্রাকে কেউ বলেন বলদেবের সহোদরা, শ্রীকৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভগিনী, কেউ বলেন তিনি দেবকীরই মেয়ে শ্রীকৃষ্ণের সহোদরা। ভাগবত ওই শেষের মতটিই সমর্থন করছেন। আমরা জানি শ্রীকৃষ্ণের পরিবর্তে যশোদার যে মেয়েটিকে বসুদেব মথুরায় এনেছিলেন কংস রোষ হতে সে রেহাই পায়নি। সুভদ্রা যদি দেবকীরই আত্মজা হন তাঁরও জীবনসংশয় হওয়ার কথা। এই মেয়েটিকেও কি বাসুদেবের আত্মীয়রা গোপনে ব্রজে কারও ঘরে রেখে এসেছিলেন? এ সম্বন্ধে, কোথাও কোন উল্লেখ আজও চোখে পড়েনি। কেবল একটি সূত্র দেখতে পাই রূপগোস্বামীর 'গণোদ্দেশদীপিকায়'। —চৌষট্টি

গোপীসমাজের মধ্যে একজন সুভদ্রা আছেন—ললিতা দেবীর প্রিয়সখী তিনি। এই সখিত্ব কবে হয়েছিল? ইনি যদি কৃষ্ণসোদরা সুভদ্রাই হন তবে বলব নিশ্চয় ব্রজে মানুষ হয়েছিলেন তিনিও। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ ছেড়ে মথুরায় চলে আসার পর সুভদ্রার ব্রজে গিয়ে সখিত্বের অবসর কোথায়? কিন্তু এ সবই অনুমান। উল্লেখযোগ্য বিবরণ যা পাচ্ছি এখন তারই আলোচনা করা যাক।

শ্রীক্ষেত্রের প্রাচীন প্রথায় দেখছি স্নানপূর্ণিমায় কৃষ্ণ-বলরাম সুভদ্রাকে নিয়ে একটা উৎসব, তারপর পনেরদিন অবসর কাল। তারপর নেত্রোৎসব এবং সুপ্রসিদ্ধ রথযাত্রা। লক্ষ্য করবার বিষয় জগন্নাথের রথে দারুক সারথি নাই অন্য লোকের নাম, যাতে সন্দেহ হয় এ রথ বা সারথি ইন্দ্রপ্রস্থাধিপতির দেওয়া। দ্বারকার বল বাহনাদি রাম-কৃষ্ণ ইচ্ছা করেই ব্যবহার করেন নি···ব্রজবিহারের কথাটা অভিজাত সম্প্রদায়ের কানে উঠুক এ তাঁরা চাননি। সুভদ্রার রথে সারথি অর্জুন—মাদলাপঞ্জীর এই প্রাচীন উল্লেখ হতে নিঃসংশয়ে বুঝি নবযাত্রা ইন্দ্রপ্রস্থ হতেই হয়েছিল, দ্বারকা হতে নয়। মহাভারতের বিবরণের সঙ্গে শ্রীক্ষেত্রের যাত্রানুষ্ঠান মিলে যাবে। আদিপর্বের ২২২ অধ্যায়ে দেখছি ঃ—"একদা অর্জুন কৃষ্ণকে কহিলেন, 'হে জনার্দন, গ্রীষ্মের অতিমাত্র প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। অতএব আমরা সপরিবারে যমুনায় যাইয়া জলবিহার করিতে অভিলাষ করি; সায়ংকালে সকলে প্রত্যাগমন করিব। তোমার কি অভিরুচি হয়?' বাসুদেব কহিলেন, 'হে অর্জুন! আমারও সম্পূর্ণ ইচ্ছা হইতেছে যে আমরা সুহৃজ্জন-পরিবৃত হইয়া যথেচ্ছ জলবিহার করি'। বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৃষ্ণ ও অর্জুন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি লইয়া সুহৃদগণের সহিত যমুনায় গমন কবিলেন।" স্নানযাত্রার মূলে এই জলকেলির স্মৃতি নাই কি? সুভদ্রা ও কৃষ্ণ-বলরামকে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে আনন্দোৎসব? মহাভারত বলছে স্নানান্তে কৃষ্ণার্জুনাদি সকলে ইন্দ্রপুর সদৃশ বিহারভূমিতে এসে প্রমোদমত্ত হলেন। "বামলোচনারা ক্রীড়ামদে মত্ত হইলেন। কেহবা বনবিহার কেহবা গৃহ মধ্যে কেহবা জলবিহার করিতে লাগিলেন।

"দ্রৌপদী ও সুভদ্রা বিবিধ বিচিত্র বসন ও নানাবিধ অলঙ্কার কামিনীগণকে প্রদান করিলেন। কোন কামিনী হৃষ্টচিত্তে নৃত্যগীত আরম্ভ করিল, কেহ সুমধুর স্বরে শব্দ (শিস্ দেওয়া) করিতে লাগিল। কেহ হাস্য পরিহাসে মত্ত হইল, কেহ অত্যুৎকৃষ্ট সুরা পান করিয়া গদগদস্বরে কথা কহিতে লাগিল। কেহবা কাহার সহিত বিরোধ আরম্ভ করিল, কেহবা নির্জন স্থানে যাইয়া গোপনীয় বিষয় লইয়া কথোপকথন করিতে লাগিল। বেণু বীণা মৃদঙ্গ রবে সমৃদ্ধ অট্টালিকা সমূহ নিনাদিত হইল······" (কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ··· আদিপর্ব পৃঃ ২৮১-৮২)। এইটি অনবসর কাল···কৃষ্ণার্জুন কি সুভদ্রা বলদেবের দেখা পায় না কেউ। সখীসহচরী নিয়ে কোথায় যে তাঁরা আছেন তাই জানা যায় না। পুরীর মন্দিরে এই সময় সেবাধিকারী কেবল শবরকুলের দয়িতা পাণ্ডারা। বেশ মনে হয়—ব্রজ হতে আভীর পুলিন্দদের খবর দিয়ে আনানো হয়েছে, তারা বনে বনান্তরে নিয়ে যাচ্ছে সঙ্গে করে। শেষ পর্যন্ত তাদেরই অনুরোধে তাদের নিয়ে খাণ্ডবপ্রস্থের অরণ্য হতে ব্রজাভিমুখে রওনা দিলেন তিন ভাই-বোন। অভিজাতবর্গ পিছনে পড়ে রইল, জনসাধারণের হল 'নেত্রোৎসব'। রথারূঢ় কৃষ্ণ-বলরাম সুভদ্রাকে যে কেউ ছুঁতে পারে যে কেউ ফলমিষ্টি ভোগ দিতে পারে—তাঁরা তখন সকলের ঠাকুর···জগদ্বন্ধু।*

---

* শ্রীক্ষেত্রে বার বৎসর পর পর (রথ যাত্রার সময়েই) জগন্নাথ দেবের 'নব কলেবর' নামে একটি মহোৎসব হয়। বাহ্যতঃ অনুষ্ঠানটি পুরাতন মূর্তি বদলিয়ে নূতন মূর্তি স্থাপনা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু বার বৎসরান্তে এ উৎসব কেন? এক যুগ শেষে নূতন যুগের সূত্রপাত হয় বার বৎসরান্তে এই ধারণায়? বৈষ্ণবরা তেমন কোন প্রাচীন ইতিহাস দর্শাতে পারছেন না যাতে অনুষ্ঠানটির মৌলিক তাৎপর্য বোঝা যায়। আমরা মহাভারতের সূত্র ধরে দেখি পাণ্ডবদের জীবনে দুটি দ্বাদশবার্ষিক সঙ্কট বিখ্যাত—এক, অর্জুনের বার বৎসর ভারত পর্যটন আর পাশাখেলার ফলে পাণ্ডবদের রাজ্যচ্যুতি। সুভদ্রা-

[পঃ পৃঃ দ্রষ্টব্য]

মহাভারত ও ভাগবতের বর্ণনা মিলিয়ে রথযাত্রার উৎপত্তি সম্বন্ধে আমরা যা বললাম তাছাড়াও স্নান ও রথযাত্রায় অগণিত খুঁটিনাটি অনুষ্ঠান আছে। আমাদের অনুমান যে প্রত্যেকটি রীতি বা আচারের সঙ্গে খাটবে এমন দাবী করা অসঙ্গত। সব কিছু অবিকল ব্যাখ্যা দেবার দুরাগ্রহও আমাদের নাই। ভারতের এক-একটি যাত্রা বা পর্বের সঙ্গে বিভিন্নকালের নানা ঘটনার চুম্বক ও নানা মতবাদের সংমিশ্রণ ঘটেছে। কিন্তু মোটামুটি একটা মূল সূত্র থাকে যা সেই অনুষ্ঠানটির প্রাণ। স্নান ও রথযাত্রা যে মূলতঃ পাণ্ডব সহায়তায় শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন যাত্রার স্মারক এইটুকুই বলা যায়।**

অর্জুনের বিবাহে প্রথমপর্বের পরিসমাপ্তি। দ্বিতীয় দফায় অভিমন্যু উত্তরার বিবাহ। দুটি ঘটনাই বাসুদেবের পরম প্রীতিকর। পাণ্ডবের সঙ্কট মোচন ও পুনরভ্যুদয় তো তাঁরই বিজয়োৎসব। ওদের বিপদ কেটে সম্পদের সূচনায় তিনি যেন মৃত দেহে প্রাণ ফিরে পেলেন। খুব সম্ভব এই দুইবারের আনন্দ সমারোহ মথুরা বৃন্দাবনবাসী বা পাণ্ডবগোষ্ঠীর স্মৃতিতে অক্ষয় হয়েছিল। নিজেরা যে জীবনসংগ্রামে জয়ী হয়েছেন পাণ্ডবদের মনে সে আনন্দ তো ছিলই। তার সঙ্গে মিশেছিল শ্রীকৃষ্ণের গভীর উল্লাস। ভক্তের গৌরবে ভগবান আত্মহারা··· এই দুইবছরের রথযাত্রায় বাসুদেবের আনন্দময় মূর্তি দেখে তাঁর প্রিয়জনদের মনে এই ভাবটা বসে গিয়েছিল। পরে যখন পাণ্ডুবংশধরদের দ্বারাই ভাগবত প্রচারের মুখবন্ধ হল তখন অন্যান্য অনেক স্মৃতি পূজার সঙ্গে বার বৎসর পর পর যে দুটি পাণ্ডব গৌরববিজড়িত মহামহোৎসব সে দুটিও ভাগবতরা পালন করতেন। পরিবর্তিত হতে হতে আজ তার ক্ষীণাবশেষ হয়তো 'নব-কলেবর যাত্রার মাধ্যমে টিকে আছে।

** ইন্দ্রপ্রস্থ পত্তনের পরই ব্রজযাত্রার সূত্রপাত এ আমরা আগেই বলেছি। মহাভারত ও ভাগবতের অনেক জায়গাতেই উল্লেখ আছে বর্ষার চারমাস ইন্দ্রপ্রস্থে কাটানো কি ওখানে এলেই কয়েকমাস থেকে যাওয়া শ্রীকৃষ্ণের রীতি ছিল।
[পঃ পৃঃ দ্রষ্টব্য]

মথুরা ছাড়বার পর দীর্ঘদিন যে ব্রজবাসীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের দেখা হয়নি ভাগবতেই তার হদিশ মেলে। মথুরায় থাকতেই বা কয়জনের সঙ্গে দেখা হত? ব্রজশুদ্ধ সবাইকে তো আর মথুরায় উঠিয়ে আনা যায় না—শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে গেলে তবে সকলের আশা মেটে। লোক প্রবাদানুযায়ী যদি বিশ্বাস করা যায় উদ্ধবের সহায়তায় মাঝে মাঝ রাত্রে গোপনে যমুনা পার হতেন শ্রীকৃষ্ণ তবু সে কতক্ষণের জন্য? আর নন্দ-যশোদার মত নিতান্ত আপ্তজন ছাড়া অন্যদের সঙ্গে মিলবার অবসরই বা কই? দ্বারকায় যখন চলে গেলেন ব্রজবাসীর সঙ্গে বিচ্ছেদ আরও বেশী হল। সর্বভারতীয় কোন উৎসব বা তীর্থযাত্রা যোগে হয়তো যাদব পরিবৃত বাসুদেবের সঙ্গে ব্রজবাসীদের দেখা হয়ে গেছে—একবার কুরুক্ষেত্রে সূর্য গ্রহণোপলক্ষ্যে যেমন হয়েছিল। দীর্ঘ বিরতির ফলে মাথুরের পালাটাই সবার মনে গাথা হয়ে গিয়েছিল—লোক সাহিত্যে শতবর্ষ বিরহের কথাটাই চালু। এর মধ্যে কবে যে শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থের পথে মথুরা বৃন্দাবনের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়েছেন বাইরের লোক দূরে থাক দ্বারকার আত্মীয় স্বজনেরাও বহুদিন পর্যন্ত তা জানত না। রথযাত্রার তৃতীয় দিনে শ্রীক্ষেত্রে একটি কৌতুকজনক অনুষ্ঠান আছে। লক্ষ্মীদেবী কেমন করে জানতে পারলেন, বনভ্রমণের ছলে জগন্নাথ গেছেন বৃন্দাবনে। রুষ্ট হয়ে দাসদাসী পরিবৃতা দেবী ছুটে এলেন বৃন্দাবনের দিকে—স্বচক্ষে দেখবেন সত্যই তাঁকে লুকিয়ে প্রভু কোথায় গেছেন। চোখে দেখে রাগ-অভিমানের সীমা রইল না···তিনি জগন্নাথের পুষ্যরথের একখানি কাঠ ভেঙে দিয়ে জানালেন আমি এসেছিলাম—লুকালে হবে কি! দেখা না করে সেখান হতেই ফিরে গেলেন লক্ষ্মী। জগন্নাথের ভৃত্যবর্গ ভয়ে দেবীকে

সে-সময় যমুনাতীর ধরে গোকুল অবধি যাওয়া কি একদিন ব্রজে কাটানো আশ্চর্য নয়। কিন্তু এ যাওয়া ছিল অনিয়মিত। সুভদ্রা পাণ্ডব গৃহে আসার পরই বিধিবদ্ধ রথযাত্রা শুরু হয় এ অনুমানে দোষ কি? ভাই-বোন ভগ্নিপতি মিলে বনবিহারে যাওয়াটা সমাজ সঙ্গত নিশ্চয়ই। এজন্য রথযাত্রায় সুভদ্রা-বলরাম অপরিহার্য।

হাঁ-না, ভালমন্দ কিছুই বলতে পারল না। এই যে লক্ষ্মী—ইনি শান্তশীলা রুক্মিণী নন, অভিমানিনী চণ্ডী সত্যভামা হওয়াই সম্ভব। দ্রৌপদীর সঙ্গে সত্যভামার অত্যন্ত প্রণয় ছিল। বোধহয় তাঁর কাছ থেকেই ঘটনার ইঙ্গিত পেয়ে মর্মাহত হয়েছিলেন সত্যভামা। সাধারণতঃ ভ্রমণে বার হলে বাসুদেব তার এই প্রিয় পাত্রীটিকে সঙ্গে নিতেন। অর্জুন ও দ্রৌপদীর সঙ্গে সত্যভামার গাঢ় সৌহার্দের পরিচয় মহাভারতেই আছে। সেই সত্যভামাও বৃন্দাবন যাত্রার খবর পাননি এতেই বোঝা যায় দ্বারকা হতে নয়, ইন্দ্রপ্রস্থ হতেই নবযাত্রা আরম্ভ হয়; আর হয় অতি সঙ্গোপনে। মথুরামণ্ডলের লোকই তার খবর রাখত। সাবধানতার জন্য মথুরাতেই গিয়ে সেখান থেকে নৌকায় নদী পার হয়ে ব্রজ যাওয়া হত, এ-ও হতে পারে। এইসব কারণে রথযাত্রা যে ঠিক কি ঘটনার স্মারক পরবর্তী লোকে তা ধরতে পারে না। নন্দঘোষ যাত্রার আসল অর্থ না ধরে এমন ব্যাখ্যাও করা হয়েছে জগন্নাথের রথখানির নামই নন্দীঘোষ, তাই থেকে নন্দীঘোষ যাত্রা। আদি ভাগবত সম্প্রদায় নিশ্চয়ই জানতেন রথযাত্রার মূল কোথায়। আমরা গৌরাঙ্গদেবের কাছ থেকে সেই পুরাতন তথ্যই পেয়েছি। শ্রীমদ্ভাগবতেও শেষের দিকে শ্রীকৃষ্ণের নিয়মিত মথুরা বৃন্দাবন যাত্রার স্পষ্ট উল্লেখ আছে—শতবর্ষ বিরহের ইঙ্গিতই বরং পাইনা (ভাগবত ১।১০।৩৪ ; ১।১১।৯ দ্রষ্টব্য)।

অর্জুন-সুভদ্রা পরিণয়ের পরই রাজসূয়ের গোপন প্রস্তুতি আরম্ভ হয়। কুরু-পাঞ্চাল সভ্যতার সঙ্গে বাসুদেবের প্রশ্রয়লালিত নবধর্মের প্রকাশ্য শক্তি পরীক্ষার আয়োজন চলতে লাগল নেপথ্যে। কৃষ্ণা-সনাথ পঞ্চপাণ্ডব ভাবীকালের প্রতীক ·পুরাতন সমাজের গতিহীন অনুদারতা আর মূঢ় দম্ভকে আঘাত হানবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অস্ত্র স্বরূপ ব্যবহার করেছিলেন এঁদের···ওই ছয় জন শ্রীকৃষ্ণের মূর্তিমান ষড়যন্ত্র বললেও চলে। প্রবলের অত্যাচারে নিপীড়িত দুর্বল প্রজা স্বভাবতঃই যুধিষ্ঠির ও বাসুদেবের ভরসা করত। জরাসন্ধের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে বহু সামন্ত রাজা যে শ্রীকৃষ্ণের কাছে তাদের দুরবস্থার প্রতিকার করতে বলেছিলেন, ভাগবতে তার উল্লেখ আছে। ভারতবর্ষ যে

মনে মনে তাঁর নেতৃত্ব কামনা করছে, নানাদিক হতে এ আশ্বাস না পেলে স্থিরবুদ্ধি যুধিষ্ঠির-ই বা রাজসূয় যজ্ঞ করবার প্রেরণা পাবেন কোথায়? শ্রীকৃষ্ণ কোনও সময় পাণ্ডবদের ঘাড়ে জোর করে নিজের মত চাপিয়ে দিতেন না। তিনি অপেক্ষায় থাকতেন কর্মের সূত্রটা পাঁচভাই নিজেরা খুঁজে বার করুক, অন্তরের সংবেগে ক্রিয়াশীল হ'ক নিজেরাই, তারপর তিনি আছেন দিশারী। ওদের স্বতঃ-উৎসারিত প্রবৃত্তিকে মার্জিত করার দায় তাঁর—এর বেশি কিছু করতে হবে কেন? তাহলে ধর্মরাজ্য স্থাপনা তো হবে না, হবে শ্রীকৃষ্ণের রাজত্ব। তা তো বাসুদেব কখনও চাননি।

রাজসূয় যজ্ঞে কুরুক্ষেত্র মহাসমরের সূচনা হল। স্পষ্টই দেখা যায় সেই ঘোর সংগ্রামের মূলে রাজনীতির চেয়ে ধর্মনীতির প্রেরণাই প্রধান ছিল। "ধর্মক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ" কথাটা অন্বর্থ। রাজনৈতিক যুদ্ধ যদি হত, তাহলে ভীমার্জুনাদির দিগ্বিজয় কালেই যুদ্ধ বাধবার কথা। ঐতিহাসিক কালের মত সেই হাজার হাজার বছর আগেও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনে ভারতবর্ষ তেমন সচেতন নয়, অনেকটাই যেন উদাসীন। কৌরব দুর্যোধনের পরিবর্তে তাদের কোনও শাখা 'রাজচক্রবর্তী' হতে চায়? হোক না কেন! এক মগধ ছাড়া আর কোনও দেশই যুধিষ্ঠিরকে কর দিতে প্রবল আপত্তি তোলেননি। মগধরাজ নিজে চক্রবর্তী হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন বলেই হয়তো তাঁকে হত্যা করাই পাণ্ডবদের প্রথম কর্তব্য ছিল। অনায়াসে মগধের পরাজয় মেনে নিলেন ভারতীয় রাজন্যরা—একযোগে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন না। কিন্তু বিদ্রোহ দেখা দিল তখন, যখন সমবেত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দের মাঝখানে যুধিষ্ঠির শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য নিবেদন করলেন শৌরি বাসুদেবকে। প্রতিবাদ জানাতে উঠে শিশুপাল বললেন—হে পাণ্ডব! রাজগণ উপস্থিত থাকতে কৃষ্ণ কোন মতেই পূজার্হ হতে পারেন না। তুমি কার্যতঃ কৃষ্ণের অর্চনা করেছ, এ ব্যবহার তোমাদের উপযুক্ত নয়। তোমরা বালক সুতরাং ধর্মের কিছুই জাননা। যে সভায় ব্রাহ্মণদের মধ্যে আচার্য দ্রোণ ও বৃদ্ধ দ্বৈপায়ন উপস্থিত, ক্ষত্রিয়দের মধ্যে ভীষ্ম, দুর্যোধন, রুক্মী, মদ্রপতি শল্য, বা

কর্ণ রয়েছেন সেখানে কৃষ্ণকে অর্ঘ্য দিলে কেন ? আর যদি কৃষ্ণকেই অর্ঘ্য দিবে মনে মনে স্থির করা ছিল, তবে কি জন্য রাজন্যদের ডেকে এনে অপমান করলে ? "ধর্মপুত্রের ধর্মাত্মতা" এই যশ নিতান্ত অকারণ সন্দেহ নাই। কোন্ ধার্মিক পুরুষ ধর্মভ্রষ্ট ব্যক্তিকে সজ্জনোচিত পূজা করে থাকে ?" বাসুদেবকে প্রকাশ্যে পূজা নিবেদন করে সত্যই যুধিষ্ঠির প্রাচীন সমাজের মূল ধরে নাড়া দিয়েছিলেন। রাজসূয় যজ্ঞ সভায় শ্রীকৃষ্ণের কর্মজীবন আলোচিত হতে লাগল—শিশুপাল যে তাঁকে ধর্মভ্রষ্ট বললেন কেন, তার স্বপক্ষে বিপক্ষে তুমুল বাদাবিতণ্ডা শুরু হল। রাজ্য নয়, ধর্ম বিপন্ন···অতকাল আগেও ভারতবর্ষকে খেপিয়ে তোলার পক্ষে ওই জিগিরটাই যথেষ্ট।

পুরাণকার মিছে বলেননি যে শিশুপাল দ্বিতীয় রাবণ। রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁর নাম বহুখ্যাত ছিলনা কিন্তু কূটনীতিতে বাসুদেবের যোগ্য প্রতিপক্ষ তিনি। সাহস ছিল এ-ও বলতে হবে। বিরোধীপক্ষের মুখপাত্র হয়ে তিনিই প্রকাশ্যে ভারতপূজ্য বাসুদেবকে অতি সাধারণ একটা চালিয়াত্ বলতে পেরেছিলেন। বলতে গেলে প্রাচীন সমাজের চোখ খুলে দিলেন শিশুপাল—বিরোধের সূত্রগুলো ধরিয়ে দিলেন স্পষ্ট ভাষায়। তাঁর মূল বক্তব্য বাসুদেব সমাজ বিপ্লব ঘটাচ্ছেন, তাঁর হাতে বৈদিক আভিজাত্যের অমর্যাদা অবশ্যম্ভাবী। শিশুপালকে মরতে হল—কিন্তু ক্ষতি যা করার তা তিনি করে গেলেন। ভারতের ক্ষাত্রিয় গোষ্ঠী চকিত হয়ে উঠল—আগুন ধোঁয়াতে লাগল ভিতরে ভিতরে। রাজসূয়যজ্ঞান্তে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যুধিষ্ঠিরের কাছে গোপনে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেলেন মহাযুদ্ধ অনিবার্য এবং তুমি হবে তার উপলক্ষ্য।

রাজ্যহারা পঞ্চপাণ্ডব বনে নির্বাসিত হয়ে নবধর্মকে স্বীকার করার দাম দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের ভাগ্যবিপর্যয়ের খবরই পেলেন না। উদ্দীপ্ত রোষে সৌভপতি শাল্ব ও দন্তবক্রকে অধিনায়ক করে তাঁর শত্রুপক্ষ দ্বারাবতী আক্রমণ করেছিল। তিনি সর্বশক্তি নিয়ে যুঝতে লাগলেন। বাঘের মরণ কামড়ের মত এই শেষ দ্বারকা আক্রমণ। শত্রুদের পরাস্ত করতে রীতিমত বেগ পেলেন শৌরি। জয়লাভ

করেই সংবাদ শুনলেন, পাণ্ডবরা বিতাড়িত। রাগ যতখানি হয়েছিল সেই পরিমাণ আনন্দও হয়েছিল চক্রীর। ভাল করেই বুঝলেন ইন্ধন প্রস্তুত···অগ্নিকাণ্ড হতে বেশি দেরী নাই। দন্তবক্র বধ করে দ্বারকার প্রজাবর্গকে আশ্বাস দিয়ে যেমন দ্বৈতবনে এসে পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করলেন, তেমনি আবার ব্রজে গিয়ে বসন্তোৎসবে যোগ দিলেন (পদ্মপুরাণ দ্রষ্টব্য)। বৃন্দাবন ছাড়বার পর বসন্তোৎসবে ব্রজবাসীর সঙ্গে মেলা সেইবারই প্রথম। অত্যন্ত উল্লসিত হবার কারণ না ঘটলে সেবার বসন্তোৎসবে ব্রজে যেতেন না শ্রীকৃষ্ণ। তিনি দেখেছিলেন প্রবল শত্রু আর একজনও অবশিষ্ট নাই। সাম্রাজ্যলিপ্সু সদলবলে শেষ হয়েছে। এবার দুর্যোধনের নেতৃত্বে বাদ বাকী ক্ষত্রিয় গোষ্ঠী এক হয়ে গাণ্ডীবীর হাতে পুড়ে ছাই হবে। তাঁর অস্ত্র ধারণের পালা শেষ। এখন আবার গুরুরূপে ভাবতবর্ষের পথ নির্দেশ করাই একমাত্র কর্তব্য।

আপাতঃদৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ কর্মযোগী। প্রাচীন ভারতের সবগুলি মত ও পথের সমন্বয় তাঁর মাঝে ঘটলেও তাঁর জীবনের মূল সুর যেন ঃ—

"যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ গীতা ৩।২৩-২৪

মহর্ষি ব্যাস বোধহয় সেইজন্য কুরুক্ষেত্রকে শ্রীকৃষ্ণের প্রচার কেন্দ্র বলে চিহ্নিত করেছেন। কুরুক্ষেত্রে সূর্যগ্রহণোপলক্ষে সম্মিলিত ব্রজগোপীদের ব্রাহ্মী দীক্ষা দেওয়া হতেই যেন তাঁর গুরুগিরির সূচনা। ভাগবতকার ওই প্রসঙ্গে বলছেন "অধ্যাত্মশিক্ষয়া গোপ্য এবং কৃষ্ণেন শিক্ষিতাঃ। তদনুস্মরণ ধ্বস্ত জীবকোশাস্তমধ্যগম্ ॥" একদিন উদ্ধবের মুখে যে উপদেশ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন সেবার নিজের মুখে গোপ কুমারীদের সেই কথাগুলিই আবার বলে বিধিমত দীক্ষা দেওয়া হল। সেদিন থেকে নূতন সম্বন্ধটি পাকা হয়ে গেল—শুক তাই বলছেন

"ত্বথানুগৃহ্য ভগবান গোপীনাং স গুরুর্গতিঃ (১০।৮৩।১)। ধর্মকে যারা বুদ্ধির কষ্টি পাথরে যাচাই করতে জানে না একেবারে হৃদয়ে বরণ করে, সমাজের ভিত্তি স্বরূপ সেই স্ত্রী শূদ্রদের মাঝখানে অনেকদিন হতেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বাণী প্রচার করে চলেছিলেন। তাই ভারতভ্রমণে বেরিয়ে তাঁর লক্ষ্য থাকে ব্রজভূমি, মথুরায় এসে ওঠেন কুব্জার গৃহে, হস্তিনাপুরের বিরাম নিকেতন হয় বিদুরের বাড়ী। ওই সঙ্গে সমাজের বিবিক্ত ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীর সঙ্গেও নিত্য যোগ শ্রীকৃষ্ণের। জানেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সারসত্য লুকিয়ে আছে ওইসব ভিক্ষাব্রতী দরিদ্র কুটির বাসীদের মধ্যে, অনিকেত আরণ্যকদের বুকে। মিথিলায় গিয়ে রাজা বহুলাশ্বের আতিথ্য গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে অকিঞ্চন ব্রাহ্মণ শ্রুতদেবের আমন্ত্রণও শ্রীকৃষ্ণ স্বীকার করতেন। সতীর্থ সুদামা ব্রাহ্মণকে সিংহাসনে বসিয়ে পা ধুইয়ে দেওয়া বা রাজসূয় যজ্ঞে নিজে ব্রাহ্মণদের পাদ প্রক্ষালনের ভার নেওয়ার পিছনেও সেই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উত্তুঙ্গ মহিমার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন। তাঁর আসল সংঘর্ষ বেধেছিল সেকালের ক্ষাত্রিয় ধর্মের সঙ্গে—ধনমদ এবং শক্তিদম্ভে যারা সমাজের শাসন কর্তা···যারা একদিকে ব্রাহ্মণের পৃষ্ঠপোষক এবং বৈশ্য শূদ্র প্রমুখ প্রজা-সাধারণের আশ্রয়। চিরদিন এই শ্রেণীই সমস্ত নূতন আন্দোলনের বিরোধিতা করে। আবার এরা যখন সাদর সম্বর্ধনা জানায় তখন যে কোন মতবাদের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা অনিবার্য। ক্ষাত্রিয়রাই সমাজের সক্রিয় শক্তি···তারাই সমাজ ভাঙে গড়ে। অধ্যয়ন অধ্যাপনারত মনীষী ব্রাহ্মণের ভাবনাকে সার্থক কর্মে রূপ দেওয়াই ক্ষাত্রিয়ের জীবনব্রত। কিন্তু কই তা হয়? 'ক্ষত হতে ত্রাণ' করার পরিবর্তে অধিকাংশ ক্ষাত্রিয়-ই সমাজকে ক্ষতবিক্ষত করে তরোয়ালের জোরে। ক্ষত্রধর্মের পুনরভ্যুত্থানের জন্য রঘুপতি রাম জীবনপাত করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণও বিশেষ ক্ষত্রধর্মের সংস্কারক। এইজন্য মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় গীতার উদ্ভব। শ্রোতা স্বয়ং ক্ষাত্রিয় হলেও জীবন সংগ্রামে বীতস্পৃহ ব্রাহ্মণের ভৈক্ষ্যচর্যাই তাঁর শ্রেয় বোধ হচ্ছে আর বক্তা তাঁকে যুদ্ধে প্ররোচিত করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন বুদ্ধির বিকারে ক্ষাত্রিয় স্বধর্মভ্রষ্ট হয়েই বিশ্বকে পীড়ন করে। বস্তুতঃ ক্ষত্রধর্মেই জগতের স্থিতি।

ব্রহ্মধারার সঙ্গে ক্ষত্রধারার বিরোধ থাকার কথা নয়। দুটি ধারার গঙ্গা-যমুনা প্রবাহে আর্যাবর্ত ভূমি উর্বর হওয়ারই কথা ("যস্য ব্রহ্মা চ ক্ষত্রং চ উভে ভবত ওদনঃ"—কঠোপনিষৎ)। তার পরিবর্তে এ কি? ব্রহ্মভাবনার সঙ্গে অসহযোগিতার ফলে ক্ষত্রকর্ম হয়ে দাঁড়াচ্ছে বিকর্ম। আর দুষ্কৃতকারী ক্ষত্রিয়কেই ক্ষত্রধর্মের প্রতিভূ ভেবে ব্রাহ্মণ শুদ্ধ জ্ঞান-যোগ আশ্রয় করে দিনে-দিনে দূরে সরে যাচ্ছেন। জ্ঞান-কর্মে দুস্তর ব্যবধানের ফলে সমস্ত ভারতবর্ষই ধর্মসংমূঢ়চেতা। ক্ষত্র শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করে সমগ্র ভারতকেই সম্বোধন করেছিলেন বাসুদেব। বিশেষ করে একটি ক্ষত্রিয়ের উদ্দেশ্যে কথা বলার অর্থ অত্যন্ত স্পষ্ট—আমরা তো বলেইছি সমাজ ভাঙা-গড়ার দায় ক্ষত্রিয়দেরই হাতে। ভারতের কর্মী সন্তানদের শ্রীকৃষ্ণ তাঁর জীবনব্যাপী ভাবনার ফল তুলে দিতে চেয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অষ্টাদশ অধ্যায়ে তাঁর সেই যোগ-সমন্বয় বার্তা সঙ্কলন করেছেন ঃ— "সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্‌ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ। একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্‌ ॥ যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌ যোগৈরপি গম্যতে। একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥" গীতা ৫।৪-৫।

বিশাল বুদ্ধি ব্যাস দেবের দৃষ্টিতে কুরুক্ষেত্রে অন্য কোন প্রহরণ ধারণ করেননি শ্রীকৃষ্ণ—গীতাবাক্যই তাঁর একমাত্র অস্ত্র। তিনি নরদেবতার সারথি—ব্রহ্ম-ক্ষত্রের মিলিত বিগ্রহ পুরুষোত্তম। গুরুভাবে আবিষ্ট হয়ে সিংহনাদে বলছেন—যদি ধর্মাধর্ম কর্মাকর্ম কিছুই শেষ পর্যন্ত নির্ণয় করতে না পার "সর্ব্বধর্ম্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥" আমি বলছি তোমায় যুদ্ধ করতে হবে—ক্ষত্রধর্ম ছাড়লে চলবে না—আমার আদেশ মনে করে ঝাঁপিয়ে পড় জীবন সমরে। নরঋষি কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন, 'তোমার আদেশ শিরোধার্য"।

আমরা শরণাগতির নামেই বড় উল্লসিত হই। ভুলে যাই মহাযুদ্ধের মাঝখানে গীতার আবির্ভাব…পার্থসারথির শরণাপন্ন হওয়ার অর্থ তাঁর 'যুধ্যস্ব' এই আদেশ প্রতিপালন। ক্লীবের শরণাগতিতে ভগবান প্রসন্ন হননা। তিনি চান ক্ষত্রিয়ের

শরণাগতি—সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্‌ব্যপাশ্রয়ঃ। মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্‌॥ গীতা—১৮।৫৬

ভাগবতে স্পষ্টই আছে, ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয়কুল সংহার করাই বাসুদেবের অন্যতম নীতি ছিল। কংস বধ থেকে যার শুরু—যদুকুল ধ্বংসে তার শেষ। তাহলে তিনি ক্ষত্র ধর্মের সমর্থক হলেন কেমন করে? কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তিনিই তো ভারতবর্ষের ক্ষাত্র শৌর্য গুঁড়িয়ে দিয়েছেন! ব্রাহ্মণের রোষে যদুবংশ শেষ হয়ে গেল, কোন প্রতিকার করলেন না তিনি। তাঁর প্রচার সচিব দ্বৈপায়নও একজন ব্রাহ্মণ। গীতাকে বলা হয়েছে সর্ব্বোপনিষদের সার···ব্রাহ্মণ্য ধর্মের চূড়াই তো উপনিষৎ। এরপরও বলব শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ করে ক্ষত্রধর্মেরই পৃষ্ঠপোষক? না তাঁকে বিশেষ করে ভাগবৎ ধর্মের প্রচারক বলব? পরবর্তী বৈষ্ণব ও সন্তদের ভক্তিযোগের মূলে তাঁরই প্রেরণা নাই কি?

আমাদের মতে ভাগবত ধর্মে প্রেম ও অহিংসা যেমন থাকবে তেমনি ধর্মযুদ্ধ ও কর্মযোগও থাকবে। ক্ষত্রিয় বা বৈষ্ণব বলতে আমরা যে আদর্শগত বিরোধ কল্পনা করি এটাও ভারতবর্ষের একটা ধর্ম সংমোহ। পুরাণেতিহাসে দেখি নারায়ণাবতার মাত্রেই ক্ষত্রাচারী—ব্রাহ্মণ পরশুরামও তো বৈষ্ণবীশক্তিতে আবিষ্ট হয়ে রক্তস্রোতে পৃথিবী ভাসিয়ে দিয়েছেন। বৈষ্ণবের পরমদেবতা যিনি, দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন তাঁর একমাত্র ব্রত। অথচ তাঁর উপাসক সম্প্রদায় নিজেদের কীটস্য কীট ভেবে সব ছেড়ে কেবল হরি সংকীর্তন করবেন—এ ভাবটা এল কোথা হতে? পাছে বৈষ্ণবদের মনে ধর্মের নামে সংসার কর্তব্য অবহেলার বাতিক দেখা দেয় এই আশংকায় শ্রীচৈতন্য তাঁর দ্বিতীয় দেহ নিত্যানন্দকে সংসারী হতে বাধ্য করেছিলেন। অবধূতের দারপরিগ্রহটা কি শুধুই পাগলের খেয়াল? পাঁচশ বছর পরে আবারও অনুরূপ দৃষ্টান্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ বারবারই গাইতেন, "যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে তারা দু' ভাই এসেছে রে।" অথচ জ্ঞান কর্ম-ভক্তির বিরোধ এবং ব্রহ্ম-ক্ষত্রের পার্থক্য নিরসনের পথে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের প্রয়াস আরও তীব্র। একজন সন্ন্যাসী হয়েও কোন দিন সংসার ছাড়েন নি। অন্যজন

সংসার ছেড়ে গেরুয়া ও ভিক্ষাটন ধরলেও সমাজ সংস্কার দেশহিতৈষণা নিয়েই প্রাণপাত করেছেন। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ কি অবৈষ্ণব ?* তাঁরা অন্তত তা মনে করতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ যদি ইঙ্গিত করে থাকেন গৌর নিতাইয়ের মত আমরা দুজনও এসেছি প্রেমভক্তি বিতরণ করতে, বিবেকানন্দের ইঙ্গিতটাই বা ভুলব কেন ? তিনি বলতেন আমি ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় ও বৈষ্ণবের মিল কোথায় আর ভাগবৎ ধর্মের প্রাণ পুরুষ ক্ষত্রধার নিরস্ত করে ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে বড় করতে চেয়েছিলেন কিনা— এই প্রশ্নগুলির মীমাংসাপেতে হলে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের দ্বারস্থ হওয়াই ভাল।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নিজহাতে গড়া নারায়ণী সেনাকে বাসুদেব বলি দিয়েছিলেন। হয় তো তাঁর ভয় ছিল, দুর্ধর্ষ নারায়ণী সেনা হতে কালে দিনে নূতন কোনও ক্ষত্রিয় শক্তির উদ্ভব ঘটবে। নারায়ণী সেনারা গোপ অর্থাৎ বর্ণবিচারে বৈশ্য বা বিশ্‌। বিশ্‌ হতে ক্ষত্রিয় পদে উন্নীত অতি সাধারণ ব্যাপার। ক্ষত্রিয় গোষ্ঠীতে যেসব দৃঢ়মূল ভ্রান্তি জন্মেছিল···গোড়া ধরে উপড়িয়ে না ফেললে তার প্রতিকার সম্ভব নয়। এই জন্য তদানীন্তন ক্ষত্রিয় সমাজকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিলেন বাসুদেব। যেখানে এতটুকু ক্ষাত্রদম্ভের অঙ্কুর দেখেছেন সেখানেই তিনি নির্মমের মত আগুন জ্বালিয়েছেন। তাতে কি বলা চলে তিনি আসলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পক্ষপাতী ছিলেন ? তিনি ক্ষত্রধর্মের সংস্কারক এইটাই বলা সঙ্গত।

কুরুক্ষেত্র সমরের পর দ্বিতীয় ক্ষত্রক্ষয়-পর্ব যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ। গীতা প্রবক্তাকে অস্ত্র ধারণের দায় হতে রেহাই দিয়ে তাঁর প্রিয়সখাই কঠিন কর্ত্তব্য পালন করে চলেন। নিজ সংবেগেই ধর্মরাজ্যের ভিত্তি দৃঢ় হতে দৃঢ়তর হচ্ছে দেখে শ্রীকৃষ্ণ সম্ভবতঃ এই সময় বেশির ভাগ দেশভ্রমণেই মন দিয়েছিলেন। মহাজনতার মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিলেন ক্রমে ক্রমে···মথুরা ছিল তাঁর কেন্দ্র, ব্রজপুরী মহদন্তঃপুর। অশ্বমেধ শেষে যখন বাসুদেব দ্বারকা-গমনোন্মুখ, কুরুনারীরা বলাবলি করছে ব্রজবালাদের কি ভাগ্য ! আদি পুরুষ নারায়ণকে

* বৈষ্ণব ও শাক্তের সংজ্ঞা প্রেমিকগুরু (১২৩—২৭ পৃষ্ঠায়) দ্রষ্টব্য। আসলে পঞ্চোপাসক মাত্রেই ভাগবত···কিন্তু সমস্ত সংজ্ঞাই আজ দুর্ব্যাখ্যা-বিষ-মূর্চ্ছিতা !

সহজভাবে নিবিড় করে পেয়েছে তারা (১।১০।২৮)। আবার দ্বারকা প্রবেশ কালে প্রজাবৃন্দ বলছে নাথ! আপনি দীর্ঘ প্রবাসে থাকলে (ত্বয়ি চিরোষিতে) আপনাকে না দেখে আমরা বাঁচি কি করে। আপনি কুরু ও মগধরাজ্যে যখন চলে যান তখন সূর্য বিনে জগৎ আঁধার হওয়ার মত আমাদের সবই আঁধার ঠেকে, ("যর্হ্যম্বুজাক্ষাপসসার ভো ভবান্ কুরূন্ মধূন্ বাথ সুহৃদ্দিদৃক্ষয়া"— ১।১১।৯)। রাষ্ট্রিক প্রয়োজন শেষ হওয়া মাত্র আবার মধুপুরীর সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ঘটেছিল মাধবের···ব্রজবাসীরা তাঁর দাক্ষিণ্য পেয়ে ছিল। বৈদিক সভ্যতার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও তাঁর ধর্মকে এই জনসাধারণ-ই সর্বশক্তি দিয়ে বাঁচাবে তিনি জানতেন। শূদ্র যে বিরাট পুরুষের পদ স্থানীয়, বৈশ্য উরুদেশ··· প্রগতির বাহন ওরাই। যে ধর্ম বৈশ্য শূদ্রকে প্রভাবিত করতে পারে না তার অকাল মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। পুরুষোত্তম তাঁর গভীর ভালবাসায় ভারতের অবহেলিত গণ-শক্তিকে দৃঢ় বন্ধনে বেঁধেছিলেন। মনে পড়ে কুরুক্ষেত্রে বৃষ্ণি-গোপ সঙ্গম কালে যাজ্ঞসেনী কৃষ্ণা দ্বারকার অষ্ট মহিষীকে শুধাচ্ছেন, তোমরা কে কিভাবে ভগবানকে পেয়েছ বল, আমরা শুনি। দ্বারকা মথুরা হস্তিনা ইন্দ্রপ্রস্থের সম্ভ্রান্ত মহিলাদের সঙ্গে কৃষ্ণসখী গোপিকারা এবং তাঁর গোকুলের অন্যান্য আত্মীয়ারাও সেখানে উপস্থিত। কৃষ্ণার প্রশ্নটিতে গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল বলে সন্দেহ হয়—বাসুদেবের কর্মসঙ্গিনী তো তিনিই! মহিষীরা যে যার অভিজ্ঞতার কথা বলতে লাগলেন·· দেখা গেল সকলেই দীন ভাব···তিনি প্রভু, আমি তাঁর দাসী, এর চেয়ে বেশি দাবী করতে সাহস পাচ্ছেন না কেউ। গোপিকাদের চোখ ছলছল করে—রাজকুমারীরা যাঁকে এত সম্ভ্রম করেন তিনি যে ব্রজবাসিনীদের অজস্র কটূক্তি শুনে হাসেন। কথা হতে হতে শেষে ঠিক ওই প্রসঙ্গই এসে গেল—কৃষ্ণ প্রেয়সীরা বলে উঠলেন 'ব্রজস্ত্রিয়ো যদ্বাঞ্ছন্তি পুলিন্দ্যস্তৃণ বীরুধঃ। গাবশ্চারয়তো গোপাঃ পাদস্পর্শং মহাত্মনঃ॥' (১০।৮৩।৪৩)। গোকুলের গোপ গোপী দূরে থাক অনার্য শবরীরা এবং তৃণতরু ও গোবৃন্দ যে ভাবে তাঁকে চায় আমরাও তেমনি করে তাঁকে চাই। কৃষ্ণপত্নীদের আর্তি শুনে

সুভদ্রা দ্রৌপদী প্রমুখ মহীয়সী মহিলারা সবিস্ময়ে চোখের জল ফেলেন, গোপীরাও না কেঁদে পারেন নি। কিন্তু সে অশ্রুর সঙ্গে অনেকখানি আনন্দ মেশেনি কি? তবে শুধুই কৃপা নয় অবিমিশ্র করুণাও নয়—মাধব সত্যই ভালবাসেন গোকুলবাসীকে? যাজ্ঞসেনীর কৌশলে তাদের সৌভাগ্যের কথা আজ ভারতবাসী সবাই জেনে গেল।

গোকুলবাসী সবাই জানত না তাদের পরে কতখানি ভরসা বাসুদেবের। তিনি অহোরাত্র অনুভব করতেন একটি অর্জুনকে গীতা উপদেশ করে ভারত ভূমিকে জাগানো যাবে না, চাই আসমুদ্র-হিমাচলে সমষ্টি-চিত্তের উদয়ন। শেষ জীবনে তিনি সেই তপস্যাই করে গিয়েছিলেন। আজ মিথিলা কাল অবন্তী, তার পরদিন ইন্দ্রপ্রস্থ। সেখান থেকে হয় তো কেকয়, মদ্র, গান্ধার হয়ে সিন্ধু সৌবীরের পথে রৈবতক—মধুপুরীকে কেন্দ্র করে যেন ভাবী ভারত পরিদর্শন করে বেড়াতেন শৌরি। বিন্ধ্যাচলবাসী শবরদের আতিথ্য নিয়ে চলে যেতেন সুদূর দক্ষিণে। যেখানে যেতেন সেখানেই তিনি দীনবন্ধু···পতিত পাবন সবার সঙ্গে তাঁর হৃদয়ের যোগ। মহাভারত ও ভাগবতে তাঁর এই পথে পথে থেমে লোকসঙ্গ আর জনতার প্রীতি কুড়ানোর যে দু'একটি মনোজ্ঞ চিত্র আছে তাতেই দৃষ্টি খুলে যায়। তাঁকে মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্ ভেবে ভয়মিশ্রিত কৌতুহলে শিশুর মত এক পা দু'পা করে কাছে আসত জনপদবাসীরা। এসে দেখত কই না তো! এঁকে দূরে সরিয়ে রাখবার কোন কারণ তো নাই, ইনি যে আমাদের ভালবাসার কাঙ্গাল। তাঁর পুষ্যরথের পিছু পিছু দেওয়ানা ভারত মেঠো সুরে গাইতে থাকে "বঁধুর গলায় বনমালা, মালা নয় সে বিষের জ্বালা। মালা বড় শোভা কর্যাছে। মধুর লোভে ছোটে অলি, ঝাঁকে-ঝাঁকে যায় গো চলি। তারা বঁধুর লগে মিল্যাছে, ও নাগরী!" হাসতে গিয়ে যদুপতির চোখে জল আসে, মনে হয় বাউল বেশে মিশে যাই ওদের দলে। কিন্তু তখনও সময় হয় নাই তাই রাজবেশ ছাড়তে পারেন না। তাঁর স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে সস্নেহ স্বীকৃতি—তোমাদের অর্ঘ্য আমি মাথায় তুলে নিয়েছি।

যাদব ঐতিহ্যের সার সঞ্চয়গুলি মণিরত্নের মত অন্তরে গ্রহণ করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। মহাপুরুষ যদুর নাম নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন তিনি কিন্তু যেতে যেতে যাদবদের তিনি ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। অনেকদিন আগেই বুঝেছিলেন যাদব পৌরবে বড় বেশি তফাৎ নাই। অনর্থের এপিঠ আর ওপিঠ মাত্র, আসলে যাদবরাও ক্ষমতালিপ্সু অভিজাত হয়ে গেছে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি যাদবদের সুচিরপোষিত অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ বাসুদেবের কাছে পীড়াদায়ক। কারণ ত্রয়ীর পরভাগ যে তাঁরই মর্মবাণী এ বিষয়ে তাঁর সন্দেহ ছিল না—অর্জুনের কাছে উদাত্ত কণ্ঠে বলেছেন, "বেদান্তকৃদ বেদবিদেব চাহম্"। কুরুকুলের একদেশদর্শিতা যিনি ক্ষমা করেননি যাদব গোষ্ঠীর অন্ধত্ব তিনি সইবেন কেন?

বারবার যদুকুলকে বুঝিয়েছেন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম অবহেলার বস্তু নয়—ব্রহ্মরোষকে আমিও ভয় করি। কে কার কথা শোনে? প্রমত্ত যাদবরা ভাবছে পাণ্ডবরা তো একরকম নির্বংশ। যুধিষ্ঠিরের উত্তরাধিকার মিলবে অভিমন্যু-তনয় পরীক্ষিতের। তারপর আর আমাদের পায় কে? ধ্বংসাবশিষ্ট ক্ষত্রিয়রাও তাই ভাবত নিশ্চয়—শ্রীকৃষ্ণ সুকৌশলে সারা ভারত যাদবদের ছত্রতলে এনে দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে হাসতেন—'স্বকর্ম্ম ফলভুক্ পুমান্'—যাদবেরা গৃহবিবাদেই মরবে···নিজেদের দুষ্কৃতিতে নিজেরাই জড়িয়ে পড়বে। ঠিক কি হয়েছিল বোঝা যায়না—কেবল এই টুকু স্পষ্ট যে একদল বিখ্যাত ব্রাহ্মণকে অবমাননার পরে যদু সভায় কলহ বাধে। ইচ্ছা করলে শ্রীকৃষ্ণ মধ্যস্থ হয়ে সব থামিয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু তা তিনি করেন নি। ব্রহ্মশাপে যাদবেরা ভস্ম হয়ে যাক এই তিনি চেয়ে ছিলেন। সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণদের লাঞ্ছনাটা ভাল না মন্দ এই নিয়ে-ই কথা কাটাকাটির শুরু—ক্রমে রীতিমত বিবাদ, হাতাহাতি। শ্রীকৃষ্ণ শেষদিকে ভাসাভাসা রকম শান্তিস্থাপনের চেষ্টা করলেন। তবে তা নিতান্তই মৌখিক। জ্ঞাতিবিরোধের ফলে প্রদ্যুম্ন ধরাশায়ী হতেই রুদ্রমূর্তি ধরলেন শ্রীকৃষ্ণ। বলতে গেলে তাঁর হাতেই যাদব কুল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

বিপুল বিক্রমে কর্মাবর্ত সৃষ্টি করেছেন বাসুদেব। উত্তাল তরঙ্গভঙ্গের মত

ভারতের ক্ষত্রশক্তি আছড়ে পড়েছে তাঁর চারপাশে, তিনি একা অনায়াসে সমরসিন্ধু পার হয়ে গেছেন বারবার। অত্যুজ্জ্বল কর্ম জীবনের ছটায় তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিষ্প্রভ হয়ে মিলিয়ে গেছে হারিয়ে গেছে বিস্মৃতির অতলে। যে-টুকু ছবি চোখে পড়ে, সে বড় দুঃখের ইতিহাস। বার বৎসরের তপস্যায় রুক্মিণীর কোলে প্রদ্যুম্নকে এনে দিয়েছিলেন তিনি—সূতিকাগার হতে সে ছেলে চুরি গেল। শাম্বকেও শিবের আরাধনায় পেয়েছিলেন, তাঁর হল কুষ্ঠ। শান্তিপর্বের ৮১ অধ্যায়ে নারদ বাসুদেব সংবাদে শুনি বাসুদেব সক্ষোভে নারদকে বলছেন 'জ্ঞাতিদের ঐশ্বর্যের অর্ধাংশ দিয়েও আমি তাদের কটু কথা সহ্য করে যেন তাদের দাসের মত রয়েছি। তাদের দুর্বাক্য সর্বদা আমার হৃদয় দগ্ধ করছে। বলরাম গদ প্রদ্যুম্নাদি আমার সহায় থাকতেও আমি অসহায়। এক জনকে স্নেহ দেখালে অন্যের রোষভাজন হব—এই ভয়ে সর্বদা নিরপেক্ষ থাকতে হয়। অথচ যাদের ভালবাসি তাদের একেবারে ছাড়তেও আমি পারি না'। এর উত্তরে নারদ তিরস্কার করে বলেছিলেন, 'নিজ কর্মদোষেই দুঃখ পাচ্ছ তুমি। স্বোপার্জিত সম্পত্তি পরকে দিতে গেলে কেন? ঐশ্বর্যলোভে যাদবরা দিবারাত্রি তোমায় পীড়ন করছে···কখনও স্বপক্ষ হয়ে তোষামোদ করছে, কখনও বিপক্ষ হয়ে যাচ্ছে। যা ত্যাগ করেছ তা আর নিজে ফিরিয়ে নেবে কি করে? অক্রোধের দ্বারা ক্রোধ, সদাচার সহায়ে ক্রূরাচারীদের বশ করা ছাড়া তোমার আর উপায় কি? প্রাশান্তচিত্ত মহাপুরুষ ভিন্ন গুরুভার আর কে বইতে পারে? সুতরাং তুমি নিজগুণে এ ভার বহন কর'। ভাগবতের এক জায়গায় আছে, উদ্ধব বলছেন "ত্রৈলোক্যেশ্বর হয়েও তিনি যে সিংহাসনস্থ উগ্রসেনের সামনে দাঁড়িয়ে 'দেব অবধারণ করুন' বলে যদুরাজের কিঙ্করত্ব করতেন সে কথা ভাবলে আমাদের বড় কষ্ট হয়" (৩।২।২২)। আমরা বলি, তার চেয়েও দুঃখের কথা, উদ্ধব বা অর্জুনের মত অন্তরঙ্গ মিত্রও সব সময় তাঁর সহজভাব ধারণা করতে পারতেন না, ভুল বুঝতেন। বিদুরের কাছে উদ্ধব সরলভাবেই বলছেন শ্রীকৃষ্ণ অনন্তবীর্য হয়ে-ও শত্রুভয়ে মথুরা হতে পলায়ন করলেন 'এতৎ মাং খেদয়তি'। অকুণ্ঠিতাখণ্ড

সদাত্মবোধঃ হয়েও যে শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রণাকালে উদ্ধবকে ডেকে মূঢ়ের মত কর্তব্য বিষয়ে প্রশ্ন করতেন তাতে উদ্ধবের মনে ধাঁধা লাগত। সখাকে হারিয়ে অর্জুনও যুধিষ্ঠিরের কাছে হাহাকার করে বলেছিলেন "শয্যাসনাটন বিকত্থন ভোজনাদিষ্বৈক্যাদ্বয়স্য ঋতবানিতি বিপ্রলব্ধঃ। সখ্যুঃ সখেব পিতৃবৎ তনয়স্য সর্ব্বং স্নেহে মহান মহিতয়া কুমতেরঘং মে॥" অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতার ফলে অর্জুনের মনে সম্ভ্রমবোধের আতিশয্য ছিল না। চক্রীর নিরঙ্কুশ ব্যবহারের প্রতি কটাক্ষ করে তিনিও কখন-কখন বলতেন 'এই কি তোমার ঋতাচার সখা'! অর্জুনের পরিহাস হয়তো কাঁটার মত বিঁধত বুকে তবু বাসুদেব হাসিমুখে সব মেনে নিয়েছেন। ক্ষত্রিয়ের মহিমায় জীবন ব্যাপী যত বঞ্চনা যত ব্যাথা অনায়াসে সয়ে স্বকার্য সাধন করে গেছেন তিনি। আবারও গীতা উদ্ধৃত করি "জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ। শীতোষ্ণ সুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ॥"

যদুকুল ক্ষয়ের সূচনা দেখেই উদ্ধব বুঝেছিলেন প্রভুর কাজ শেষ হয়ে এল। এইবেলা যা জানার তা জেনে নিই। একান্তে ভক্ত উদ্ধব প্রশ্ন করলেন, প্রভু! বৈরাগ্য বলে জ্ঞানযোগীরা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। কিন্তু আমাদের মত যারা সংসার বর্ত্মে বিচরণ করতে করতে তোমার লীলানুস্মরণে তোমার কথা কীর্তন করে দিন কাটায় তারাওতো তোমার দুস্তর অন্ধ তমিস্রা পার হয়ে যায়! আমার ধারণা কি সত্য?

"বাতবসনা ঋষয়ঃ শ্রমণা ঊর্দ্ধমন্থিনঃ। ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোহমলা বয়ন্তিবহ মহাযোগিন্ ভ্রমন্তঃ কর্ম্মবর্ত্মসু। তদ্বার্ত্তয়া তরিস্যামস্তাবকৈর্দুস্তরং তমঃ॥ স্মরন্তঃ কীর্ত্তয়ন্তস্তে কৃতানি গদিতানি চ। গত্যুৎস্মিতেক্ষণক্ষ্বেলি যন্নৃলোক-বিড়ম্বনম্॥"

একাদশ স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায় হতে উনত্রিশ অধ্যায় ভগবদুদ্ধব সংবাদ। এই তেইশটি অধ্যায়ে ভাগবত সম্প্রদায়ের যাবতীয় ইতিকর্তব্য নির্দেশ করা হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'যাকে জাননা তাকে ভালবাসবে কি করে'? ভগবানও তেমনি উদ্ধবকে আগে ভগবত্তত্ত্ব ধারণা করার জন্য জ্ঞান বিচার ও মোক্ষযোগের

উপাদেয়তার কথা বলে নিলেন। কিন্তু চিত্ত উন্মুখ না হলে বিচার বা মুমুক্ষুত্ব আসবে কেন? তাহলে উপায়? ভগবান বলেছেন, 'ন বোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম এব চ। ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগোনেষ্টা পূর্ত্তং ন দক্ষিণা॥ ব্রতানি যজ্ঞচ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ। যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্॥' মহাজনকে ভালবেসে তাঁর অনুবর্তন করলে যেমন অনায়াসে চিত্ত-দুয়ার খুলে যায় এমনটি আর কিছুতেই হয় না।

একাদশস্কন্ধের এই দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তিযোগের মূলমন্ত্র গুরুবাদের কথা বলতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য প্রাচীন ভক্তদের নামের সঙ্গে কুব্জা ব্রজগোপী ও মহাবনের ব্রাহ্মণীদের উল্লেখ করেছেন। "তে নাধীতশ্রুতিগণা নোপাসীত-মহত্তমাঃ। অব্রতাতপ্ততপসো মৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ॥" তপ-জপ-স্বাধ্যায় কিছুই করেনি তারা, কেবল আমায় ভালবেসেছিল—তাতেই "ব্রহ্মং মাং পরমং প্রাপুঃ।" বিশেষ করে গোপী প্রেমের মহিমা কীর্তন করেছেন শ্রীকৃষ্ণ। বলছেন 'অমনি করে সব ছেড়ে আমায় যদি ভালবাসতে পার আর চাই কি'? কিন্তু কথাটা শুনতে যত সহজ আসলে তত সহজ নয়। স্বামীপুত্র আত্মীয়স্বজন থাকা সত্ত্বেও গোপিকারা এভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসল কি করে? জগতে আর কি মানুষ ছিলনা? তাহলেই বলতে হয় এটি গোপীচিত্তের মহিমা। কাদা ধুয়ে গেলে লোহা আর কোনও মতে দূরে থাকে না, চুম্বকে এসে লাগে। জন্মজন্মান্তরের সাধনায় চিত্তশুদ্ধি ঘটলে তবেই না মহামানবকে প্রিয় হতে প্রিয়তম মনে হয়। তার প্রস্তুতি চাই না? সুতরাং গোপীপ্রেমের কথা শুনে উদ্ধব যখন বললেন 'হে যোগেশ্বর! আপনার সম্বন্ধে আমার সংশয় এখনও ঘোচেনি', তখন বাসুদেবকে সবিস্তারে বর্ণাশ্রম-ধর্ম এবং ধাপে ধাপে মন কেমন করে এগিয়ে যায় তারই ইতিহাস বোঝাতে হয়েছে। উপদেষ্টার মহতীবাণী শুনতে শুনতেই জিজ্ঞাসুর সর্বসংশয় ছিন্ন হয়ে গভীর শ্রদ্ধা গভীরতর হয়। উদ্ধবের তাই হল। তাঁর বুদ্ধি স্থির হয়েছে বুঝে যে প্রশ্ন তুলে কথা শুরু করেছিলেন উদ্ধব, তার স্পষ্ট উত্তর দিয়ে কথা শেষ করলেন শ্রীকৃষ্ণ। 'উদ্ধব, আমিই তোমার পরমাশ্রয়'!

"হন্ত তে কথয়িষ্যামি মম ধর্ম্মান্ সুমঙ্গলান। যান্ শ্রদ্ধয়াচরন্ মর্ত্ত্যো মৃত্যুং জয়তি দুর্জয়ম্।" আমায় স্মরণ করে সব কাজ কর। অভ্যাস যোগ সহায়ে ধীরে ধীরে মনটুকু সব আমায় সঁপে দাও। সাধুভক্তদের সঙ্গ এবং আমার চরিতাবলী শ্রবণ, সামর্থ্য মত একা বা দশজনে মিলে মহাসমারোহে আমার পর্ব যাত্রাদিতে নৃত্যগীতাদি কর। সেই সঙ্গে 'বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি' এই ভাবটি ভুলোনা। যাও, যোগ্য ব্যক্তিকে এ ধর্ম উপদেশ কর গিয়ে—ভক্তিমান শূদ্র-যোষিৎদেরও এ ধর্ম উপদেশ করায় দোষ নাই। বাবা! আমিই তোমার চতুর্বিধ পুরুষার্থ সিদ্ধ করব ("যাবানর্থো নৃণাং তাত তাবাং স্তেহহং চতুর্ব্বিধঃ")।

যে-প্রভাসে পাঞ্চজন্য হাতে তুলে নিয়েছিলেন সেইখানেই তাঁর সারথি প্রত্যক্ষ করল দিব্যায়ুধ খসে পড়ছে বাসুদেবের হাত হতে, শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে গরুড় লাঞ্ছিত জয়কেতন। এবার যাবার সময় হল তাঁর।

সবার অগোচরে ঝড়ের রাত্রে কারাগারে এসেছিলেন পুরুষোত্তম, যাবার বেলাতেও তিনি সবাইকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেলেন। দারুককে বললেন, 'তুমি অর্জুনকে যদুকুলক্ষয়ের বার্তা দিয়ে দ্বারকায় নিয়ে এস।' বসুদেবকে বললেন, 'মহাশয়! অর্জুন আপনাদের ভার নেবেন। যাদবদের বিরহে এই পুরী আমার চোখের বালি হয়েছে। আমি বনে গিয়ে বলদেবের সঙ্গে তীব্রতর তপস্যা করব।'

ভাগবত-প্রবক্তা বলছেন বাসুদেবের বিদায় মুহূর্তে মৈত্রেয় ঋষি এসে উপস্থিত। সম্মুখে মহাসমুদ্রের হাতছানি, পিছনে ব্রহ্মবৃক্ষ অশ্বত্থ—বিশ্বমৈত্রীর স্বপ্ন দেখতে দেখতে যোগারূঢ় বাসুদেবের আয়ত নেত্র ঘুমে জড়িয়ে এল। ঘুম না 'যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ'? কোন কথা হয়নি মৈত্রয় ঋষির সঙ্গে—নতশিরে কোনও গুরুভার মাথায় তুলে নিচ্ছিলেন ঋষি—আনন্দছটা মুখে। 'প্রমোদ-ভারানত কন্ধর' মৈত্রেয় ঋষির বর্ণনাটি পড়লে মনে হয় ভাবীকাল যেন নীরবে 'অস্তং গমিত মহিমা' অতীতের উত্তরাধিকার তুলে নিল। মাটির বুকে পড়ে রইল বাসুদেব-কৃষ্ণের মরদেহ।

যাবার আগেও অর্জুনকে কর্মভার দিয়ে গেলেন শ্রীকৃষ্ণ—তাঁর সংসারের দায় অর্জুন ছাড়া কে বইবে? উদ্ধবকে দিয়ে গেলেন ব্রজভাব—তাঁর প্রেমের দায়।

কিন্তু কুরুক্ষেত্রের প্রাক্কালে পরিত্যক্ত গাণ্ডীব আবার যিনি হাতে তুলে দিয়েছিলেন আর তো সারথিরূপে রথ পরিচালনা করছেন না তিনি। ভারতবর্ষের কানে এসে পোঁছায় হিমালয়ের আহ্বান—শিথিল হাত হতে গাণ্ডীব খসে যায়। ব্যাসের মুখে নরঋষি নিশ্চয় করে শুনে নেন প্রভুর চাপরাশ মিললে তবেই কর্মযোগ—তা ছাড়া সব কাজই চক্র-ভ্রমিমাত্র। ও মোহ ছুটে যাওয়াই ভাল। মোক্ষযোগ মাথায় নিয়ে ঘর ছাড়েন অর্জুন।

উদ্ধবকে দেখি যমুনাতীরে,—গোপ-গোপীদের সঙ্গ করছেন বুঝি? ব্রজরাজ নন্দ কি চলে গেছেন হিমালয়ের পথে? নন্দপ্রয়াগের গোপালমন্দির আর নন্দ নামে কোন রাজা সেখানে তপস্যা করেছিলেন—এ কিংবদন্তির মূল কোথায় কে বলবে। যাই হোক বদরিকাশ্রমে যাওয়ার পূর্বে উদ্ধব যে যমুনাতীরেই বাস করছেন এ সংবাদটি মূল্যবান। সেইখানে বিদুরের সঙ্গে তাঁর দেখা—"কালেন যাবদ্‌ যমুনামুপেত্য তত্রোদ্ধবং ভাগবতং দদর্শ।" উদ্ধব যেন বিদুরেরই প্রতীক্ষায় ছিলেন। তাঁর শেষ বার্তা বিদুরকে দিয়ে ছুটি নেবেন উদ্ধব। ব্রাহ্মণ পিতা ও শূদ্রা মায়ের সন্তান বিদুর—ব্যাসের আত্মজ। তাঁর বিগ্রহে প্রকাশ পাচ্ছেন এ-যুগের মনু—তিনিই শাপভ্রষ্ট বৈবস্বত। উদ্ধব তাঁকে জানালেন প্রভু আদেশ করে গেছেন মৈত্রেয় ঋষির কাছে ভাগবত শ্রবণ করবেন আপনি।

গঙ্গাতীরে মৈত্রয় ঋষির আশ্রম। পারাশব বিদুর মৈত্রেয়ের কৃপায় ভাগবত শুনছেন এই বলে পরম্পরা নির্দেশ করছেন শুকদেব। বিদুরের ভাগবত শোনা আজও বুঝি শেষ হয়নি। মৈত্রেয় ঋষির বলাই কি ফুরিয়েছে? তাঁদের কথোপকথনই ব্রাহ্মণ শুকদেব রাজা পরীক্ষিতকে শোনাচ্ছেন—এই ইঙ্গিতের মধ্যে যে-সত্য প্রকাশ পেয়েছে তা-ও তো এখনও বোঝা হয়নি!

"ভবভয়মপহন্তুং জ্ঞানবিজ্ঞানসারং নিগমকৃদুপজহ্রে ভৃঙ্গবদ্বেদসারম্‌।
অমৃতমুদধিতশ্চাপায় যদ্‌ভৃত্যবর্গান্‌ পুরুষমৃষভমাদ্যং কৃষ্ণসংজ্ঞং নতোঽস্মি ॥
—ভাগবত ১১।২৯।৪৯

———

— উপসংহার —

অধ্যাত্মসাধনার বৈদিক ও অবৈদিক দুটি ধারাই যেমন শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে মিলেছিল তেমনি আর্যেতর গণধর্মগুলিও শ্রীকৃষ্ণের কল্যাণ দৃষ্টি হতে বঞ্চিত হয়নি। তাঁর ব্রহ্মকর্মের ফলস্বরূপ ভারতে সর্বজনীন ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা হয়েছিল পুরাণকার এই-ই বলেছেন। সে-দাবী সত্য কিনা ইতিহাসের কষ্টিপাথরে একবার যাচাই করে নেওয়া যাক।

পিছন ফিরে দেখছি ইতিহাসের সাক্ষ্যমতে উপনিষদের যুগ শেষ হতে না হতেই ভারত জুড়ে অবৈদিক ব্রাত্যদের বলবৃদ্ধি ঘটেছিল। জৈন ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান ব্রাত্যদেরই দৃঢ়প্রতিষ্ঠার নিদর্শন। অন্যদিকে বৈদিক সমাজেও নূতন সাড়া পড়েছে। ব্রাহ্মণদের লক্ষ্য হয়েছে—জনসাধারণ বেদাধিকারে বঞ্চিত—এর ফল ভাল হবে না। সুতরাং "ভারত ব্যাপদেশেন হ্যাম্নায়র্থঃ প্রকাশিতঃ। দৃশ্যতে যত্র ধর্ম্মাদিঃ স্ত্রীশূদ্রাদিভিরপ্যুত (ভাগবত, ১।৪।২৯)। বাসুদেবের কর্মজীবন অবলম্বন করেই নিম্নবর্ণদের উপকারার্থে বিশাল কলেবর 'মহাভারত' ও 'ভাগবত' প্রণয়ন করতে লেগে গেছেন ব্রাহ্মণবর্গ। গীতার সূত্র ধরে সমন্বয়ের বাণী প্রচার করছেন তাঁরা—আখ্যানেতিহাস ও পুরাণাদির মাধ্যমে যুগোপযোগী ভাবে বেদের মর্মার্থ পল্লবিত করছেন আর মহাভারত লিখে চলেছেন স্বয়ং গণপতি অর্থাৎ গণনায়ক শ্রেণী। আশ্চর্যের বিষয় মহাভারত ও ভাগবতের প্রচার ভার পড়েছে সূত জাতির উপরে। তারা সংকরবর্ণ—অনভিজাত শ্রেণী। কিন্তু মহর্ষি ব্যাসের মত ধর্ম্মবিৎ ব্রাহ্মণরা তাদের শিষ্য করতে অরাজী নন। ক্ষত্রিয়রাও পিছিয়ে নাই—উদার বুদ্ধি ব্রাহ্মণাচার্য্য এবং সঙ্করবর্ণোদ্ভুত ওইসব ধর্মপ্রচারকদের পৃষ্ঠপোষকতা করছেন তাঁরা। ক্ষত্রিয় রাজাদের সভাতেই মহাভারত ও ভাগবত পঠন-পাঠন চলেছে। প্রাচীন ঢঙে লেখা পুরাণেতিহাসের এইসব ইঙ্গিতগুলো শুধুই মনঃকল্পনা বা ভাবুকতা বলে উড়িয়ে দেওয়া চলবেনা। আধুনিক ঐতিহাসিক প্রাচীন ভারতের সমাজেতিহাস লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে দেখবেন মহাভারত ও ভাগবতের ঐসব তথ্যগুলি তাঁদের দিঙ্ নির্ণয় করছে।

সত্যই বৌদ্ধপূর্ব ভারতে গণজাগরণের অস্ফুট কোলাহল জেগেছিল। খৃঃ পূঃ ৬০০ শতকে মহামানব বুদ্ধের 'তিমির-বিদার' উদার অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতব্যাপী ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে কোনও সংশয় থাকে না। শ্রীকৃষ্ণ সারা-জীবন ধরে যে সাধনায় প্রাণপাত করেছিলেন করুণাবতার বুদ্ধ তারই এক ফলশ্রুতি মাত্র। গণ্ডী ভেঙ্গে গেছে, বাধার পাহাড় টুটিয়ে কল-কল নাদে আকাশ-গঙ্গার ধারা শতমুখী হয়ে ভাসিয়ে নিচ্ছে দম্ভ-দর্পের ঐরাবত। ভক্তি ধর্মের স্বর-তরঙ্গিণী সেই যুগ হতেই বয়ে চললেন আর্যাবর্তের বুকের মাঝখান দিয়ে। মুষ্টিমেয়ের হাতে যা লুকানো রয়েছে তা যে আপামর জনসাধারণের পিতৃ-রিকথ বৌদ্ধযুগ থেকে এই তত্ত্ব সাব্যস্ত করা হয়েছে উচ্চকণ্ঠে। চিন্তাশীল মনীষী মাত্রেই আজ স্বীকার করেন নব্যভারতের জীবন দর্শনের পিছনে কাজ করছে গৌতম বুদ্ধের সত্যসাধনা। তেমনি, যদি বলি—বৌদ্ধ ভারত ও তৎপরবর্তী ভাগবত ধর্মপ্রধান ভারতীয় সমাজের স্বাধীন চিন্তার প্রেরণা যুগিয়েছিল বাসুদেব কৃষ্ণের জীবনী ও বাণী—কথাটা খুব অযৌক্তিক হয়না।

সম্ভবতঃ ইতিহাসের ধারা লক্ষ্য করেই ভাগবতকার ভগবদুদ্ধব-সংবাদটি সাজিয়েছেন। জিজ্ঞাসু উদ্ধবের কাছে ভাগবত ধর্মের প্রস্তাবনা করতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে যদুঅবধূত সংবাদ বলছেন। বাস্তবে দেখি অবৈদিক বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ই পরবর্তীকালের ভাগবতগোষ্ঠীকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। জ্ঞানযোগীদের প্রবল শক্তিতে যখন বেদবিহিত সমাজের লৌহ শৃঙ্খল খসে পড়ল তখনই ভাগবতের উদার প্রেমধর্ম প্রচারের অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি হল। কাজেই ভাগবতের পুরুষোত্তম তাঁর বাণী প্রচার করতে গিয়ে যে পূর্বাচার্য হিসাবে এক অবধূতের জীবন-বেদ পরিবেশন করেছেন এটা আকস্মিক ভাবালুতা বা অপ্রাসঙ্গিক কিছু নয়। ইতিহাস দেখাচ্ছে জ্ঞানযোগীদের সঙ্গে ভাগবত সম্প্রদায়ের সত্যই অদৃশ্য যোগাযোগ।

আদি ভাগবত বা সাত্বত কি পাঞ্চরাত্রগোষ্ঠী বহু প্রাচীন। কিন্তু বৈদিক সমাজের উচ্চবর্ণের চাপে তাঁদের ক্ষীণকণ্ঠ বার বার রুদ্ধ হয়ে গেছে। গণ-মানসের

সঙ্গে ভাবগত বা পঞ্চোপাসকদের বরাবরই ঘনিষ্ঠতা ছিল। অথচ তথাকথিত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়দের কাছে বিশ্ বা বৈশ্য-শূদ্র প্রধান জনসাধারণের মর্যাদা অতি সামান্য। কাজেই যে-ধর্ম 'স্ত্রী শূদ্র-দ্বিজ-বন্ধু'দের তরাতে চায় বেদবাদীদের কাছে সে-ধর্ম স্বভাবতঃই অবজ্ঞার বস্তু। দোটানায় পড়ে ভাগবতসম্প্রদায় নেপথ্যেই রয়ে গেছেন। তাঁরা জনতাকেও ছাড়তে পারেন না আবার প্রথমাবধি সমন্বয়পন্থা বলে বৈদিক ধারার সঙ্গে বিরোধ করতে ভাবের দিক থেকে তাঁদের বাধে। তাই তাঁরা কেবল 'কাল' প্রতীক্ষা করেছেন। সেদিন কবে হবে যেদিন বেদবাদীরাই সাদরে গ্রহণ করবে ভাগবত ধর্ম—এক বিশাল বুদ্ধির আলোয় ব্রাহ্মণ শূদ্র নরনারী সবারই যোগ্য মর্যাদা মিলবে ?

অবৈদিক জ্ঞানযোগীরাই যদি ত্রয়ীতে 'ব্রাত্য' আখ্যা পেয়ে থাকেন তাহলে বুঝতে হবে তারা প্রথম হতেই বেদবাদীদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করে চলেছেন। ভাগবতগোষ্ঠীর মত সমন্বয়ের দায় তাঁদের ছিল না। তারপর ব্রাত্য ক্ষত্রিয় শৌরি বাসুদেবের ব্যক্তিত্বে এইসব ব্রাত্য জ্ঞানযোগীরা নতুন করে শক্তি সঞ্চয় করলেন। তাঁদের 'জ্ঞানাগ্নি'তে বলতে গেলে সমাজের 'সর্বকর্মাণি' ভস্মসাৎ হয়ে গেল। কর্মকাণ্ডের ধারক আর্য ক্ষত্রিয়দের কার্যতঃ পঙ্গু করে দিয়েছিলেন বাসুদেব। তারপর জৈন আজীবক বৌদ্ধাদি নিগ্রন্থদের হাতে পড়ে ভাবের দিক থেকেও কর্মকাণ্ড হীনপ্রভ হয়ে গেল। প্রাচীন বৈদিক সমাজের অনেক খুঁটিনাটিই তাঁরা নস্যাৎ করে দিলেন। রক্ষণশীল সাম্প্রদায়িকতার যুগ শেষ হয়ে যেন একটা নবযুগের হাওয়া বইল ভারতে। সেই হাওয়ায় মঞ্জরিত হল ভাগবত ধর্মের তরুণ তরু। ভাগবতরা অনুভব করলেন এতদিনে তাঁদের প্রার্থিত শুভযোগ এসেছে। একদিকে নারায়ণ অবতার শ্রীকৃষ্ণ অন্যদিকে গৌতমাবতার বুদ্ধ—দুই ঋষি মিলে বেদবাদীদের গোঁড়ামীগুলোর মূলে কুঠার হেনেছেন। এখন নূতন করে বেদ ব্যাখ্যা করার দায় ভাগবত সম্প্রদায়ের। সমন্বয়ের বাণী নিয়ে ভারতীয় সমাজে আবির্ভূত হলেন তাঁরা। ব্রাত্য জ্ঞানযোগীদের হাতে বেদের অবলুপ্তি ঘটতে পারে এই ভয়ে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পাণ্ডারা ম্রিয়মান হয়েছিলেন। বৈদিক ধারাকে যাঁরা নব

ভাবে সঞ্জীবিত করবার শক্তি রাখেন সেই ভাগবতদের তখন তাঁরা সাদর অভ্যর্থনা জানাতে বাধ্য হলেন। ভাগবতদের কৃপায় একদিকে বেদার্থ নূতন আলোয় ভাস্বর হয়ে উঠল, অন্যদিকে বিপ্লবী নেতা সম্যক সম্বুদ্ধকে বিষ্ণুরই নবম অবতার ঘোষণা করে ভাগবতরাই প্রাচীন কালের সঙ্গে নবানুরাগের গ্রন্থিতে বেঁধে দিলেন ভাবীকালকে। তাঁরা বেদবিদ্যাকেও মান দিলেন আবার বৌদ্ধদের সঙ্গেও রেষারেষি রাখলেন না। তার কারণ তাঁদের অভ্যুদয়ের মূলে যে ভাগবত পুরুষের দিব্য প্রেরণা, তিনি গীতা মুখে জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির সমন্বয়বাদই প্রচার করে গেছেন।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতেই ভাগবত ধর্মের প্রসার এত বেড়েছিল যে গ্রীক রাজপুরুষ পর্যন্ত ভগবান বাসুদেবের উপাসক হয়ে উঠেছে। এর পর ভাগবত ধর্মকে সমাজের সর্বস্তরে ফলবান করে তোলার জন্য সন্তদের আবির্ভাব। শ্রীকৃষ্ণের আকাঙ্ক্ষিত ধর্মরাজ্য যে সত্যই ভারতে রূপ ধরছিল এ সবই তার প্রমাণ।

ইতিহাস-পুরাণ বলছে পরীক্ষিতের সভায় ভাগবতের প্রচার। মহাভারতের প্রচার তাঁর সন্তান জনমেজয়ের সভায়। কিন্তু রচনার দিক দিয়ে আগে মহাভারত, পরে ভাগবত রচনা হয়। এটা কেন হল বোঝা কঠিন নয়। আগে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তবে বর্ণশ্রেষ্ঠরা কার্ষ্ণবেদ বা মহাভারতকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছে। পরীক্ষিৎ শ্রীকৃষ্ণেরই ভাগিনেয়-পুত্র। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা প্রচার হলেও সে-প্রচারের গতি নিতান্ত মন্থর। তার অনেক আগেই গণেশের হাতে কলম উঠেছিল—লেখা হয়ে গেছে মহাভারত এবং সূতদের কল্যাণে জনতার মাঝে তার প্রচার চলেছে। আর্যরা যতক্ষণ কষে মেজে দেখছেন বাসুদেব লোকটি শ্রীভগবানের অংশ না কলা না পূর্ণাবতার, বিশ্-শূদ্র-স্ত্রী-দ্বিজবন্ধু-দাস দস্যু আখ্যাত ভারতীয় জনসাধারণ ততদিনে শ্রীকৃষ্ণের কীর্তি-কাহিনীতে মুগ্ধ হয়ে 'মেরে গিরিধারী গোপাল' বলে ঘরে-ঘরে পূজা করছে। ভাগবত পড়তে গিয়ে দেখি বক্তাদের সেখানে আটঘাট বেঁধে কত সন্তর্পণেই না এগোতে হচ্ছে! পুরাণেতিহাস ও দর্শন সহায়ে আগে ভাগবত ধর্মের ভিত্তি গাঁথা হয়েছে ভালরকম তবে শ্রীকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ। প্রসঙ্গ করতে গিয়েও কেবলই তত্ত্বানু-

সন্ধান। বেশ বোঝা যায় শৌরি বাসুদেবকে স্বয়ং ভগবান হিসাবে মানতে এবং তাঁর ভাগবতধর্মকে মর্যাদা দিতে আর্য ভারতের শত-শত বৎসর সময় লেগেছে। সেই সময়ে ওদিকে মহাজনতার মধ্যে ভারতযুদ্ধ ও তার অবিসম্বাদী নায়ক শ্রীকৃষ্ণের জীবনকথা বহুল প্রচারিত হয়ে গেছে। কিন্তু ভারতের ভদ্র শ্রেণী তখনও সে সব কানে নেয় নি বলে সমাজের উপরতলায় মহাভারতের নামও শোনা যায় না। শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে সমাজের মধ্যে যে দুটি বিভিন্ন স্রোত বয়েছিল প্রচলিত ভাগবত ও মহাভারতের মধ্যে তার সুস্পষ্ট ছায়া পড়েছে। ব্যাস শুক পরীক্ষিত ও জনমেজয়—এককথায় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির কৃপাতেই যে লোকে ভাগবত ও মহাভারত পেয়েছে এ দাবী যেমন আছে তেমনি আবার গণ-চারণ সূতদের কল্যাণেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়রা মহাভারত ও ভাগবত কথা শুনতে পেয়েছিলেন এ স্বীকৃতিও আছে। আমরা বলি দুটিই সত্য। সমাজের নিম্নশ্রেণীই বহুকাল পর্যন্ত কৃষ্ণকাহিনীর ধারক ও বাহক ছিল। মহাভারত ও ভাগবতের উপাদান তাদের ঘর থেকেই উচ্চবর্ণরা সংগ্রহ করেছেন। আবার সমাজের চুড়ামণি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়রা সাদরে গ্রহণ না করলে যে মহাভারত বা ভাগবত চিরদিন অপাঙক্তেয় হয়ে থাকত, পঞ্চম বেদ বা পারমহংস সংহিতার মর্যাদা পেতনা এও ঠিক। আর্য-অনার্য-শূদ্র আদান-প্রদান উভয় পক্ষেই ছিল। এই লেনদেনের কারবার কখনও বন্ধ হয়নি বলেই হিন্দুধর্ম সনাতন।

শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে সমাজের দুই শ্রেণীর মধ্যে বিরোধের প্রথম সঙ্কেত মহাভারত, ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণ—তিন গ্রন্থেই আছে। শ্রীকৃষ্ণ তিরোহিত হওয়ার পর হতাবশিষ্ট যাদব স্ত্রীপুরুষ ও বিপুল ধনসম্ভার নিয়ে অর্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে চলেছেন —পথের মধ্যে পঞ্চনদবাসী দস্যুদল মণিরত্ন ও যাদবীদেব লুটে নিয়ে গেল। মহাভারতে এদের জাতি পরিচয় নাই কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে রয়েছে তারা যষ্টিধারী অত্যন্ত দুর্মদ আভীর ("ততস্তে পাপকর্ম্মাণো লোভোপহত চেতসঃ)। আভীরা মন্ত্রয়ামাসুঃ সমেত্যাত্যন্ত দুর্মদাঃ॥" (৫।৩৮।১৪)। আবার শ্রীমদ্ভাগবত বলছেন এরা গোপ ("গোপৈরসদ্ভি")। অমরকোষে গোপ আভীর ও বল্লব সমার্থক শব্দ—বৈশ্যবর্গে স্থান। সূপকারকেও বল্লব বলে। অবস্থার ফেরে

পড়ে গোপালন ছেড়ে সূপকার বৃত্তি ধরত যেসব গোপ তাদেরই কি বল্লব বলত ? আভীর ও গোপদের একার্থবাচী বলা হল কবে থেকে ?

ভাগবতে বা বিষ্ণুপুরাণে বৃন্দাবনলীলা সম্পর্কিত অধ্যায়গুলিতে গোপ শব্দেরই বহুল ব্যবহার। ভাগবতের 'উদ্ধব প্রতিযান' অধ্যায়ে বল্লবী শব্দটি পাই যা থেকে ধরে নেওয়া যায় গোপী ও বল্লবী একই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আভীর শব্দটি কোথাও নাই। অথচ ভাগবত মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণের বহু জায়গায় সরস্বতী তীরবাসী বা সমুদ্রোপকূল সন্নিহিত আভীর জাতির নাম আছে (বিষ্ণু ৪।২৪ অধ্যায় ; মহাভারত সভা। ৩১, বন। ১৮৮ অধ্যায় ; ভাগবত ২।৪।১৮ ও অন্যান্য স্কন্ধ দ্রষ্টব্য)। মহাভারতে বলা হয়েছে সরস্বতী তীরে শালবন—দ্বৈতবন নামে যে অঞ্চলে পাণ্ডবরা বারবৎসর কাটিয়েছিলেন তার অদূরেই একটি আভীর পল্লী ছিল। ঘোষযাত্রা পর্বাধ্যায়ে সেখানকার কথা বলতে গিয়ে গোপ আভীর বল্লব তিনটি সংজ্ঞাই ব্যবহার করা হয়েছে। এই ঘোষপল্লীটি দুর্যোধনের সম্পত্তি ছিল। আবার ভাগবত হতে জানি সরস্বতী তীরবর্ত্তী অম্বিকা-বনে ব্রজের গোপগোষ্ঠী পশুপতির দেবযাত্রা পালন করতে আসত। তবে কি সরস্বতী তীরের কোন ঘোষপল্লীই ব্রজগোপদের আদি পিতৃভূমি ছিল ?

নামেই প্রকাশ আভীর হচ্ছে জাতিবিশেষ—গোপকুল বৃত্তিমূলক সম্প্রদায়। মনুসংহিতার বিচারে আভীর জাতি ব্রাহ্মণ পিতা ও অম্বষ্ঠা মাতার সন্তান। অম্বষ্ঠজাতি ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যার মিলনে সৃষ্টি বর্ণ—বৈশ্যের সমতুল্য মর্যাদা অম্বষ্ঠদের। আভীর জাতির সামাজিক মর্যাদা তাদের চেয়ে কিছু ন্যূন কারণ অম্বষ্ঠের মত দুটি মুখ্যবর্ণ হতে তার উদ্ভব নয়। কাজেই আভীররা একরকম শূদ্রই। কিন্তু পৌরুষ সহায়ে আভীর জাতি সমাজে কখনও উচ্চস্থান কখনও নিম্নপদ পেয়েছে। তাদের মধ্যে যে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ত্রিবিধ বর্ণের আচারই চলত ইতিহাস থেকে তার পরিচয় দেওয়া যায়।* হতে পারে আভীরদেরই এক

* নেপালের রাজবংশাবলী বলে তাদের সুপ্রাচীন নায়ক ছিল গোপাল আভীর [পঃ পুঃ দ্রষ্টব্য]

শাখা যদু-গোষ্ঠীর সঙ্গে মিশ্রণের ফলে অনুলোম ক্ষত্রিয়ের মর্যাদা পেয়েছিল। ব্রজবাসী গোপবৃন্দ ব্রাহ্মণকে অন্নদান করছে—আচার্য গর্গকে অনুরোধ করছে শিশু গোপালের নামকরণ করতে, ইন্দ্রযজ্ঞ করছে। বেশ বোঝা যায় এদের সামাজিক মর্যাদা বৈশ্যের সমান। ভাগবতকার ইন্দ্রযজ্ঞ নিষেধ-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়েও বলিয়েছেন ব্রজবাসীরা বৈশ্য। যদুবংশ গণতন্ত্রী ছিল বলেই বোধহয় তাদের সঙ্গে ঘোষপল্লীবাসী গোপদের আত্মীয়তা সম্ভব হয়েছিল। শ্রেণীবিদ্বেষ থাকলেও উৎকট আকারে তা প্রকাশ পায় নি। কিন্তু ঘোষযাত্রা-পর্বাধ্যায়ে দুর্যোধনগোষ্ঠীর ঘোষপল্লীতে যে সব নৃত্যরত গোপ-গোপীর কথা আছে তারা যেন নিতান্তই আজ-কালকার গোয়ালা জাতি। ক্ষত্রাভিজাত্যে গর্বিত কৌরবদের অধীনতায় আভীররা সেখানে একেবারে শূদ্র শ্রেণীতে নেমে গেছে।

এখন আমাদের সামনে এই ক'টী প্রশ্ন—পঞ্চনদবাসী দস্যুরা কি আভীরজাতি ও তার শাখা গোপ সম্প্রদায়? অন্যসব দেশের আভীর-গোপরা থাকতে বিশেষ করে পঞ্চনদবাসী আভীররাই বা অর্জুনের বাদী হল কেন? তৃতীয়তঃ পঞ্চনদে কি শুধু আভীর দস্যুরাই ছিল, ক্ষত্রিয় জাতি ছিল না? মহাভারত দস্যু সংজ্ঞা দিয়ে কি পঞ্চনদের ক্ষত্রিয়দের নির্দেশ করছে না আভীরদেরই বুঝিয়েছেন?

ও কিরাত বীরগণ! খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে ভারতবর্ষে আভীর নেতারা ছিল শক ক্ষত্রপদের ডান হাত। তৃতীয় শতকে তাদের মধ্যে পরাক্রান্ত পুরুষ যারা ছিল তারা মহাক্ষত্রপদের পর্যায়ে উঠে গেছে। এই আভীর মহাক্ষত্রপদের একজনই সাতবাহন বংশের হাত থেকে মহারাষ্ট্র কেড়ে নিয়েছিল—এমন অনুমানের যথেষ্ট কারণ আছে। সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সময়ও আভীর জাতি তাঁর সাম্রাজ্য প্রত্যন্তবাসী বলবান রাষ্ট্রশক্তি বিশেষ। এই হল আভীরদের ক্ষত্রিয় মর্যাদার পরিচয়। ওদিকে সুদূর দক্ষিণের তামিল রাষ্ট্রে যে Ayar জাতিকে পণ্ডিতরা উত্তর ভারতের আভীর জাতির শাখা বলে চিহ্নিত করেছেন তারা যেন বৈশ্যের মর্যাদা হতেও চ্যুত—সাধারণ শূদ্রবর্ণ। পরবর্তীকালে আভীর জাতি উত্তর ভারতের সর্বত্র শূদ্রবর্ণ রূপেই পরিচিত হয়েছে (রূপ গোস্বামীর 'শ্রীকৃষ্ণ গণোদ্দেশদীপিকা' দ্রষ্টব্য)।

উত্তর দিতে গিয়ে প্রথমে ভূগোলের কথা ওঠে। সরস্বতী তীর বা বর্তমান সিন্ধু অঞ্চলে যে আভীরদের বসতি ছিল পুরাণের এ তথ্য Ptolemy-র বিবরণে সমর্থিত হয়েছে। গ্রীক ভূগোলবেত্তা ঠিক ওই অঞ্চলেই 'Abiria' রাষ্ট্রের নাম করেছেন। কিন্তু পঞ্চনদে আভীরদের কোনও উপনিবেশ ছিল বলে পুরাণে যেমন স্পষ্ট উল্লেখ নাই বিদেশী ঐতিহাসিকদের লেখাতেও তেমন কিছু মেলে না। খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতকে গ্রীকরা পঞ্চনদ অঞ্চলে Sodrai, Ambastanai, Malloi, Oxydrakai (শূদ্ররাষ্ট্র, অম্বষ্ঠ, মালব, ক্ষুদ্রক) ইত্যাদি গণরাষ্ট্র ও শিবি পুরু গান্ধার উরসা অশ্বকাদি প্রাচীন ক্ষত্রিয় জনপদের উল্লেখ করেছে। আভীরদের নাম নাই।

পুরাণে অনেক ক্ষেত্রে আভীরদের শূদ্ররাষ্ট্রের প্রতিবেশী বলা হয়েছে—এই নজিরে কেউ হয়তো বলবেন গ্রীকরা পঞ্চনদে শূদ্ররাষ্ট্রের নাম যখন করেছে তখন আভীররা তারই ধারে-কাছে ছিল। তার উত্তরে আমরা মনে করিয়ে দেব আভীর ও শূদ্রদের প্রতিবেশীত্বের কথা উঠেছে ভবিষ্য রাজবংশ কীর্তন করতে গিয়ে। প্রাচীনকালে আভীর ও শূদ্ররা পাশাপাশি রাষ্ট্র ছিল কিনা তা জানা যায় না। ও দুটি জাতির পারস্পরিক সান্নিধি ঘটেছে গুপ্তযুগে (যথা বিষ্ণুপুরাণ— "মথুরায়ামনুগঙ্গা-প্রয়াগং মাগধাগুপ্তাশ্চ ভোক্ষ্যান্তি)।" তারপর বলা হয়েছে "সৌরাষ্ট্রাবন্তি শূদ্রানবুর্দ মরুভূমি বিষয়াংশ্চ ব্রাত্যাদ্বিজাভীরশূদ্রাদ্যা ভোক্ষ্যান্তি" (৪।২৪)। একে তো এ বর্ণনা গুপ্ত যুগের তায়, শূদ্রদের প্রতিবেশী হলেও আভীরদের সেই সরস্বতী তটে দেখছি, পঞ্চনদের বুকে নয়। পঞ্চনদবাসী শূদ্ররা আভীরদের পাশে উপনিবেশ গড়েছে। আভীররা পঞ্চনদে যায়নি তখনও। তাহলে মহাভারত যাদের পঞ্চনদবাসী দস্যু বলেছে বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত তাদের আভীর বা গোপ বলে স্থির করল কেন ?

দুটি ব্যাখ্যা সম্ভব। এক হতে পারে অর্জুন যখন হতাবশিষ্ট যাদবদের পঞ্চনদে বসবাস করালেন ("চকার বাসং সর্বস্য জনস্য"—বিষ্ণুপুরাণ) তখন সেখানকার ক্ষত্রিয় ও বিশূদের সঙ্গে স্বভাবতঃই একটা সংঘর্ষ বেধেছিল।

সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ এবং গান্ধার রাজবংশের সঙ্গে পাণ্ডবদের দৃঢ়মূল বৈরিতা তো আগে হতেই ছিল। তাছাড়া নূতন কোনও জাতিকে নিজেদের সীমানায় উপনিবেশ স্থাপন করতে দেখলে স্থানীয় অধিবাসীদের বিরক্তি স্বতঃসিদ্ধ। সিন্ধু পাঞ্জাবে অর্জুনের সঙ্গে আঞ্চলিক জনসাধারণের যে খণ্ডযুদ্ধ হয় স্বরস্বতী তীরবাসী কিছু আভীরও হয়তো তাতে জড়িয়ে পড়েছিল। কুরুক্ষেত্রে নারায়ণী সেনার হাজার হাজার গোপ অর্জুনের হাতেই বিনষ্ট হয়। আভীর গোপকুলে একটা অসন্তোষ চাপা ছিল নিশ্চয়ই। হতে পারে পঞ্চনদবাসীর বিদ্রোহে সুযোগ পেয়ে সিন্ধুবাসী আভীররাও কিছুটা সহায়তা করে অর্জুনের সঙ্গে শত্রুতায়। মোটকথা এ বিষয়ে মহাভারতের বিবরণই সবচেয়ে প্রাচীন মনে হয়। বিদ্রোহটা বিশেষ করে পঞ্চনদের দুর্ধর্ষ জনতারই বিদ্রোহ। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত যে আভীর বা গোপদেরই অর্জুনের প্রতিপক্ষ ধরে নিয়েছেন তাতে মনে হয় ওই পুরাণ দুটি সঙ্কলনকালে উঃ পঃ ভারতে আভীর জাতি বিশেষ পরাক্রমশালী হয়ে উঠেছিল। সঙ্কলয়িতারা সেজন্য আভীরদেরই অর্জুনের একমাত্র প্রতিপক্ষ বলে স্থির করেছেন। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে এ-ধরণের ভুল যথেষ্ট আছে। *

---

* 'শ্রীকৃষ্ণ গণোদ্দেশ দীপিকায়' রূপগোস্বামী লিখেছেন ব্রজের প্রান্তবাসী ছিল পশুচারণকারী গুর্জর জাতি। পঞ্চদশ শতকে গুর্জররাই মথুরামণ্ডলের প্রান্তবাসী বটে কিন্তু মহাভারত যে-যুগের ইতিহাস তখনও কি তাই-ই ছিল? ভাগবতে ব্রজের প্রান্তবাসী হিসাবে পুলিন্দদের উল্লেখ রয়েছে। শ্রীধরস্বামী পুলিন্দদের শবর বলেছেন। অন্ধ্র শবর পুলিন্দ, মূতিবস এই চারটি সুপ্রাচীন আদিবাসীর নাম ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও (৭।১৮) পাওয়া যায়। আর গুর্জরজাতি যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক আগন্তুক, হূণদের সঙ্গেই পঞ্চম শতকে প্রথম তারা ভারতবর্ষে এসেছিল—সমস্ত ঐতিহাসিক এ বিষয়ে একমত। কালে গুর্জররা মধ্যভারতে গুর্জরপ্রতীহার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে, কান্যকুব্জ পর্যন্ত তাদের অধিকার বিস্তৃত হয়। পাল সম্রাট ধর্মপালের হাতে গুর্জরদের

[পঃ পৃঃ দ্রষ্টব্য]

আরেকরকম ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে বিশেষ করে গোপ আভীরদেরই দস্যু বর্বর বলে বিশেষিত করার মধ্যে অভিজাত শ্রেণীর দ্বেষবুদ্ধির পরিচয় আছে। বলতে গেলে ভাগবতের প্রাণপুরুষকে বহুকাল পরে আর্যভারত ওই গোপ আভীরদের মাঝ থেকেই খুঁজে বার করেছিল। শ্রীকৃষ্ণ তিরোভাবের পর দীর্ঘদিন তাঁর সমালোচনা চলেছে আর্যাবর্তে। তাঁর প্রেমধর্মকে আভিজাত্যাভিমানীরা ভুলে যেতেই চেয়েছে। বৌদ্ধ সঙ্ঘের আনুকূল্যে বেদবাদীদের বিপক্ষে যখন প্রবল গণ-আন্দোলন দেখা দিল তখন মহাশক্তিধর গণনায়ক বাসুদেবকে মনে পড়ল ব্রাহ্মণসমাজের। 'কণ্টকে নৈব কণ্টকম্' রীতিতে ব্রাত্যদের উৎখাত করবার জন্য সেই ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের ধর্ম আশ্রয় করলেন তাঁরা। শ্রীকৃষ্ণ জীবনী খুঁজতে গিয়ে তখন গোপ-আভীরদের দ্বারস্থ হতে হয়েছিল বলেই কি তাদের 'অসৎ' 'দস্যু' 'লোপ্তহারী' 'পাপকর্মা' 'লোভী' ইত্যাদি বাছা বাছা উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে? ঋণ স্বীকারে অনিচ্ছা থাকলে অনেক বড়লোকই এমন আচরণ করে থাকেন! তখন 'তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ আমি আজ চোর বটে' বলে চোখের জলে হাসা ছাড়া অন্য পক্ষের উপায় থাকে না।

ব্যাখ্যা যাই-ই করা যাক না কেন তথ্যের ইঙ্গিতটি প্রাঞ্জল। সু-প্রাচীনকালেই শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে জনসাধারণ ও ভদ্রশ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষ ঘনিয়ে এসেছিল।

রাজ্যাধিকার সঙ্কুচিত হলেও ভারতীয় জনসাধারণের সঙ্গে অবাধ মিশ্রণে বাধা ঘটেনি। রাজপুতানা সুরাষ্ট্র অঞ্চলে বসতি স্থাপনের সময় আভীর গোষ্ঠীর সঙ্গে গুর্জরদের যোগাযোগ ঘটে। গুর্জরত্রা বা গুজরাট নামে যে অঞ্চলটিতে গুর্জরদের প্রধান ঘাঁটি ছিল সেটি আনর্তমণ্ডলের মধ্যে পড়ে। সম্পূর্ণ অঞ্চলটিই শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতিপূত। কাজেই স্বভাবের নিয়মে ভাগবতধর্ম ও শ্রীকৃষ্ণকে গুর্জরজাতি ক্রমে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেছিল। গুজরাট তাদের স্বধর্ম ও সংস্কৃতির চিহ্ন বহন করেছে অদ্যাবধি। (Tripathi-র Hist of Kanauja দ্রষ্টব্য)। তাবলে এই গুর্জররা শ্রীকৃষ্ণের আমলে ব্রজবাসী ছিল একথা মানা চলে কি?

তক্ষশিলায় জনমেজয় যে সর্পবংশ ধ্বংসের আয়োজন করেছিলেন তার পিছনেও উঃ পঃ সীমান্তবাসী এবং পৌরব ক্ষত্রিয়দের মধ্যে একটা বিরোধেরই কাহিনী প্রচ্ছন্ন আছে কিনা কে বলবে? মোট কথা পাণ্ডবদের আমলেই জনপদবাসী গ্রাম্যরা দ্বারাবতীর সকল ঐশ্বর্য ক্ষত্রিয়দের হাত থেকে লুটে নিয়ে গিয়েছিল। স্বয়ং গাণ্ডীবীরও সাধ্য হয়নি যে তাদের বাধা দেবেন। তারপর অভিজাতশ্রেণীর জন্য ছিল শুধু গীতা। বৈদিক আর্যরা শ্রীকৃষ্ণের ভাবাদর্শ স্বীকার করলেও ব্যক্তিকে চায়নি। আর ভারতের মহাজনতা প্রথমাবধি ওই মানুষটিকে ভালবেসেছে, যুগ যুগ ধরে পূজা করেছে। সুতরাং মানুষ শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজে বার করতে হলে অবজ্ঞাত বিশ্ ও শূদ্রদের দুয়ারে দুয়ারে ফিরে তথ্য সংগ্রহ করা ছাড়া পরবর্তী পণ্ডিতদের আর অন্য কোন পথ ছিল না। তাই নিয়ে মন কষাকষিও কম হয় নি।

শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন "মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ। স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥" আর্য ভারত ঐ 'মাম্' শব্দটির যত ভাষ্য ব্যাখ্যা টীকাই করুক না কেন স্ত্রী-শূদ্র বৈশ্যরা সোজাসুজি মানুষটিকেই আশ্রয় করেছিল তার ফলে তাদের ভাগবতধর্ম বাস্তবানুসারী এবং বিদেশীদের পক্ষে ধারণা করা সহজ। আশোকের ধর্মবিজয়ের পর উত্তর-পশ্চিম ভারতে যবন পহ্লব শক কুষাণদের বন্যা ছুটে এল। বৌদ্ধ প্রচারকদের বাণীতে উদ্বুদ্ধ সারা এশিয়া যেন ভারত-ভূমিকেই তাদের আশ্রয়ক্ষেত্র বলে ধরে নিল। বৌদ্ধসংঘে সত্যই তাদের স্থান মিলল। আবার বৌদ্ধসংঘ হতে তাদের হিন্দুধর্মের আওতায় টেনে আনলেন শৈব পাশুপত ও ভাগবত সম্প্রদায়। দুটি সম্প্রদায়েই দুটি মানবদেবতার জীবনবেদ একমাত্র প্রামাণ্য, শিব পশুপতি ও কৃষ্ণ বাসুদেব। লক্ষ্মী-নারায়ণ, দুর্গা কি বিষ্ণুভগ পূষা নৃসিংহাদি হিন্দু দেবতার তত্ত্ব বোঝা বিদেশীর পক্ষে কঠিন। আর বুঝলেই বা দেবোপাসনার অধিকার দিচ্ছে কে তাদের? কিন্তু মহামানবের মহিমা অনায়াসে ধারণা হয়। আবার সে মহামানব যদি প্রেমে পাগল ভোলানাথ কি প্রেমস্বরূপ পুরুষোত্তম হন এবং তাদের পূজায়

যদি জাতিবর্ণের বাধা না থাকে তবে তাঁদের আবেদন সর্বজনীন। ইতিহাসের নজিরে দেখি বৈদেশিকদের গোত্রান্তর সিন্ধু পাঞ্জাব অঞ্চলেই ঘটেছিল। এতে ভাল করেই বোঝা যায় তাদের পাশুপত বা ভাগবত হওয়ার মূলে কাজ করছিল শূদ্র আভীর সমাজের উদারতা। ওসব অঞ্চল তো বহুদিন আগেই বৈদিক আর্যদের বিচারে অনাচারী দস্যু বর্বরদের বাসভূমি। কাজেই বিদেশীদের তাঁরা হিন্দু করেননি করেছে স্থানীয় অধিবাসী। পঞ্চম শতকে হূণ গুর্জর জাতিও এই পাঞ্জাব-সিন্ধু অঞ্চল মাড়িয়ে এসে মালব ও সৌরাষ্ট্রে গুছিয়ে বসল এবং দেখতে দেখতে ভগবান একলিঙ্গ ও মহাদেবীর উপাসক রাজপুত জাতি হয়ে গেল। তাদের সামাজিক উৎসবাদি ঝুলন দোল লোকনৃত্য গীত বার আনাই শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে। রাজপুতদের প্রসিদ্ধ বসোন্তোৎসব 'আহেরিয়া'তে আভীর জাতির স্মরণ চিহ্ন নাই কি? তাছাড়া আভীররাও অম্বিকাবনে দেব পশুপতির উপাসনা করত পরে শ্রীকৃষ্ণ তাদের মন ভুলিয়েছেন। রাজপুতদের শৈব শাক্ত বা গুর্জরদের বৈষ্ণব করায় তাদের হাত ছিল নিশ্চয়। ব্রজের পুলিন্দ বা বিন্ধ্যারণ্যের শবররাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বিদেশীদের হিন্দু সমাজে টেনে আনায় তাদের কৃতিত্বও কম নয়।

অতএব আধুনিক মন যেভাবে শ্রীকৃষ্ণকে জানতে চায় তার মালমশলা পেতে হলে, ভাগবত ধর্মের মহিমা কীর্তন করতে গিয়ে পুরাণকার বহুবার যাদের নামোল্লেখ করেছেন সেই "কিরাতহূণান্ধ্র পুলিন্দ পুক্কসা আভীর শুহ্মা যবনা-যুশাদয়ঃ"র পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস জানা প্রয়োজন। এদের মধ্যে আবার আভীরদেরই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। নেপালের পশুপতিনাথের মন্দির হতে সুদূর দক্ষিণে চোল পাণ্ড্য যাদের কীর্তি ছড়িয়ে আছে সেই আভীরদের কতটুকু জানি আমরা? অথচ ইউরোপিয়ান পণ্ডিতও বলছেন Ayar আখ্যাধারী আভীররাই "Seem to have brought into the south the worship of the herdsmangod Krishna (Camb. Hist. Ind, Vol. I. P. 596)।

বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বের বাইরে রক্তমাংসের মানুষ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যেটুকু আমরা

অদ্যাবধি জানি তার বেশির ভাগই ওইসব আভীর শবরদের কাছ থেকে পাওয়া। আর্যভারত অক্ষয় করে রেখেছে দ্রৌপদী রুক্মিণী ও গোপীগণকে। জনগণের কাছ থেকে পেয়েছি সুভদ্রা শ্রীরাধা ও কুব্জারাণীকে। মহাভারতে শুধু এইটুকু আছে যে মহাপ্রস্থানকালে যুধিষ্ঠির সুভদ্রার হাতেই পৌত্র পরীক্ষিত ও শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রের ভার দিয়ে গিয়েছিলেন। সুভদ্রাদেবী যে দীর্ঘদিন লোকমাতা হয়ে ভারতভূমিকে পালন করেছিলেন—রথযাত্রার অপরিহার্য সঙ্গিনী তিনি এবং তাঁর প্রেরণাতেই কৃষ্ণকথার আদি প্রচার, এগুলি শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ বলরামের মাঝখানে তাঁর আসন দেখে অনুমানে ধরে নিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলরামের চেয়ে তাঁর মহিমা যে কোন অংশে ন্যূন্য নয় মহাভারত কি ভাগবতে তেমন কথা কি কোথাও আছে? তবে হঠাৎ দুই মহাপুরুষের মাঝখানে তিনি দাঁড়ালেন কি করে? কে তাঁর কীর্তি খ্যাপন করল? এ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে মনে পড়ে যায় ওই রথযাত্রা উৎসব ওই ত্রিমূর্তি পরিকল্পনার পিছনে আছে শবরজাতির দান। মালবরাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন ও তাঁর পুরোহিত বিদ্যাপতি শবরদের মাঝখানে নীলমাধবকে আবিষ্কার করেছিলেন—নীলমাধবই আদি জগন্নাথ। কাজেই সুভদ্রাদেবীর এ-পুজো শবরদের কৃপাতেই শেখা। আবার শ্রীরাধা ও কুব্জারাণীর পালা—সে-ও লোকসাহিত্যেরই দান।

তাই মনে হয় শুধু সংস্কৃত পুঁথির ভাণ্ডারেই নয়—ভারতের যত দেউল যত প্রাদেশিক সাহিত্য যত প্রাকৃত গাথা—তাদের মাঝেও লুকানো রয়েছে অতীতের অমূল্য ইতিহাস। একজনের পক্ষে তার সারোদ্ধার অসম্ভব। কিন্তু বহু পণ্ডিতের চেষ্টায় যদি কোনদিন আমাদের লোকসাহিত্য যাত্রাপর্ব কিংবদন্তি ও আখ্যানাদির সার সংগ্রহ এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তার প্রকৃত মূল্য নির্ণয় হয় সেদিন বোঝা যাবে ভারতধর্মের দুই জয়স্তম্ভ, শিব পশুপতি ও কৃষ্ণ বাসুদেব ঐতিহাসিক পুরুষ কি না!

প্রশ্ন হবে দেবতাকে মানুষ প্রতিপন্ন করার এত কি প্রয়োজন? প্রয়োজন আছে। কল্পনা মোমের ফুল—যত নয়নমনোহরই হক কাজে লাগে না।

সত্যিকারের ফুল কিন্তু সূর্যকিরণেই দল মেলে—একটু আঁচেই গলে যায় না। আজ যখন পূর্ণযোগ ও সমন্বয়ের বার্তায় ভারতবর্ষ মুখর তখন এমন একজন পুরুষকে আমাদের জানা দরকার যাঁর জীবনে পূর্ণতার আদর্শ বাস্তবে রূপ ধরেছিল। এক বাক্যে ভারতের অবতার ও গুরুবর্গ বলছেন শ্রীকৃষ্ণ-ই সেই পূর্ণ পুরুষ। আমরা নিঃসংশয়ে জানতে চাই তিনি কি অর্ধেক মানব আর অর্ধেক কল্পনা, না অমন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মানুষ সত্যিই কোনদিন এ দেশের বুকে জন্মেছিলেন? তত্ত্বের ইমারত যতই শক্ত করে গাঁথা হক সত্যের ভিত্তি না থাকলে মানুষেরই বুক দমে যায়—ইমারতের আর কথা কি? শ্রীকৃষ্ণকে মুনিঋষির সার্থক কল্পনা বলে গ্রহণ করতে যত না উৎসাহ পাই তার চেয়ে ঢের বেশি উৎসাহ জাগে যদি নিশ্চয় জানি মর্তে সত্যিই দেবতার পূর্ণতম আবির্ভাব ঘটেছিল—শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসের সৃষ্ট আদর্শ নন, তিনি মর্তের মানুষ অথচ মানুষ হয়েও পূর্ণতর হতে পূর্ণতম!

অতীতে পুরাণকার যাঁর সম্বন্ধে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেছেন 'মধুরাধিপতে-রখিলং মধুরম্' আগামী দিনের ঐতিহাসিক ও পুরাণকোবিদ তাঁকে নিয়ে কেবল ভাবালুতা না করে নিশ্চয়ই তাঁর ঐতিহাসিকতা প্রমাণ করবেন। ভাবীকালের সামনে আমাদের এই নিবেদনটি রেখে 'মাথুর' শেষ করলাম।

———

পরমহংস নিগমানন্দ সরস্বতী দেব প্রণীত পুস্তকাবলী

যোগীগুরু
তান্ত্রিকগুরু
জ্ঞানীগুরু
প্রেমিকগুরু
ব্রহ্মচর্য্য সাধন
বেদান্তবিবেক
ঠাকুরের চিঠি

নারায়ণীদেবী লিখিত ও অনুবাদিত পুস্তকাবলী

ঈশানু স্মরণ
নিবেদিতা
বাঙ্গলার সাধনা ও শ্রীশ্রীনিগমানন্দদেব
নীলাচলে ঠাকুর নিগমানন্দ
নীলাচল বাণী
নিগমানন্দ প্রসঙ্গ (ওড়িয়া)
পিলাঙ্ক নিগমানন্দ (ঐ)
রূপলাগি আঁখিঝুরে
সদগুরু বা গুরুবাদ প্রসঙ্গ
সদগুরু বা গুরুবাদ প্রসঙ্গ (ওড়িয়া)
ভাগবতী তনু নিগমানন্দ
প্রাতঃস্মরণীয়া মা যোগমায়া
ঋগ্বেদে রাশের ইশারা
ভারতকন্যা
সঙ্ঘশক্তি
শৌরীবাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ
ভারত ধর্ম্ম